ময়ূখ
চৌধুরী

কায়না

ময়ূখ চৌধুরী পরিবেশিত —

গল্পের চেয়ে ভয়ংকর সত্য কাহিনী !

বযযজা

ময়ূখ চৌধুরী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

KAWENA

an Adventure

By MAYUKH CHOWDHURY

প্রকাশক :
শ্রী প্রবীর কুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ :
বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৯৪
মে, ১৯৮৭
পুনর্মুদ্রণ :
জুন, ১৯৯১
পুনর্মুদ্রণ :
নভেম্বর- ১৯৯৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
প্রসাদ রায়

মুদ্রক :
বি.সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

কয়েকটি কথা

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ''কম্যাণ্ডার আন্তিলিও গত্তি'' নামে মিত্র পক্ষের এক সৈনিক আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ, পশুপক্ষী ও গাছপালা সম্পর্কে গবেষণা চালাতে গিয়ে যে সব ভয়ংকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তারই রোমাঞ্চকর বিবরণ নিয়ে লিখিত হয়েছে ''কায়না''। এই ঘটনাগুলি পড়ে পাঠক যদি মনে করেন আফ্রিকার মাটিতে পা রাখলেই হিংস্র জন্তু, বিষাক্ত সাপ আর স্থানীয় অধিবাসীদের আক্রমণে বিদেশী আগন্তুকের প্রাণ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে— তাহলে সেই ধারণা হবে নিতান্তই ভুল। নিয়ম শৃঙ্খলার রাজ্যে এই ঘটনাগুলিকে আন্তিলিও ''নিয়মের ব্যাতিক্রম'' বলে উল্লেখ করেছেন। কম্যাণ্ডার আন্তিলিও গত্তি লিখিত এই কাহিনী পাঠ করার সময়ে ''ব্যাতিক্রম'' কথাটি মনে রাখা দরকার।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

সংখ্যার নাম চার
পলাতক
নরকের প্রহরী
ভয়াবহ শিকার কাহিনী
গল্প হলেও গল্প নয়
মরণ-খেলার খেলোয়াড়
ডুয়েল
মৃত্যুপুরীর অতিথি
দেবী দর্শন
বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে (কমিকস্)
খাপে ঢাকা তরবার (,,)
মৃত্যুহীন প্রাণ (,,)
মহাকালের মন্দির (,,)
শেরউডবনের রবিনহুড (,,)
রহস্যময় রবিনহুড (,,)

সৈলিকের প্রথম অভিজ্ঞতা —

কায়না

প্রথম পরিচ্ছেদ : রহস্যময় মৃত্যু

কায়না!

মৃত্যুগহ্বর!

হ্যাঁ, উত্তর রোডেশিয়ার স্থানীয় ভাষা 'কায়না' শব্দটির অর্থ—'যাতনাদায়ক মৃত্যুগহ্বর'!

—'কায়না! একবার, মাত্র একবারই ঐ ভয়ানক শব্দ উচ্চারণ করেছিল স্থানীয় পুলিস কর্মচারী, তারপরই তার মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।'

'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! 'মিঃ হুইংক্লির মুখে পূর্বোক্ত ঘটনা শুনে চমকে উঠলেন পর্যটক আন্তিলিও গত্তি, 'কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল?'

'হ্যাঁ।'—উত্তর রোডেশিয়ার প্রাদেশিক কমিশনার মিঃ হুইংক্লি বললেন, 'স্থানীয় পুলিস জনৈক নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সন্ধান করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে তার বক্তব্য পেশ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু 'কায়না' শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর। ঘটনাটা হঠাৎ শুনলে খুব অদ্ভুত ও অলৌকিক মনে হয়, তবে একটু ভেবে দেখলে সমস্ত বিষয়টার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা সম্ভব। লোকটির হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা ভাল ছিল না, আর অনেকটা পথ সে দৌড়ে এসেছিল— তাই অত্যধিক পরিশ্রম ও উত্তেজনার ফলে দুর্বল হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটা খুব অসম্ভব নয়। আমি স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে দুবার 'কায়না'র নাম শুনেছি। কিন্তু প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় বারও 'কায়না' সম্বন্ধে কোনও জ্ঞাতব্য বিষয় আমার কর্ণগোচর হয়নি; কারণ সেবারেও মৃত্যু এসে অতর্কিতে বক্তার কণ্ঠরোধ করেছিল।'

আন্তিলিও বললেন, 'প্রথমবারের ঘটনা তো শুনলাম। দ্বিতীয়বারের ঘটনাটা বলুন।'

কমিশনার মিঃ হুইংক্লি বললেন, 'একটি স্থানীয় বৃদ্ধার মুখে আমি দ্বিতীয়বার ঐ কথাটা শুনেছিলাম। সে আমাকে জানিয়েছিল, কায়নার ভিতর তার চার পুত্র সন্তানকে নিক্ষেপ

করা হয়েছে। আর কোনও কথা শোনার সুযোগ আমার হয়নি। কারণ ঐটুকু বলেই বৃদ্ধা চুপ করেছিল।'

আত্তিলিও প্রশ্ন করলেন, 'ভয়ে চুপ করেছিল ?'

উত্তর এল—'না। সেই মুহূর্তেই তার মৃত্যু হয়েছিল।'

আত্তিলিও বৃদ্ধার মৃত্যুকে বিষপ্রয়োগে হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কমিশনার হুইংক্লি জানালেন আত্তিলিওর সন্দেহ অমূলক।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মিঃ হুইংক্লি, তারপর বললেন, 'আমার মনে হয় কায়নার কথা উল্লেখ করেছিল বলেই যে বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছিল তা নয়, বরং ঠিক উল্টো ব্যাপারটা ঘটেছিল।'

—'অর্থাৎ আপনি বলতে চান মৃত্যু আসন্ন বুঝেই বৃদ্ধা কায়নার বিষয়ে উল্লেখ করতে সাহস পেয়েছিল ?'

—'হ্যাঁ। স্থানীয় অধিবাসীদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সজাগ। আসন্ন মৃত্যুকে তারা অনুভব করতে পারে। অন্তিম মুহূর্তে বৃদ্ধা কায়নার রহস্য ফাঁস করে দিতে চেয়েছিল ; দুর্ভাগ্যক্রমে তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যু তার কণ্ঠ রোধ করে।'

গল্প করতে করতে পূর্বোক্ত ঘটনা দুটির বিবরণ দিচ্ছিলেন উত্তর রোডেশিয়ার প্রাদেশিক কমিশনার মিঃ হুইংক্লি, এবং দুই বন্ধুর পাশে বসে সাগ্রহে তাঁর কথা শুনছিলেন আত্তিলিও গত্তি। বন্ধু দুটির নাম প্রফেসর ও বিল। বন্ধুদের সম্পূর্ণ নাম আত্তিলিও তাঁর কাহিনীর মধ্যে উল্লেখ করেননি, অতএব আমরাও তাঁদের 'প্রফেসর' আর 'বিল' নামেই ডাকব।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ করেছিলেন কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অফ্রিকার জীবজন্তু ও মানুষ সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উক্ত মহাদেশের কয়েকটি স্থানে তিনি ভ্রমণ করতে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। ঐ কাজে তাঁর সহায় ছিলেন পূর্বোক্ত দুই বন্ধু, প্রফেসর ও বিল। উত্তর রোডেশিয়ার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত অনেকগুলো জলাভূমি আবিষ্কার করেছিলেন আত্তিলিও এবং তাঁর দুই বন্ধু। শুধু তাই নয়, বিস্তীর্ণ জলাভূমিগুলোর অবস্থান নির্ণয় করার উপযুক্ত একটি মানচিত্রও তাঁরা তৈরি করে ফেলেছিলেন। স্থানীয় গভর্নর অভিযাত্রীদের সাফল্যে খুশী হয়ে তিন বন্ধুকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আহারাদির পর তাঁরা গভর্নরের লাইব্রেরীতে এলেন কফি পান করার জন্য।

প্রফেসর হঠাৎ উত্তর রোডেশিয়ার বনভূমি সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করলেন। জলাভূমিগুলো পরিদর্শন করে ফিরে আসার সময়ে ঐ অঞ্চলের 'গ্র্যানাইট' পাথর দেখেই তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন—

'এমন অদ্ভুত নিসর্গ দৃশ্য আমি আফ্রিকার কোনও জায়গায় দেখিনি।'

অরণ্যের পটভূমিতে অবস্থিত অসংখ্য প্রস্তরসজ্জিত গুহার দৃশ্য বিলকেও অভিভূত করে দিয়েছিল।

নৈশভোজে উপস্থিত রাজপুরুষদের মধ্যে প্রাদেশিক কমিশনার মিঃ হুইংক্লি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি উত্তর রোডেশিয়ার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত— ঐ অঞ্চলের কোনও বৈশিষ্ট্যই তাঁর অজানা ছিল না।

মিঃ হুইংক্লি বললেন, 'কোনও শ্বেতাঙ্গ এই অঞ্চল পরিদর্শন করেননি। এখানে গাড়ি চলার রাস্তা নেই। যতদূর জানি, খনিজ দ্রব্যও পাওয়া যায় না। 'মাম্বোয়া' নামক যে নিগ্রো জাতি এখানে বাস করে তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তারা লাজুক প্রকৃতির এবং শ্বেতাঙ্গদের সংস্পর্শে আসতে অনিচ্ছুক—সরকারও তাদের ঘাঁটিয়ে অনর্থক বিপত্তির সৃষ্টি করতে চান না।'

মিঃ হুইংক্লির কথা শুনে প্রফেসর ও বিল দুজনেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা দুজনেই উৎসাহের সঙ্গে জানালেন যে, ঐ অঞ্চলের বিচিত্র নিসর্গ-দৃশ্য দেখে তাঁদের ধারণা হয়েছে প্রকৃতি-দেবীর বহু গোপন তথ্য সেখানে লুকানো আছে এবং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে তাঁদের পক্ষে সেই গোপন রহস্যগুলো অবিষ্কার করা খুব কঠিন হবে না। আত্তিলিও কোনও কথা বলেননি, সঙ্গীদের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি তখন পর্যন্ত— ঐ ধরনের অভিযানের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধা ছিল, তাই কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেননি আত্তিলিও সাহেব।

মিঃ হুইংক্লি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আপনারা যদি মৃত্যুগহ্বর আবিষ্কার করতে পারেন, তাহলে একটা কাজের মতো কাজ হয় বটে!'

—'মৃত্যুগহ্বর! সে আবার কি ?'

তিন বন্ধুই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

কমিশনার মিঃ হুইংক্লি তখন যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে—'কায়না' নামক এক মৃত্যুগহ্বরের কথা স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে শোনা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে উক্ত স্থানের সত্যিই কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে তিনি খুব নিঃসন্দেহ নন। হয়তো সবটাই গুজব অথবা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন স্থানীয় মানুষের কল্পনার ব্যাপার। তবে পর পর দুবার 'কায়না' শব্দটি যে মিঃ হুইংক্লির শ্রুতিগোচর হয়েছিল সে কথাও তিনি জানিয়ে দিলেন এবং তারপর পুলিস কর্মচারী ও বৃদ্ধার মৃত্যু নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল সেই আলেচনার বিস্তারিত বিবরণ এই কাহিনীর শুরুতেই বলা হয়েছে।

সব কথা শুনে বিল আর প্রফেসর ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সম্ভব হলে সেই মুহূর্তেই তাঁরা মৃত্যুগহ্বরের সন্ধানে যাত্রা করতে প্রস্তুত! আত্তিলিও বন্ধুদের কথায় খুব উৎসাহ প্রকাশ না করলেও কায়না-অভিযানে তাঁর আপত্তি ছিল না। শেষকালে অবশ্য বিপদের গুরুত্ব বুঝে প্রফেসর ও বিল পিছিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মহাযুদ্ধের সৈনিক অত্তিলিও গত্তি একবার কাজ শুরু করে পিছিয়ে আসতে রাজি হলেন না—উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বারবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখে।

সে সব কথা ক্রমস : প্রকাশ্য।

গভর্নরের বাড়ি থেকে নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসতেই তিন বন্ধু অভিযানের পরিকল্পনা স্থির করে ফেললেন। তাঁরা জানতেন স্থানীয় সরকার তাঁদের সাহায্য করবেন। কিন্তু সরকারের সাহায্য পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। কাজটা খুবই কঠিন। মাম্বোয়া জাতির প্রধান ব্যক্তিরা অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্য জানতে পারলে বিভিন্ন উপায়ে তাঁদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং সেই বাধা-বিপত্তি জয় করে প্রায় ৩০,০০০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে শ্বাপদ-সঙ্কুল অজানা স্থানে এক গোপন গুহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যে কতখানি কঠিন, সে কথা অন্ততঃ আত্তিলিওর অজ্ঞাত ছিল না—বিপদের গুরুত্ব বুঝেই তিনি এই অভিযান সম্পর্কে প্রথমে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। কিন্তু অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করে আত্তিলিওর মনের ভাব বদলে গেল। বাস্তব-জগতে যদি সত্যিই মৃত্যুগুহার অস্তিত্ব থাকে, তবে যেমন করেই হোক ঐ জায়গাটা খুঁজে বের করার প্রতিজ্ঞা করলেন আত্তিলিও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ত্রয়ী

কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি যে প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে আফ্রিকা মহাদেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্যই আফ্রিকা ভ্রমণে উদ্যোগী হয়ে উত্তর রোডেশিয়াতে পদার্পণ করেছিলেন, সে কথা এই কাহিনীর প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে।

কিন্তু সেনাবাহিনীর মানুষটি হঠাৎ সৈনিকের ভূমিকা ত্যাগ করে পর্যটকের ভূমিকা গ্রহণ করতে উৎসুক হয়ে উঠলেন কেন সে কথা জানতে হলে কম্যাণ্ডার সাহেবের পূর্বজীবন নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। প্রফেসর ও বিল নামে আত্তিলিওর যে দুজন বন্ধুর নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও বর্তমান কাহিনীর পাঠকদের বিশেষ পরিচয় হওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রথমেই ধরা যাক আত্তিলিওর কথা, কারণ তিনি হলেন এই কাহিনীর নায়ক।

সুদীর্ঘ চার বৎসর ধরে জ্বলতে জ্বলতে প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বগ্রাসী অগ্নি যখন নির্বাণলাভের উপক্রম করছে—অর্থাৎ যুদ্ধের শেষ দিকে—হঠাৎ আহত হলেন আত্তিলিও সাহেব। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে মিশরে পাঠানো হল। আত্তিলিওর বুকে গুলি লেগেছিল ; তার উপর 'ফ্লু'রোগের আক্রমণ তাঁকে যক্ষ্মার কবলে ঠেলে দিল। মাত্র তেইশ বছর বয়সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে আত্তিলিও খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসক তাঁকে বললেন, সাহারা মরুভূমিতে সূর্যের তাপে উত্তপ্ত বালির মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকলে আত্তিলিওর অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

আত্তিলিও ডাক্তারের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। গরম বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে তিনি বসে থাকতেন। মাত্র একমাস পরেই তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁর দেহ রোগমুক্ত হয়েছে এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ইতিমধ্যে বিস্তর আরব-বেদুইনের সঙ্গে তিনি ভাব জমিয়ে ফেলেছেন। মরুভূমির মধ্যে একটা সজীব নরমুণ্ড দেখে তারা কৌতূহলী হয়ে ছুটে আসত এবং লুপ্ত বালুকার গর্ভে আত্তিলিওকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করত। ঐ সময়ে আরবী ভাষার সঙ্গে আত্তিলিওর পরিচয় হয়।

সাহারার তপ্ত বালি আত্তিলিওর যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দিল। গুলির আঘাতে তাঁর দেহে যে ক্ষত হয়েছিল, সেই ক্ষতস্থানও শুকিয়ে গেল। কিন্তু এইবার এক নতুন দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁকে আক্রমণ করল। যক্ষ্মার চেয়েও মারাত্মক এই রোগের নাম আফ্রিকা-জ্বর। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ আফ্রিকাকে ভালবেসে পাগল হয়—অরণ্য, পর্বত, নদী ও মরুভূমি-সজ্জিত এই বিশাল মহাদেশ তার দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সন্তানদের নিয়ে বিদেশী মানুষকে এমন দুর্ভেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে ধরে যে, কিছুতেই তার নিস্তার থাকে না। আফ্রিকা-জ্বরে আক্রান্ত মানুষ পৃথিবীর কোন স্থানে গিয়েই স্বস্তি পায় না—বারবার সে ঘুরে ফিরে আসে আফ্রিকার বুকে, বন্য প্রকৃতির সাহচর্য উপভোগ করার জন্য। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বিদেশী এই আফ্রিকা-জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন।

পূর্বোক্ত আফ্রিকা-জ্বর আত্তিলিও সাহেবকে আক্রমণ করেছিল। নিউইয়র্কে গিয়ে তিনি আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করার আয়োজন শুরু করলেন। উক্ত মহাদেশের বিষয়ে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তিনি একটি অভিযান পরিচালনা করার সংকল্প করেন এবং ঐ কাজে তাঁকে সাহায্য করার উপযুক্ত মানুষের সন্ধান করতে থাকেন। সেই সময়ে প্রফেসরের সঙ্গে আত্তিলিও গত্তির সাক্ষাৎ হয়। আত্তিলিওর অভিযানে বিজ্ঞান-বিষয়ক যে কোনও ব্যাপারেই প্রফেসরের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হত। প্রফেসরের সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ করেননি আত্তিলিও ; তিনি ভদ্রলোককে প্রফেসর বলেই ডাকতেন, আমরাও তাই ডাকব। আত্তিলিওর লিখিত বিবরণী থেকে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, প্রফেসর একজন ফরাসী চিকিৎসক।

এবার বিলের কথা বলছি। সংবাদপত্রে অভিযান-পরিচালনার কাজে সহকারীর জন্য যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন আত্তিলিও, সেই বিজ্ঞাপন দেখেই বিল আকৃষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে বিল একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিল। চিঠি পড়ে আত্তিলিও জানতে পারলেন যে, বিল মোটা মাহিনায় একটি হিসাব-পরীক্ষার প্রতিষ্ঠানে কার্যে নিযুক্ত আছে এবং অবসর সময়ে পড়াশুনা করে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করেছে। হিসাব পরীক্ষা ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে বিল যেটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, সেই অভিজ্ঞতা আত্তিলিওর কাজে লাগতে পারে বলেই বিলের বিশ্বাস এবং আত্তিলিও যদি তাকে অভিযানে অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে হিসাব-পরীক্ষার অফিসে মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে সে যে সাগ্রহে অভিযানে যোগ দিতে রাজি আছে, এই কথাও জানিয়ে দিয়েছে বিল লিখিত আবেদনপত্রে।

এই ধরনের বহু চিঠি আসত প্রতিদিন, কিন্তু বিলের চিঠি হঠাৎ আত্তিলিওর খুব ভাল লেগে গেল। পত্রযোগে তিনি বিলকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। প্রথম দর্শনেই তিনি বিলকে পছন্দ করলেন, কয়েক মিনিট কথা বলেই তিনি বুঝলেন, ঠিক বিলের মতো

মানুষকেই তাঁর প্রয়োজন। বিলের পূর্বজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করে আন্ডিলিও জানলেন, মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সেই এক দুর্ঘটনার ফলে সে পিতৃমাতৃহীন হয়েছিল। বিলের এক আত্মীয়া তাকে সন্তানস্নেহে পালন করেছিলেন, তাঁর যত্নেই বিল মানুষ হয়েছে। যে দুর্ঘটনার ফলে বিল তার মা-বাবাকে হারিয়েছিল, সেই ঘটনার কথা সে আন্ডিলিওকে বলেনি। পরে অবশ্য বলেছিল, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে—অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত থাকলেও নিয়তির নিষ্ঠুর চক্রান্তকে বাধা দিতে পারেন নি আন্ডিলিও। যে দুর্ঘটনার ফলে বিল প্রথমে মা এবং পরে বাবাকে হারিয়েছিল, সেই ঘটনার বিশদ বিবরণ আগে শুনলে হাতিশিকারের জন্য বিলের অস্বাভাবিক আগ্রহের কারণ অনুমান করে আন্ডিলিও সাবধান হতেন, কিছুতেই তাকে আফ্রিকায় নিয়ে যেতেন না।

বিলের মা-বাবা যে অভাবিত ঘটনার শিকার হয়েছিলেন, নিউইয়র্কে সংঘটিত সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা হচ্ছে বাস্তব-জীবনের এক ভয়াবহ নাটক; এবং সেই নাটকের রক্ত-রঞ্জিত শেষ দৃশ্যের যবনিকা পড়েছিল অরণ্য-আবৃত আফ্রিকার অন্তঃপুরে।

যথাসময়ে সেই কাহিনী আমরা জানতে পারব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নাম-মাহাত্ম্য

গভর্নরের বাড়ি থেকে নৈশভোজে আপ্যায়িত হয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসার পথে তিন বন্ধুর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল এবং সেই আলোচনার ফলে তাঁরা যে মৃত্যুগহ্বরের সন্ধানে অভিযান চালানোর সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি, এখন দেখা যাক পরবর্তী ঘটনার স্রোত তিন বন্ধুকে কোন পথে নিয়ে যায়।

কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যার পর তাঁবুতে বসে আছেন তিন বন্ধু। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে রাতের খানা নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল একটি ছোকরা চাকর। তিন বন্ধু লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন, ছোকরার হাতের উপর মস্ত বড় থালাতে ঝোলের মধ্যে শুয়ে একটা মুরগী, সর্বাঙ্গ থেকে ধূম-উদ্গীরণ করছে। চিকেনকারি! গরম!

তিন বন্ধুর রসনা সজল হয়ে উঠল।

হঠাৎ কি খেয়াল হল, প্রফেসর বলে উঠলেন, 'কায়না!'

ঝন্-ঝনাৎ! অ্যালুমিনিয়মের থালাটা ছোকরার হাত থেকে ছিটকে পড়ল মাটির উপর!

দারুণ ক্রোধে চেঁচিয়ে ওঠার উপক্রম করলেন আন্ডিলিও, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরিয়ে আসার আগেই চাকরটা তীরবেগে তাঁবুর বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আন্ডিলিও তৎক্ষণাৎ চাকরদের তাঁবুর দিকে পা চালিয়ে দিলেন। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছনোর আগেই তিনি শুনতে পেলেন কয়েকটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, পরক্ষণেই দ্রুত ধাবমান পায়ের আওয়াজ।......

তিন বন্ধু হঠাৎ অবিষ্কার করলেন, তাঁরা তিনজন ছাড়া আশেপাশে কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই, নিগ্রো চাকররা সবাই অদৃশ্য হয়েছে।

না, সবাই নয়, জামানি নামক জুলু জাতীয় যে রাঁধুনিটি অভিযাত্রীদের একান্ত বিশ্বাসের পাত্র ছিল, সেই লোকটি স্থান ত্যাগ করে পালায়নি। পলাতক পাঁচটি চাকরই ছিল উত্তর রোডেশিয়ার স্থানীয় অধিবাসী। প্রফেসরের মুখে 'কায়না' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ছোকরা চাকর সকলের কাছে সেই সংবাদ বিতরণ করেছে, এবং তার ফলেই বিহ্বল হয়ে মানুষগুলো যে গা-ঢাকা দিয়েছে, এ বিষয়ে অভিযাত্রীদের কোন সন্দেহ ছিল না।

রাতের লোভনীয় খাদ্য মাটির উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে, চাকররা উধাও হয়েছে জিনিসপত্র ফেলে, তিন বন্ধুর চোখ-মুখ কিন্তু আনন্দে উজ্জ্বল। একটা স্পষ্ট সত্য তাঁরা বুঝতে পেরেছেন : ভৃত্যদের দারুণ আতঙ্ক প্রমাণ করেছে মৃত্যুগহ্বর অলীক কল্পনা নয়। বাস্তব-জগতেই বিরাজ করছে ঐ ভয়-দেখানো ভয়ানক 'কায়না'।

শুকনো খাদ্যের টিন খুলতে খুলতে অভিযাত্রীরা প্রতিজ্ঞা করলেন, 'কায়না' নামের ঐ বিভীষিকাকে যেমন করেই হোক তাঁরা আবিষ্কার করবেন।

প্রতিজ্ঞা করা সহজ, প্রতিজ্ঞা রাখা সহজ নয়।

উত্তর রোডেশিয়ার স্থানীয় মানুষ মাম্বোয়ারা অভিযাত্রীদের এড়িয়ে চলতে লাগল। মাম্বোয়া জাতির কোনও লোকের কাছে পথের সন্ধান চাইলে সে ভুল পথের নির্দেশ দিত, কাজ করতে বললে পলায়ন করত ঊর্দ্ধশ্বাসে। চারদিক থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসত তিন বন্ধুর কানে, এখানে-ওখানে চোখে পড়ত শূন্যে ভাসমান ধোঁয়ার কুণ্ডলী— মাম্বোয়াদের সঙ্কেত।

অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্য এখন আর মাম্বোয়াদের অজানা নয়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভেসে যায় ধোঁয়ার অক্ষরে লেখা কুণ্ডলীপাকানো দুর্বোধ্য সতর্কবাণী—'সাবধান! সাদা মানুষ এসেছে মৃত্যুগহ্বরের সন্ধানে।'

ঢাকের আওয়াজ ও ধোঁয়ার সাঙ্কেতিক অর্থ সঠিক ভাবে বোধগম্য না হলেও মাম্বোয়াদের মনোভাব অভিযাত্রীরা বুঝতে পেরেছিলেন।

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেও জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ পেলেন না তিনবন্ধু। অভিযাত্রীদের আগমন-সংবাদ আগেই পেয়ে যেত গ্রমাবাসীরা এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা যে স্থান ত্যাগ করত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই! অভিযাত্রীরা বুঝলেন, মাম্বোয়া-জাতি তাঁদের 'বয়কট' করছে!

অবশেষে তাঁরা জেলা-কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বললেন। কমিশনার তাঁদের কথা শুনে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন এবং সক্রিয়ভাবে অভিযাত্রীদের সাহায্য করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু মাম্বোয়াদের মধ্যে যারা কমিশনারের একান্ত অনুগত ছিল, তারাও তাঁর কথায় অভিযাত্রীদের দলে যোগ দিতে রাজি হল না। অবশেষে চারজন মাম্বোয়া বন্দী অভিযাত্রীদের দলে কাজ করতে সম্মত হল। তারা বোধহয় ভেবেছিল, দিনের পর দিন বন্দী অবস্থায় গাধার খাটুনি না খেটে (ঐ সময়ে একটা রাস্তা তৈরীর কাজে তারা নিযুক্ত

ছিল) যদি পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছু অর্থ উপার্জন করা যায়, তাহলে ক্ষতি কি? তা ছাড়া, ভালভাবে কাজ করলে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জেলা কমিশনার। অতএব বন্দী চারজন মহা উৎসাহে অভিযাত্রীদের দলে যোগ দিল।

ইতিমধ্যে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে অভিযাত্রীদের দস্তুর মতো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। কমিশনার বেশ বুদ্ধিমান মানুষ, তিনি রটিয়ে দিলেন গুহাবাসী জন্তুজানোয়ার দেখার জন্যই অভিযাত্রীরা এই অঞ্চলে পদার্পণ করেছেন। ধাপ্পায় কাজ হল; মাম্বোয়ারা অভিযাত্রীদের সঙ্গে কিছুটা সহজভাবে মেলামেশা শুরু করল। তিন বন্ধু এবার সাবধান হয়েছেন। কায়নার নাম-মাহাত্ম্য যে বিপত্তির সূচনা করেছিল, তা এত শীঘ্র ভুলে যাওয়ার কথা নয়— কেউ আর কায়নার নাম মুখে আনতেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গুহাতে মৃত্যুর হানা

কায়না-অভিযান ভালভাবে চালানোর জন্য একটা মানচিত্রের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উক্ত বস্তুটিকে কোথাও পাওয়া গেল না বলে অভিযাত্রীরা ঠিক করলেন, তাঁরা নিজেরাই এলাকাটা পরিদর্শন করে একটা চলনসই মানচিত্রের খসড়া তৈরী করে নেবেন।

কাজটা দু'চার দিনের মধ্যে হওয়ার নয়, বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই যে কয়দিন ওটা তৈরী না হয়, সেই কয়দিনের জন্য একটা স্থায়ী আস্তানার প্রয়োজন। অতএব স্থায়িভাবে একটা তাঁবু খাটানো হল। তাঁবুটা যেখানে পাতা হয়েছিল সেই জায়গাটার চারিদিকে পড়েছিল অজস্র 'গ্র্যানাইট' পাথর। সমস্ত অঞ্চলটা যেন গ্র্যানাইট পাথরের রাজত্ব— যেদিকে চোখ যায় খালি পাথর আর পাথর।

একটা তাঁবু খাঁটিয়েই কাজ শেষ হল না। জিনিসপত্র সাজসরঞ্জাম মজুত করার জন্য কয়েকটা কুঁড়েঘর তোলা দরকার— কিন্তু শক্ত পাথুরে-মাটির উপর খুঁটি পুঁতে ঘর তোলা কি দু'চারজনের কাজ? তা ছাড়া বাক্স-বন্দী অজস্র সাজসরঞ্জাম বহন করার জন্যও তো কিছু লোকের দরকার। খুঁটিনাটি আরও যে সব কাজ ছিল তার জন্যও লোক চাই, অর্থাৎ বেশ কিছু জনমজুর না হলে অভিযাত্রীদের আর চলছে না।

তিন বন্ধুর সঙ্গে যে চারজন মাম্বোয়া-বন্দী কাজ করার জন্য এসেছিল, তাদের, এবার পদোন্নতি ঘটল। খাটুনির কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে আন্তিলিও তাদের জন-মজুর সংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত করলেন— তারা হয়ে গেল 'রিক্রুটিং অফিসার'!

কাজটা তাদের খুব পছন্দ হয়েছিল; ঐ কাজে তারা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল। মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক এবং নানারকম উপহার পেয়ে মাম্বোয়ারা ভারি খুশী; সেই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই লুব্ধ জনতার স্রোত এমনভাবে বাড়তে লাগল যে মাসখানেক পরেই অভিযাত্রীরা দেখলেন লোকের অভাবে বিপন্ন হওয়ার কোনও কারণ আর নেই।

মাম্বোয়ারা খুব মন দিয়ে কাজ করতে লাগল। মাম্বোয়া সর্দার অভিযাত্রীদের জানাল,

তার প্রজাদের মধ্যে চারজনকে তাঁরা বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছে বলে সে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং সবরকমে তাঁদের সাহায্য করতে সে প্রস্তুত। বন্দী চারজন স্থানীয় মানুষ, অন্তত: শতাধিক গুহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল, তবু যদি প্রয়োজন হয় সর্দার নিজে তাদের সাহায্য করবে— অবশ্য যদি তাঁরা সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেন।

খুব ভাল কথা। খুব আনন্দের কথা। বিল ও প্রফেসর মাম্বোয়া-সর্দারের কথায় ও ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কিন্তু আন্তিলিওর মনে খটকা লাগল— হঠাৎ মাম্বোয়ারা অভিযাত্রীদের সাহায্য করার জন্য এতটা ব্যাকুল হয়ে উঠল কেন? এটা অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ নয় তো? আন্তিলিও বন্ধুদের কাছে তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করলেন না, মনের কথা মনেই চেপে রাখলেন।

অভিযানের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চালানোর জন্য অভিযাত্রীরা পরামর্শ করতে বসলেন। পরামর্শের ফলে স্থির হল, প্রত্যেক দিন তিন বন্ধু তিন দিকে যাবেন। বন্দী মাম্বোয়া চারজনের মধ্যে দুজন যাবে প্রফেসরের সঙ্গে, দুজন যাবে বিলের সঙ্গে এবং জামানি নামক জুলু-অনুচরটি থাকবে আন্তিলিওর সঙ্গে। পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি দল হবে তিনটি ভিন্ন পথের পথিক।

অল্প সময়ের মধ্যে একটা বৃহৎ এলাকা পরিদর্শন করার পক্ষে ঐ পরিকল্পনা খুবই উপযোগী ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভাবতে গেলে বলতে হয় পরিকল্পনাটা ছিল অতিশয় মারাত্মক। কারণ, গুহার মধ্যে প্রবেশ করে অভিযাত্রীদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যদি কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হন, তবে সম্পূর্ণ এককভাবেই তাঁকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। নিগ্রোদের মধ্যে কেউ গুহার ভিতর প্রবেশ করতে চাইবে না— তারা অপেক্ষা করবে গুহার বাইরে—এবং গুহার ভিতর থেকে আচম্বিতে শ্বাপদকণ্ঠের হিংস্র গর্জন কানে এলে তারা যে পদযুগলের দ্রুত ব্যবহার না করে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে, এমন নিশ্চয়তা আছে কি? নিগ্রোরা স্থানীয় মানুষ, খুব সহজেই পথ চিনে তারা তাঁবুতে ফিরে আসতে পারবে, কিন্তু বিদেশী অভিযাত্রী শ্বাপদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলেও গুহার বাইরে এসে নিগ্রোদের দেখা না পেলে আবার বিপদে পড়বেন— ছোট বড় অসংখ্য গ্র্যানাইট পাথরের দুর্গ, সুড়ঙ্গ আর গোলকধাঁধা ভেদ করে তাঁর পক্ষে সঠিক পথের নিশানা ধরে তাঁবুতে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব।

এই সব বিপদের সম্ভাবনা তুচ্ছ করেই অভিযাত্রীরা অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বিপদ যে হয়নি তা নয়, হয়েছিল। জামানি এবং মাম্বোয়া পথপ্রদর্শকরা সকলেই গুহার সান্নিধ্য অপছন্দ করত। পথ দেখিয়ে গুহার সামনে নিয়ে যেতে তাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু গুহার প্রবেশ পথ থেকে প্রায় ফুট পঞ্চাশ দূরে এসেই তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত, কিছুতেই আর অগ্রসর হতে চাইত না। তাদের দোষ নেই; কয়েকদিনের ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে তাদের ভয় পাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

একটা অজানা গুহার মধ্যে একদিন হঠাৎ বিলের সঙ্গে একটা হায়নার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। বিল গুলি ছুঁড়ল— গুহার অস্পষ্ট অন্ধকারে তার নিশানা ভাল হয়নি,— ফলে জন্তুটা মরল না। আহত হল। দ্বিতীয়বার গুলি চালিয়ে হায়নাটাকে হত্যা করার আগে জন্তুটা

বিলের হাঁটুতে একবার নখের আঁচড় বসিয়েছিল। বিল ক্ষতটার দিকে নজর দেয়নি। হায়না মেরে সে গুহার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল এবং তারপরেও ক্ষতচিহ্নটাকে 'সামান্য আঘাত' বলে তুচ্ছ করেছিল। তাচ্ছিল্যের পরিণাম বিলের পক্ষে ভাল হয়নি। সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে তার ক্ষতটা এমন ভীষণভাবে বিষিয়ে উঠল যে আত্তিলিও ভাবলেন বিলকে বাঁচানোর জন্য ঐ পা-টিকে হয়তো কেটে ফেলতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে 'পদমর্যাদা' অক্ষুণ্ণ রেখেই বিল সে যাত্রা আরোগ্য লাভ করতে সমর্থ হয়।

আর একবার ভারসাম্য হারিয়ে প্রফেসর হঠাৎ পড়ে গেলেন একটা শুকনো গাছের ডালপালার মধ্যে। ডালগুলোতে পাতা ছিল না একটিও। কিন্তু কাঁটা ছিল প্রচুর পরিমাণে। কাঁটার আঘাতে প্রফেসরের জামাকাপড় হল ছিন্নভিন্ন, দেহের চামড়ায় হল একাধিক ছিদ্রের সৃষ্টি এবং ঐ ছিদ্রপথে কাঁটার বিষ প্রফেসরের রক্তে ঢুকে তাঁকে শয্যাশায়ী করে দিল। কাঁটার মধ্যে কি ধরনের বিষ ছিল ভগবানই জানেন— ঝাড়া দশদিন ধরে প্রফেসর ভুগলেন প্রচণ্ড জ্বরের আক্রমণে।

জ্বরের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে একটু সুস্থ হয়েই প্রফেসর আবার মৃত্যুগহ্বরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। এবার আর কাঁটা নয়, দু দুটো সিংহের সঙ্গে প্রফেসরের দেখা হল একটা অজানা গুহার মধ্যে। প্রফেসর গুলি ছুঁড়লেন, গুলি লাগল না। সিংহরা আক্রমণের চেষ্টা না করে বিদ্যুদ্বেগে গুহার বাইরে অদৃশ্য হল— রাইফেলের গর্জিত অগ্নিশিখা তাদের মোটেই পছন্দ হয়নি। প্রায় অন্ধকার গুহার ভিতর দু'দুটো সিংহের মারাত্মক সান্নিধ্য থেকে অক্ষত অবস্থায় পরিত্রাণ পেয়ে খুশী হয়ে প্রফেসর বাইরে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর মাম্বোয়া সঙ্গীদের তিনি দেখতে পেলেন না। প্রফেসর বুঝলেন হয় তারা সিংহের কবলে পড়েছে, আর না হয় তো সিংহদের দেখে গা-ঢাকা দিয়েছে। শেষোক্ত সন্দেহই সত্যি, সিংহদের দেখে তারা দৌড়ে পালিয়েছিল। প্রফেসর যদি বুদ্ধিমানের মতো গুহার সামনে অপেক্ষা করতেন তাহলে তিনি অনেক দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পেতেন। কারণ, মাম্বোয়ারা তাঁবু থেকে আত্তিলিওকে নিয়ে অকুস্থলে ফিরে এসেছিল। প্রফেসরকে অবশ্য সেখানে পাওয়া যায়নি। মাম্বোয়াদের না দেখতে পেয়ে প্রফেসর নিজেই তাঁবুতে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলেন এবং দিশাহারা হয়ে গন্তব্যস্থলের বিপরীত দিকে হাঁটতে হাঁটতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে মাম্বোয়াদের সাহায্যে আত্তিলিও যখন আড়াইদিন পরে প্রফেসরকে আবিষ্কার করলেন, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং জ্বরের আক্রমণে ভদ্রলোকের অবস্থা রীতিমতো শোচনীয়।

আমাদের কাহিনীর নায়ক স্বয়ং আত্তিলিও সাহেবও সঙ্গীদের মতোই গুহার ভিতর বিপন্ন হয়েছিলেন।

সিংহ নয়, হায়না নয়, একটি ছোট গোলাকার মাংসপিণ্ডের রোমশ শরীরের উপর হোঁচট খেয়ে আত্তিলিও প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। একদিন বিকেল বেলা আত্তিলিওর বিশ্বস্ত অনুচর জামানি তাঁকে একটা সুড়ঙ্গের সামনে এনে জানাল ওটা একটা গুহার প্রবেশপথ। পথটা ছিল নীচু, খুবই সঙ্কীর্ণ। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেন আত্তিলিও, তারপর

হামাগুড়ি দিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। অনেকক্ষণ ঐভাবে চলার পর তাঁর মনে হল এতক্ষণে বোধহয় তিনি সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে গুহার ভিতর পৌঁছেছেন। হাতের টর্চ জ্বেলে তিনি দেখলেন তাঁর অনুমান সত্য— বিজলিবাতির ক্ষীণ আলোকধারা হারিয়ে গেছে এক অন্ধকার-আচ্ছন্ন গুহার বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে। ঐ বিশাল গুহার অভ্যন্তরে পদার্পণ করলে প্রস্তরবেষ্টিত গলিপথগুলোর ভিতর পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে, অতএব ভিতর দিকে এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ হবে কিনা ভাবতে লাগলেন আত্তিলিও এবং ভাবতে ভাবতেই হামাগুড়ি-দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন তিনি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পায়ের উপর সেই বস্তুটির অস্তিত্ব অনুভব করলেন! সঙ্গে সঙ্গে গুহার শান্ত নীরবতা ভঙ্গ করে জেগে উঠল একটা শব্দ 'ফাঁস্‌স্'! পরক্ষণেই জুতোর চামড়ার উপর ধারালো বস্তুর সংঘাতের শব্দ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জ্ঞান হারালেন আত্তিলিও

টর্চের আলোটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে পায়ের উপর ফেলে আত্তিলিও দেখলেন, তাঁর জুতোর সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে হলুদের উপর কালো-কালো ছাপ-বসানো একটা রোমশ ফুটবল! সেই অতিজীবন্ত ও অতি ক্রুদ্ধ ফুটবলের মতো গোলাকার বস্তুটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে মার্জারকণ্ঠের গর্জন-ধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে জুতোর উপর ধারালো নখের আঁচড় কাটার শব্দ।

লেপার্ডের বাচ্চা!

বিড়াল জাতীয় জীবের স্বভাব অনুযায়ী বাচ্চাটা সমস্ত দেহটাকে গোল করে পাকিয়ে আত্তিলিওর জুতোটাকে চেপে ধরেছে এবং তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে মোটা 'হান্টিং-বুট'-এর চামড়া!

বাচ্চাটার চেষ্টা সফল হত কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু আত্তিলিও তাকে সেই সুযোগ দিলেন না। সজোরে লাথি মেরে বাচ্চাটাকে তিনি দূরে সরিয়ে দিলেন। জন্তুটার ছিটকে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। অন্ধকার গুহার গর্ভে শ্বাপদ-শিশুর ছোট শরীরটা আত্তিলিওর দৃষ্টিগোচর হল না, কিন্তু রুষ্ট প্রতিবাদ ভেসে এল তাঁর কানে— 'ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস' শব্দে বাচ্চাটা তার বিরক্তি ও ক্রোধ জানিয়ে দিচ্ছে!

আচম্বিতে সেই শব্দে সাড়া দিয়ে গর্জে উঠল আরও অনেকগুলো বাচ্চা লেপার্ড : 'ফ্যাঁস, ফ্যাঁস, ফ্যাঁসস'.....

অন্ধকারের ভিতর শ্বাপদ শিশুদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারলেন না আত্তিলিও, কেবল তাদের ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো গর্জনধ্বনি তাঁর কানে ভেসে আসতে লাগল।

আত্তিলিও ভয় পেলেন।

অনেকটা লেপার্ডের মতো দেখতে চিতা নামক যে জন্তুটি আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করে,

সেই চিতার বাচ্চা দেখলে তিনি ভয় পেতেন না; কিন্তু আন্তিলিওর অভিজ্ঞ চক্ষু ভুল করেনি, জন্তুটা চিতার বাচ্চা নয়, লেপার্ড-শিশুই বটে। চিতা ভীরু জানোয়ার, লেপার্ড হিংস্র ও ভয়ংকর। যে কোনও জায়গায়, যে কোনও লেপার্ড মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক, বিশেষ করে বাচ্চার বিপদের আশঙ্কায় অন্ধকার গুহার ভিতর ক্ষিপ্ত লেপার্ড-জননীর আক্রমণ যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে, সে কথা অনুমান করেই আন্তিলিওর মতো দুঃসাহসী মানুষও ভয় পেয়েছিলেন।

তিনি বুঝেছিলেন, দিনের বেলা অন্ধকার গুহার আশ্রয় ছেড়ে বাচ্চাদের মা বড় লেপার্ডটা বাইরে বেড়াতে যাবে না— সে নিশ্চয়ই গুহার গিতরে কোথাও অবস্থান করছে এবং বাচ্চাদের নিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্যে যে দ্বিপদ জীবটি তার আস্তানায় অনধিকার প্রবেশ করেছে, তাকে আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে আন্তিলিও বাচ্চাদের মা বড় লেপার্ডটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু অন্ধকারে অভ্যস্ত একজোড়া শ্বাপদচক্ষু যে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছে, সেকথা অনুমান করেই আন্তিলিও অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

বাচ্চাগুলো ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দে এতক্ষণ ক্রোধ প্রকাশ করছিল, হঠাৎ তারা একসঙ্গে চুপ করে গেল। আন্তিলিওর অনুমান এইবার নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হল: বাচ্চাদের আকস্মিক নীরবতা বড় লেপার্ডটার সান্নিধ্য প্রমাণ করে দিয়েছে।

পালাতে পারলে আন্তিলিও পালিয়েই যেতেন। কিন্তু অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে হামাগুড়ি দিয়ে চলার সময়ে আক্রান্ত হলে অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করাও সম্ভব হবে না। অতএব পলায়নের চিন্তা ছেড়ে গুহার ভিতর দাঁড়িয়ে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। গুহার দেয়ালে পিঠ রেখে আন্তিলিও টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বড় লেপার্ডটাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে লাগলেন।......

হঠাৎ তাঁর মাংসপেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেল— দুটো বিরাট পাথরের মাঝখানে টর্চের আলোকধারার মধ্যে ভেসে উঠেছে একজোড়া বৃহৎ নিষ্পলক চক্ষু!

চোখদুটো গোল, সবুজ এবং জ্বলন্ত!

মা-লেপার্ড!

বিপদের মুখোমুখি হতেই বিপদের ভয় কেটে গেল। আন্তিলিওর কম্পিত হাত দুটো হঠাৎ সৈনিকের অভ্যস্ত দৃঢ়তায় রাইফেল ও টর্চ আঁকড়ে ধরল, টর্চের আলোতে জ্বলন্ত চোখ দুটির উপর নিশানা স্থির করতে লাগলেন আন্তিলিও।

লেপার্ড লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল রাইফেলের গুলি। গুলি লাগল, কিন্তু শ্বাপদের গতি রুদ্ধ হল না। সশব্দে লেপার্ড এসে আছড়ে পড়ল গুহার প্রস্তর-প্রাচীরের উপর। শ্বাপদের নিশানা ভুল হয়নি, কিন্তু আন্তিলিও স্থান পরিবর্তন করেছেন বিদ্যুৎবেগে। লেপার্ড দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার আগেই আবার গর্জে উঠল রাইফেল, গুলি জন্তুটার মস্তিষ্ক ভেদ করে তাকে মৃত্যুশয্যায় শুইয়ে দিল।

তীব্র উত্তেজনা কেটে যেতেই আন্তিলিও ক্লান্তি বোধ করলেন। কিন্তু ঐ বিপজ্জনক গুহার মধ্যে বিশ্রাম করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সুড়ঙ্গের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি দ্রুতবেগে হামাগুড়ি

দিতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই গুহার বাইরে এসে প্রখর সূর্যালোকের নীচে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

জীবনে সর্বপ্রথম জামানি তার প্রভুর আদেশ অমান্য করল। সে কিছুতেই মৃত লেপার্ডের দেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নিতে রাজি হল না।

'না, মাসাংগা,না',— জামানি বলল, 'এই জন্তুটার চামড়া আমি ছাড়াতে পারব না। এটা লেপার্ড নয়, এটা হচ্ছে লেপার্ডের দেহধারী প্রেতাত্মা! ওটার চামড়া ছাড়িয়ে নিলেই প্রেত ঐ দেহ থেকে বেরিয়ে আমাকে আক্রমণ করবে। মাসাংগা! এই দেশটা ভাল নয়, আমাদের এখনই এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।'

আন্তিলিও অবশ্য জামানির উপদেশে কর্ণপাত করেননি। মাম্বোয়াদের সন্দেহ চলে গেছে, অভিযাত্রীরা এখন তাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন।— এই হচ্ছে অনুসন্ধান-কার্য চালানোর উপযুক্ত সময়, এখন কি ফিরে যাওয়া যায়? মাম্বোয়াদের এখন ধারণা হয়েছে, অভিযাত্রীরা কেবল গুহার ভিতর জন্তু-জানোয়ার দেখার জন্যই এখানে এসেছেন। এটা অবশ্য তাদের কাছে পাগলামি, তবে এই ধরনের পাগলামিকে প্রশ্রয় দিতে তাদের আপত্তি নেই। সাদা মানুষরা যদি গুহার মধ্যে ঢুকে জন্তু-জানোয়ারের আঁচড়-কামড় খেতে চায় এবং সেই কাজে সাহায্য করলে যদি টাকা পয়সা, সিগারেট আর নানারকম উপহার পাওয়া যায়, তাহলে তাদের সাহায্য করতে আপত্তি কি? তবে হ্যাঁ, কায়নার কথা না বললেই হয়।

অবশ্য অভিযাত্রীরা কায়নার নাম আর ভুলেও উচ্চারণ করতেন না।

একদিন হঠাৎ দুটি মাম্বোয়ার কথা আন্তিলিওর কানে এল। আন্তিলিও ছিলেন তাঁবুর ভিতরে, মাম্বোয়ারা তাঁকে দেখতে পায়নি। তিনি শুনলেন একজন মাম্বোয়া বলছে, 'খুব সম্ভব যে পাঁচটা ছেলে আগে সাদা মানুষের কাছে কাজ করত, তারা ভুল করেছে। বোধহয় ওরা সাদা মানুষের কথা বুঝতে পারেনি।'

তার সঙ্গী বলল, 'হতে পারে। কিংবা হয়তো ওটা ছিল সাদা মানুষের ক্ষণিকের খেয়াল মাত্র। তবে সেই খেয়াল কেটে গেছে, আমরা এখন যেদিকে যেতে বলি ওরা সেইদিকেই যায়। ওরা যেদিকে গেলে আমাদের মাতব্বররা বিপদ হবে বলে মনে করে, সেদিকে ওরা কখনই পা বাড়ায় না।'

আন্তিলিওর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মাম্বোয়াদের বিশ্বাস অভিযাত্রীরা মৃত্যুগহ্বর নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। মানচিত্রটা নিয়ে আন্তিলিও দাগ দিতে লাগলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল খুবই সহজ।

মাম্বোয়ারা নিশ্চয়ই কায়নার ধারে কাছে অভিযাত্রীদের উপস্থিতি চাইবে না, অতএব মৃত্যুগহ্বর যেখানে অবস্থান করছে তার থেকে দূরে দূরেই মাম্বোয়ারা তাঁদের পরিচালিত করার চেষ্টা করবে। যে জায়গাগুলো একবার দেখা হয়ে যায়, ম্যাপের গায়ে সেই জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে রাখতেন অভিযাত্রীরা। ম্যাপটাতে দাগ দিতে দিতে এক সময় তাঁরা নিশ্চয় দেখতে পাবেন, কোন্ এলাকাটা বাদ দেওয়া হচ্ছে। একবার যদি তাঁদের চোখে ধরা পড়ে, একটা

নির্দিষ্ট এলাকা মাম্বোয়ারা এড়িয়ে যাচ্ছে, তাহলে সেই অঞ্চলটায় অভিযান চালালেই মৃত্যুগহ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে।

কিন্তু, হ্যাঁ, এখানে একটা 'কিন্তু' আছে।

যে সব এলাকায় যাওয়া হয়েছে, ম্যাপের গায়ে সেই এলাকাগুলোকে ফুটকির দাগ বসিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে; এখন পেন্সিলের লাইন টেনে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন জায়গা ম্যাপের উপর চক্রাকারে ছড়িয়ে আছে, অর্থাৎ সেই সব স্থানে এখন পর্যন্ত অভিযাত্রীদের পায়ের ধুলো পড়েনি। কিন্তু সেই ছোট ছোট টুকরো টুকরো অনাবিষ্কৃত এলাকার পরিধি বড় কম নয়। এই ভাবে আর কতদিন অভিযান চালানো সম্ভব? ইতিমধ্যেই অভিযাত্রীরা বেশ কয়েকবার বিপদে পড়েছেন। অজানা গুহার অন্ধকারে অনিশ্চিত প্রত্যাশায় দিনের পর দিন জীবন বিপন্ন করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? তিন মাস তো হয়ে গেল, আর কত দিন?

অতএব পরামর্শ সভা বসল।

প্রফেসর এবং বিল অভিযান চালানোর বিপক্ষে রায় দিলেন। প্রফেসরের বক্তব্য হচ্ছে: তিন মাস অনুসন্ধান চালিয়ে এক্শ' উনত্রিশটা গুহার ভিতর তাঁরা পদার্পণ করেছেন, কিন্তু মৃত্যুগহ্বর এখন পর্যন্ত তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। কায়নার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রফেসর মোটেই নিঃসন্দেহ নন। তিনি আরও জানালেন এই অঞ্চলের বিভিন্ন গুহার মধ্যে প্রাচীন গুহা-মানবের বসবাসের নিদর্শন এবং বিবিধ প্রকার খনিজবস্তুর অস্তিত্ব তাঁদের দৃষ্টিপথে ধরা দিয়েছে। অথচ এই সব দিকে চোখ না দিয়ে অর্থ আর সময়ের অপব্যয় করা হচ্ছে এক অলীক বস্তুর পিছনে! অতএব এই অভিযান এখনই বন্ধ করা উচিত।

বিলও প্রফেসরকে সমর্থন জানাল, দুজনেরই মত হচ্ছে: 'চুলোয় যাক কায়না। মরীচিকার পিছনে ছুটে এমন অনেক বস্তুর সান্নিধ্য আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি, যেগুলো প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাণীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট আবিষ্কার বলে গণ্য হতে পারে।'

অকাট্য যুক্তি। তবু আত্তিলিও বন্ধুদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। আত্তিলিও শেষ চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু আমি স্বকর্ণে শুনেছি একজন মাম্বোয়ার কথা। লোকটা তার সঙ্গীকে বলছিল আমরা নাকি কখনই সেদিকে যাইনি যেদিকে আমাদের গতিবিধি মাম্বোয়া-প্রধানরা পছন্দ করে না।'

বিল বলল, 'খুব সম্ভব আমাদের অজ্ঞাতে কায়নার সামনে দিয়ে আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আসল জায়গাটা ছাড়িয়ে মাম্বোয়াদের সঙ্গে আমরা অন্যদিকের গুহায় গুহায় ঘুরেছি। এই দশ বছর ধরে ঘোরাঘুরি করলেও আমরা মৃত্যুগহ্বরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারব না।'

'ঠিক আছে'— আত্তিলিও বললেন, 'যে সব গুহাতে খনিজদ্রব্য বা ঐতিহাসিক বস্তুর নিদর্শন আছে বলে মনে হয়, তোমরা সেই সব গুহাতে সন্ধান চালিয়ে আবিষ্কারের সম্মান লাভ কর— তোমাদের আমি কায়নার পিছনে সময় নষ্ট করতে বলব না। সঙ্গে যত খুশি

লোক নাও, তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু এতদিন ধরে এত কষ্ট সহ্য করার পর এত তাড়াতাড়ি আমি হাল ছাড়তে রাজি নই। অন্ততঃ আরও একমাস আমি দেখব। নির্দিষ্ট একমাসের মধ্যে যদি কোনও ফল না পাই, তাহলে কথা দিচ্ছি আমিও 'কায়না অভিযানে' ইস্তফা দেব।'

আত্তিলিওর প্রস্তাবে কারও আপত্তি হল না। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরের দিন ১৫ই সেপ্টেম্বর স্বয়ং মাম্বোয়া-সর্দার আত্তিলিও সাহেবের সঙ্গী হল। ইতিপূর্বে সর্দার তাঁদের উপদেশ, নির্দেশ দিয়েছে, কোথায় কোন্ পথে গেলে নূতন নূতন গুহার সন্ধান পাওয়া যাবে জানিয়েছে, কিন্তু সে ব্যক্তিগতভাবে কখনও অভিযাত্রীদের সঙ্গী হয়নি। খুব সম্ভব সে বুঝেছিল, আভিযাত্রীরা শীঘ্রই তাদের দেশ ছেড়ে বিদায় নেবেন।

সর্দারের সঙ্গে কয়েকজন মাম্বোয়া অনুচর ছিল। তারা সকলেই বিভিন্ন গুহার সন্ধান দিয়ে আত্তিলিওকে সাহায্য করতে চাইল। উৎসাহের আধিক্যে আত্তিলিও সেদিন তেরটা নূতন গুহা পরিদর্শন করে ফেললেন। একদিনে এতগুলো গুহা অভিযাত্রীদের মধ্যে কেউ ইতিপূর্বে পরিদর্শন করতে পারেননি। চোদ্দ নম্বর গুহাটার মুখে যখন আত্তিলিও পদার্পণ করলেন তখন সন্ধ্যা প্রায় আগত, অস্পষ্ট অন্ধকারের প্রলেপ পড়েছে পৃথিবীর বুকে।

আত্তিলিও চোদ্দ নম্বর গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গীরা গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

গুহার মধ্যে তখন অস্পষ্ট অন্ধকার।

আত্তিলিও চমকে দেখলেন, আবছা আলো-আঁধারের ভিতর থেকে তাঁর দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক বিরাট সর্পদানব— পাইথন!

এত মোটা আর এত লম্বা সাপ কখনও দেখেননি আত্তিলিও। চকিতে রাইফেল তুলে তিনি গুলি চালালেন। পাইথনের মাথা উড়ে গেল ছিন্নভিন্ন হয়ে, কিন্তু তার মুণ্ডহীন বিরাট শরীরটা মৃত্যুযাতনায় আত্তিলিওর চারপাশে আছড়ে পড়তে লাগল একটা অতিকায় চাবুকের মতো!

আত্তিলিও অনায়াসে ছুটে পালাতে পারতেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হল। সেইখানে দাঁড়িয়েই তিনি বারবার গুলি চালিয়ে সরীসৃপের অন্তিম আস্ফালনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। অজগর-জাতীয় বৃহৎ সরীসৃপের দেহ মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুক্ষণ অন্ধ আক্ষেপে কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী পাকিয়ে ছটফট করতে থাকে। এই সাপটাও ছিল বিরাট— তার চামড়া ছাড়িয়ে পরে যখন মাপ নেওয়া হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল পাইথনটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে আটত্রিশ ফুট, এবং দেহের সব চেয়ে স্থূল জায়গাটার মাপ হচ্ছে তিন ফুট নয় ইঞ্চি!

এত মোটা, এত লম্বা একটা সর্পিল দেহ যদি চাবুকের মতো সজোরে কোনও মানুষের গায়ে আছড়ে পড়ে, তাহলে মনুষটার যে অবস্থা হয়, আত্তিলিও সাহেবেরও সেই অবস্থা হল, জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে ক্ষণিকের জন্য তিনি অনুভব করলেন একটা মস্ত পাহাড় যেন তাঁর দেহের উপর ভেঙ্গে পড়ছে! পরক্ষণেই তাঁর চৈতন্যকে লুপ্ত করে নামল মূর্ছার অন্ধকার.....

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পথের নিশানা

জ্ঞান ফিরে এলে আন্তিলিও দেখলেন, তিনি তাঁবুর মধ্যে তাঁর নিজস্ব বিছানাতে শুয়ে আছেন এবং তাঁর কপালে কাপড় ভিজিয়ে ঠাণ্ডা জলের প্রলেপ দিচ্ছে জামানি।

ক্লান্তি-জড়িত স্বরে প্রফেসর আর বিলকে ডেকে দিতে বললেন আন্তিলিও। তাঁকে চোখ মেলে চাইতে দেখে মহা খুশী জামানী। একগাল হেসে সে জানাল, তাঁরা দুজনেই বাইরে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু মাসাংগার কথা বলা উচিত নয়।

আন্তিলিওর সমস্ত সত্তা আবার ডুবে গেল গভীর নিদ্রার অন্ধকারে....

দ্বিতীয়বার চোখ মেলে আন্তিলিও দেখলেন, তাঁর মাথার কাছে একটা আলো জ্বলছে, বন্ধুরাও কাছেই আছে। প্রফেসর আন্তিলিওকে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, 'আন্তিলিও যদি কথা বলার চেষ্টা না করে তবে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে তাঁর আপত্তি নেই। অজ্ঞান হওয়ার কারণটা প্রফেসরের মুখ থেকেই শুনলেন আন্তিলিও— সর্পদানবের দেহের প্রবল ধাক্কায় ছিটকে পড়ে একটা পাথরে মাথা ঠুকে যাওয়ার ফলেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

জামানি, মাম্বোয়া-সর্দার এবং দলবল গুহার ভিতর রাইফেলের ঘন ঘন গর্জন শুনেই বুঝেছিল, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রথমে কেউ সাহস করে ভিতরে প্রবেশ করেনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও তিনি যখন বেরিয়ে এলেন না, তখন জামানির অনুরোধে মাম্বোয়া-সর্দার গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে রাজি হয়। গুহার ভিতর অচৈতন্য অবস্থায় আন্তিলিওকে পড়ে থাকতে দেখে তারা তাঁকে তুলে আনে এবং সবাই মিলে ধরাধরি করে তাঁর দেহটাকে বহন করে নিয়ে আসে তাঁবুতে। আন্তিলিও এই পর্যন্ত ধৈর্য ধরে শুনেছিলেন, কিন্তু যখন প্রফেসর জানালেন, আটদিন ধরে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, তখন চমকে উঠলেন আন্তিলিও— 'আটদিন! বলে কি!'

"চুপ কর!"— প্রফেসর ধমকে উঠলেন, 'বিশ্রাম নাও। কথা বলবে না। সব ঠিক আছে। আমি আর বিল তোমার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।'

আন্তিলিও হাতের উপর ছুঁচ ফোটার যন্ত্রটা অনুভব করলেন— ইনজেকশন। আলোটা নিভে গেল। দুজোড়া পা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল তাঁবুর বাইরে। দুচোখের পাতায় নিদ্রার স্পর্শ সমগ্র অনুভূতি ও চৈতন্যকে অবলুপ্ত করে নামছে নিবিড় অন্ধকার.....আন্তিলিও ঘুমিয়ে পড়লেন.....

একমাস পরে নভেম্বরের ২১ তারিখে প্রফেসর রায় দিলেন আন্তিলিও এইবার স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম করতে পারেন। বিগত একমাস গত্তি সাহেবকে কোন কাজ করতে দেওয়া হয়নি, দুই বন্ধু তাঁকে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছিলেন। প্রফেসরের ঘোষণা শুনে মহা উৎসাহে আন্তিলিও অনেকদিন পরে ম্যাপ খুলে বসলেন। ম্যাপটার গায়ে এক জায়গায় খুব বড় করে একটা ফুটকির চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত স্থান হচ্ছে সেই গুহা, যেখানে একমাস আগে আন্তিলিও অতিকায় পাইথনের দেখা পেয়েছিলেন। চিহ্নটার পাশে কে যেন পেন্সিল দিয়ে লিখে রেখেছে: 'শুক্রবার ১৩ই অক্টোবর। শুভদিন। হুররে!'

'শুভদিন, না ঘোড়ার ডিম!'— আন্তিলিও বলে উঠলেন, 'আবার হুররে লিখে আনন্দ জানানো হয়েছে! কেন? এত আনন্দ কিসের?'

'দেখো, দেখো, ভাল করে দেখো।' বিল গর্জন করে উঠল।

আন্তিলিও ভাল করে দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের চমক— 'কি!'

এইবার আন্তিলিও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। সুদীর্ঘ বিশ্রামে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় যে সময়টা তিনি অতিবাহিত করেছেন সেই সময়ে বিল আর প্রফেসর পরিদর্শন করেছেন গুহার পর গুহা। যে সব এলাকা দেখা হয়ে গেছে, সেখানে ফুটকির চিহ্ন। চিহ্নগুলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কেবল পূর্ব ও দক্ষিণেই ফুটকির ছড়াছড়ি। ফুটকিগুলো সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা জায়গাকে বৃত্তের আকারে ঘিরে ধরেছে। একটু অসমান আর খাপছাড়া হলেও ফুটকিগুলো মোটামুটি একটা সরল রেখার রূপ ধরেই এগিয়েছে এবং বৃত্তের আকারে যে স্থানটিকে ঘিরে ফেলেছে, সেটা সুগোল না হলেও বৃত্ত বটে। ঐ বৃত্তাকার স্থানটির চারপাশেই ফুটকি-চিহ্ন দেখে বোঝা যায় ঐ জায়গাটা এখন পর্যন্ত দেখা হয়নি। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ফুটকিগুলো সোজা এগিয়ে এসে যেখান থেকে ঘুরে অনাবিষ্কৃত অঞ্চলটাকে নির্দিষ্ট করছে, সেই চিহ্নর বেষ্টনী শুরু হয়েছে ঠিক পাইথনের গুহার পর থেকে। অর্থাৎ পাইথনের গুহা অবধি সোজাসুজি এগিয়েছে অভিযাত্রীরা, কিন্তু উক্ত গুহার পরবর্তী স্থানে পদার্পণ করেই তাঁরা বামে ও দক্ষিণে ঘুরে গেছেন। কিন্তু কেন? হ্যাঁ, ঘুরে যাওয়ার কারণটা বেশ স্পষ্ট। চিহ্নিত স্থানের লিখিত তারিখ দেখলেই বোঝা যায় পাইথনের গুহার পর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা বিল আর প্রফেসরকে বাঁয়ে আর ডাইনে নিয়ে গেছে, সরলরেখা ধরে তাঁদের এগিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। ক্রমাগত বাঁয়ে আর ডাইনে ঘুরেছেন তাঁরা, ফলে আবিষ্কৃত স্থানগুলোতে ফুটকির চিহ্ন পড়ে পরিত্যক্ত জায়গাটাকে বৃত্তের আকারে পরিস্ফুট করেছে ম্যাপের উপর।

স্পষ্টই বোঝা যায়, ঐ জায়গাটার উপর প্রফেসর আর বিলের উপস্থিতি পছন্দ করে না মাম্বোয়ারা, তাই তারা প্রফেসর ও বিলকে অন্যদিকে নিয়ে গেছে। আরও শোনা গেল আন্তিলিও যখন বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়ে বিছানায় শুয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন, সেই সময় বিল আর প্রফেসরকে 'সাহায্য' করার জন্য রোজই এসেছে মাম্বোয়া-সর্দার স্বয়ং— দক্ষিণ-পূর্ব দিকের ঐ জায়গাটা থেকে অভিযাত্রীদের দূরে রাখার জন্য তার প্রচেষ্টা দুই বন্ধুই লক্ষ্য করেছেন। প্রফেসর ও বিলের মনোভাব বুঝতে পারেনি মাম্বোয়া-সর্দার; কারণ, সব বুঝেও কিছু না-বোঝার অভিনয় করেছেন দুই বন্ধু আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে— তার ফলেই মানচিত্রের গায়ে ফুটকি-চিহ্ন বেষ্টিত গোল জায়গাটা ধরা পড়েছে।

ম্যাপের উপর ঐ গোল চিহ্নবিহীন জায়গাটা দেখতে দেখতে আন্তিলিওর গলা থেকে একটা অস্ফুট অর্থহীন শব্দ বেরিয়ে এল। প্রফেসর হাসলেন, 'হ্যাঁ, ঐখানেই আছে— কোনও সন্দেহ নেই এবিষয়ে।'

দারুণ উৎসাহে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন আন্তিলিও। কায়না সম্বন্ধে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন,

এখন আবার আশায় উদ্দীপনায় তাঁর রক্তে উৎসাহের জোয়ার লাগল। প্রফেসরের ওষুধের চাইতে ম্যাপের চিহ্নগুলো তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশী উপযোগী হয়েছে সন্দেহ নেই।

পরের দিন সকালে সবাই যখন বেরিয়ে গেল, আত্তিলিও তখন জামানিকে ডেকে তার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করলেন। আত্তিলিও বুঝেছিলেন জামানির সাহায্য ছাড়া তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে তিনি জামানির সামনে প্রলোভনের জাল ফেলতে শুরু করলেন, সেই সঙ্গে জুলু জাতির স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ ও অহঙ্কারে সুকৌশলে আঘাত দিয়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা চলল.... আত্তিলিও কি বোঝেন না, জামানি তার দেশ জুলুল্যাণ্ডে ফিরে যেতে চায়? এই হতভাগা মাম্বোয়াদের দেশ তার ভাল লাগে না সেকথাও তিনি জানেন। তিনি নিজেই কি এই দেশ পছন্দ করছেন? মোটেই না, মোটেই না। তবে কাজ শেষ না করে তো এই পাথুরে-নরক ছাড়ার উপায় নেই। জামানি যদি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে চায়, তবে তারও উচিত হবে তাঁকে সাহায্য করা; কারণ কার্যসিদ্ধি হলেই তো তিনি চটপট এখান থেকে সরে পড়তে পারবেন। আর আত্তিলিওর যে 'অপেরা হ্যাট' টুপিটার মধ্যে দারুণ সব যাদুবিদ্যা লুকানো আছে বলে জামানি বিশ্বাস করে, সেই টুপিটা তো জামানিকেই উপহার দিতে চাইছেন তিনি। তবে এমন একটা মূল্যবান উপহারের বিনিময়ে তারও কি মাসাংগাকে সাহায্য করা উচিত নয়?.... কায়না-আবিষ্কারের পর আত্তিলিও নিশ্চয়ই তাকে জুলুল্যাণ্ডে নিয়ে যাবেন, সমস্ত জুলুল্যাণ্ডের মানুষ অবাক হয়ে দেখবে— হ্যাঁ, একটা পুরুষের মতো পুরুষ বটে জামানি।

জামানি প্রথমে আত্তিলিও কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারেনি, পরে যখন বুঝল, তখন তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবে জুলু জাতির আদর্শ 'পুরুষের মতো পুরুষ' হলে তো মাম্বোয়াদের কায়নাকে ভয় করা চলে না, তাই বুক ঠুকে শপথ করে জামানি বলল, কায়না অভিযানে সে মাসাংগাকে সাহায্য করবে। মাম্বোয়াদের কথাবার্তা সে শুনতে চেষ্টা করবে এবং কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য শ্রুতিগোচর হলে সেই সংবাদ সে আত্তিলিওকে জানাবে।

আত্তিলিও অবশ্য ভালভাবেই জানতেন, কোনও গোপন রহস্যের সন্ধান পেলেও জামানি চট করে তাঁকে সংবাদ দেবে না। কিন্তু তাঁর জুলু অনুচরটি তাঁদের সবাইকে ভালবাসত, কাজেই নানারকম ছলছুতোয় সে যে তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে, সেই ভরসা তিনি রাখতেন। বিশেষ করে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, জুলুল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেলে সে হয়তো কিছুটা দুঃসাহস প্রকাশ করতে পারে। আর একটা ছোটখাট বিষয়কেও বোধহয় জামানি উপেক্ষা করবে না— 'অপেরা হ্যাট' টুপিটার প্রলোভন খুব তুচ্ছ নয় তার কাছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ভয়াবহ পর্বত

১৯২৮ সালের ২৯শে নভেম্বর সকালবেলা আত্তিলিও ঘোষণা করলেন নিহত পাইথনের গুহাটাকে তিনি আর একবার ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

পূর্বোক্ত গুহার সামনে এসে বিল ও প্রফেসর দুটো ভিন্ন পথ অনুসরণ করলেন। অজানা পথে হয়তো তাঁরা বিপদে পড়তে পারেন, তাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তার দলের সবচেয়ে বলিষ্ঠ লোকগুলোকে নিয়ে মাম্বোয়া-সর্দার তাঁদের সাহায্য করতে অগ্রসর হল।

আত্তিলিও বর্তমানে পাইথনের গুহার খুব কাছাকাছি থাকবেন, অতএব তাঁকে সাহায্য করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করেনি মাম্বোয়া-সর্দার। তবু সাবধানের মার নেই, তাই সর্দারের আদেশে ছয়জন মাম্বোয়া আত্তিলিওর সঙ্গে থেকে গেল। ঐ লোকগুলো ছিল দুর্বল ও ব্যক্তিত্বহীন। নিতান্ত নিয়মরক্ষার জন্যই তারা আত্তিলিওর সঙ্গে ছিল। এক নজরে লোকগুলোর চেহারা জরীপ করে আত্তিলিও বুঝে নিলেন নিষিদ্ধ এলাকায় জোর করে প্রবেশ করতে চাইলে এরা তাঁকে বাধা দিতে পারবে না।

হঠাৎ জামানি বলে উঠল, 'ঐ যে মাসাংগা! তুমি একটা বুনো শুয়োর চাইছিলে না? ঐ দেখো, একটা শুয়োরের পায়ের ছাপ।'

কোনদিনই শুয়োর মারতে চাননি আত্তিলিও সাহেব, বিশেষ করে সেই মুহূর্তে আফ্রিকার বৃহত্তম বন্য শূকরও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত না। কিন্তু তিনি জামানির অব্যক্ত ইশারা বুঝতে পারলেন। জমির উপর সত্যি সত্যিই 'ওয়ার্ট হগ' নামক বন্য শূকরের টাটকা পায়ের ছাপ ছিল। পদচিহ্নগুলো এগিয়ে গেছে নিষিদ্ধ এলাকাটার দিকে। মাম্বোয়ারা পায়ের ছাপগুলো দেখেছিল, তারা সন্ত্রস্তভাবে পরস্পরের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। আত্তিলিও সেদিকে দেখেও দেখলেন না। এমন উৎসাহের সঙ্গে তিনি মাম্বোয়াদের ঠেলতে ঠেলতে শূকরের পায়ের ছাপগুলোর দিকে এগিয়ে চললেন যে, তারা কোনও ছুতো ধরে আপত্তি করারও সময় পেল না। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরে তাঁদের চোখে পড়ল একটা পাহাড়। ভীষণ-দর্শন, প্রস্তরবহুল ঐ পাহাড়টা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র মম্বোয়ারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি হল? শিকার কোথায়?'— আত্তিলিও প্রশ্ন করলেন।

'ঐ যে।'— অনেক দূরে একটা কম্পিত ঘাসঝোপের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করল একজন মাম্বোয়া।

'এগিয়ে চল।'— জামানি হুকুম দিল।

কিন্তু কেউ আর এক পা নড়ল না।

'চলে এস আমার সঙ্গে',—ধমকে উঠলেন আত্তিলিও, 'তোমরা কি পুরুষ মানুষ, না আর কিছু?'

পুরুষ-মানুষরা এবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সামনে এগিয়ে গেল। আবার থামল। যে লোকটি আত্তিলিওর দুই নম্বর বাড়তি বন্দুকটা বহন করছিল, সে অস্পষ্ট জড়িতস্বরে কি যেন বলল। বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হাতের বন্দুক মাটিতে নামিয়ে

রাখল। তৎক্ষণাৎ তার পাশে যে লোকটি দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে দড়িটাকে মাটিতে ফেলে দিল। তৃতীয় ব্যক্তি খাদ্য ও বিভিন্ন সরঞ্জাম-পূর্ণ থলিটাকে ফেলে ভারমুক্ত হল। পরক্ষণেই তারা একসঙ্গে ছুটতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আন্তিলিওর দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে অদৃশ্য হল ছয়টি ধাবমান মনুষ্য-মূর্তি!

আন্তিলিও এইবার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলেন। পাশে ভয়ার্ত জামানি। অদূরে পাহাড়— পাথরে পাথরে রুক্ষ, শ্রীহীন, অনুর্বর। চারিদিক চুপচাপ শান্ত। কোথাও জীবনের সাড়া নেই, একটি পাখি পর্যন্ত ডাকছে না। এই নীরবতা অস্বস্তিকর। মানুষের মন এমন জায়গায় আনন্দ পায় না! আফ্রিকার পরিবেশ এখানে প্রস্তরসজ্জায় রুক্ষ, স্তব্ধতায় ভয়ঙ্কর।

জামানি মাম্বোয়াদের ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো মাটি থেকে তুলে নিল। দারুণ আতঙ্কে তার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল।

'চলে এস পাহাড়ের উপর,'— ধমকে উঠলেন আন্তিলিও, 'তুমি না জুলু-যোদ্ধা?'

মনে হল জামানি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু আন্তিলিও তার গর্বে ঘা দিয়েছেন— একটিও কথা না বলে সে সোজা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

পাহাড়ের তলায় অনেকগুলো বড় বড় পাথর ছিল। পাথরগুলোর ভিতর থেকে একটা সঙ্কীর্ণ গিরিপথের সন্ধান পাওয়া গেল। ঐ পথ বেয়ে উপরে উঠে আন্তিলিও দেখলেন, তাঁরা দুজন যেখানে এসে পৌঁছেছেন, সেটা হচ্ছে পাহাড়ের চূড়ার উপর অবস্থিত একটা প্রশান্ত প্রশস্ত সমতল জায়গা।

সমতল জায়গাটার একপাশে দুটো মস্ত পাথর আন্তিলিওর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

পাথর দুটোর মাঝখানে দেখা গেল একটা গর্ত। গর্তটা প্রায় গোলাকার, চওড়ায় সেটা বারো ফুটেরও বেশী।

কায়না?.....

কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু আন্তিলিওর দৃঢ় ধারণা হল, গর্তটাই কায়না। নিজের চোখকে তিনি প্রায় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না— মাসের পর মাস যার জন্য কষ্ট সহ্য করেছেন অভিযাত্রীরা, নিদারুণ বিপদের মুখে প্রাণ বিপন্ন করেছেন বারংবার— সেই মৃত্যুগহ্বর আজ অন্তিলিওর পায়ের তলায়।

এক বার উঁকি দিয়ে গর্তের ভিতর দৃষ্টিকে চালনা করলেন আন্তিলিও। কিছু দেখা গেল না। দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ তাঁর নাকে ধাক্কা মারল। আন্তিলিও সেই গন্ধটা সহ্য করতে পারলেন না, পিছিয়ে এলেন।

গহ্বরের নিবিড় অন্ধকারের ভিতর কিছুই চোখ পড়ছে না। কিন্তু গর্তটা কি খুব গভীর? পাথরটা এক দেয়াল থেকে আর এক দেয়ালে বাড়ি খেতে খেতে অনেকগুলো শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করল, কিন্তু একেবারে তলা থেকে পাথরটার পতনজনিত শব্দ শুনতে পেলেন না

তিনি। এবার একটা বড় পাথর তিনি ছুঁড়ে দিলেন। একটা অস্পষ্ট শব্দ গর্তের তলা থেকে ভেসে এল। আন্তিলিও বুঝলেন পাথরটা নীচে পৌঁছল।

'জামানি,'— আন্তিলিও বললেন, 'এইবার তুমি নিশ্চয়ই টুপিটা পাবে।'

নিতান্ত কর্তব্য বোধেই জামানি ধন্যবাদ দিল। তার চোখেমুখে উৎসাহ বা আনন্দের কোনও চিহ্ন আন্তিলিও দেখতে পেলেন না।

জামানির দোষ নেই। স্বয়ং আন্তিলিও সাহেবই কি খুব উৎসাহ বোধ করছিলেন? ঐ অন্ধকার গহ্বরের ভিতর কোন অজ্ঞাত বিভীষিকা লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে! এটাই যে কায়না এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে একটা রহস্যময় গহ্বরের অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

সাফল্যের মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন আন্তিলিও। বর্তমানে তাঁর অবস্থাটা হল, যাকে বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'! এই মুহূর্তে তাঁর কর্তব্য কি হতে পারে সেটাই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। একবার ভাবলেন শূন্যে রাইফেলের আওয়াজ করে প্রফেসর আর বিলকে ডাকলে হয়? তারপর মনে হল, ওরা এখন কোথায় আছে কে জানে! যদি অনেক দূরে থাকে, তাহলে তো গুলির শব্দ শুনতে পেলেও আন্তিলিও যে তাদের ডাকছেন এই কথাটা বুঝতে পারবে কি? গুলি তো কত কারণেই চালানো হয়। তারপর মাম্বোয়া-সর্দার? সেও তো এক সমস্যা। বিল আর প্রফেসরের সঙ্গে মাম্বোয়া-সর্দারও তো তার দলবল নিয়ে আসবে। তারা যে সুবোধ বালকের মতো দাঁড়িয়ে বিদেশীদের মৃত্যুগহ্বরের ভিতর ঢুকতে দেবে, এমন তো মনে হয় না!

অবশ্য এত সব ভাবনা-চিন্তা না করে আন্তিলিও তাঁবুতে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন, এবং পরের দিন তাদের নিয়ে এখানে চলে আসতে পারতেন অনায়াসে। এই সহজ উপায়টা যে তার মাথায় আসেনি, তা নয়। কিন্তু উপায়টা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেটাকে নাকচ করেছেন। কি বলবেন তিনি বন্ধুদের কাছে? মৃত্যুগহ্বর আবিষ্কার করেও তার ভিতর তিনি একা প্রবেশ করতে সাহস পাননি? বন্ধুদের সাহায্য গ্রহণ করার জন্য ফিরে এসেছেন? এমন কথা বলতে পারবে না মহাযুদ্ধের প্রাক্তন সৈনিক কম্যাণ্ডার আন্তিলিও গত্তি।

অতএব আন্তিলিও ঠিক করলেন, ঐ গহ্বরের ভিতর ঢুকে আজই তিনি ভিতরটা দেখবেন। দড়িটাকে তিনি হস্তগত করলেন, তারপর গর্তের মুখে অবস্থিত প্রকাণ্ড পাথর দুটোর মধ্যে একটার সঙ্গে দড়িটা বাঁধলেন। দড়ির একপ্রান্ত পাথরের সঙ্গে বাঁধা হল, অপর প্রান্তটা তিনি বাঁধলেন নিজের কোমরের সঙ্গে। যে থলিটার মধ্যে খাবার-দাবার এবং নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ছিল, সেটার ভেতর থেকে সবকিছু তিনি বের করে ফেললেন। তারপর সেই থলিটা বুকে ঝুলিয়ে তিনি প্রস্তুত হলেন মৃত্যুগহ্বরের ভিতর অবতরণ করার জন্য। থলিটা অবশ্য একেবারে শূন্যগর্ভ ছিল না, দুটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুকে থলির মধ্যে ভরেছিলেন আন্তিলিও— টর্চ এবং পিস্তল।

জামানিকে ডেকে আস্তিলিও বললেন, সে যেন কোনও কারণেই স্থানত্যাগ না করে। তারপর তিনি তাকে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে দড়ি ধরে তাঁকে ধীরে ধীরে গর্তের ভিতর নামাতে হবে। জামানির ওষ্ঠাধর নড়ে উঠল। কিন্তু শব্দ শোনা গেল না। সম্মতি-সূচক 'ইয়েস, মাসাংগা,' কথাটা তার ঠোঁটের ভিতরেই জমে গেল, উচ্চারিত হল না। দারুণ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল জামানি, তবু সে নির্দেশ-অনুযায়ী দড়িটা ধরল। সাবধানে আস্তে আস্তে, তাকে দড়ি ছাড়তে বললেন আস্তিলিও। লাটাই থেকে যেভাবে সুতো ছেড়ে ঘুড়ি ওড়ানো হয়, ঠিক সেইভাবেই জামানিকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে ঘুড়ি ওঠে উপর দিকে, এখানে আস্তিলিও নামছেন নীচের দিকে এবং সুতোর স্থান নিয়েছে জামানির হাতের দড়ি আর লাটায়ের স্থান গ্রহণ করেছে একটা মস্ত পাথর।

খুব সন্তর্পণে আস্তিলিও নামতে শুরু করলেন। গর্তের মুখে পা রাখতে না রাখতেই কয়েকটা পাথর তাঁর পায়ের ধাক্কায় গর্তের মধ্যে ছিটকে পড়ল সশব্দে। সেই শব্দে সাড়া দিয়েই যেন অন্ধকার গহ্বরের ভিতর থেকে কি একটা বস্তু ছুটে এল। আর পরক্ষণেই—

পরক্ষণেই আস্তিলিওর মুখের উপর পড়ল এক প্রচণ্ড থাপ্পড়! সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা ফাটিয়ে এক তীব্র চিৎকার!

অষ্টম পরিচ্ছেদ : মৃত্যু-বিভীষিকা

মুখের উপর সজোরে চপেটাঘাত পড়তেই আস্তিলিও চোখ বন্ধ করে ফেললেন এবং তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলেন দড়িবাঁধা পাথরটাকে।

একটি মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে রইলেন তিনি, তারপর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করে তিনি দেখলেন, আক্রমণকারী জীবটি হচ্ছে মস্ত বড় একটা নিশাচর পাখি! অন্ধকারে গহ্বরের ভিতর থেকে উড়ে আসার সময়ে তাঁর মুখের উপর পাখিটার ডানার ঝাপটা লেগেছিল। অন্ধকারে অভ্যস্ত নিশাচর দিনের আলোর মধ্যে এসে প্রায় অন্ধ হয়ে পড়েছিল, গহ্বরের কাছেই একটা শুকনো গাছের ডালপালার মধ্যে চুপ করে বসে ছিল পাখিটা।

এই ঘটনাটা অবশ্য আস্তিলিওর পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল। পাখিটা তাঁকে ভবিষ্যতের ভয়াবহ সম্ভাবনা সম্পর্কে সাবধান করে দিল— জামানির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে তাঁর অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হতে পারে, এই ঘটনায় তার প্রমাণ পেলেন আস্তিলিও।

জামানির দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, সে দড়ি ছেড়ে মাটির উপর শুয়ে পড়েছে! হাত বাড়িয়ে পাথরটা না ধরলে তাঁর দেহটা ছিটকে পড়ত গহ্বরের ভিতর এবং তলদেশে পতিত হয়ে অথবা পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে তাঁর অবস্থা যে হত নিতান্ত শোচনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আস্তিলিও ঠিক করলেন, গর্তের ভিতর নামার সময়ে তিনি আর জামানির উপর নির্ভর

করে নিজের জীবনকে বিপন্ন করবেন না। জামানিকে ভূমিশয্যা ত্যাগ করতে বললেন তিনি। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে মাথা তুলল জামানি, তারপর বিস্ফারিত দুই চক্ষুর ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে চারদিক নিরীক্ষণ করতে লাগল।

'ভূ-ভূভূত!' সহসা আর্তনাদ করে উঠল জামানি, তার ভীত দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে পূর্বোক্ত নিশাচর পক্ষির উপর!

'ভূতের নিকুচি করেছে!'—বলে আস্তিলিও একটা পাথর ছুঁড়ে মারলেন। মস্ত বড় পাখিটা ডানা ঝটপট করে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—'কি ? দেখেছ ?'

আস্তিলিও জামানির মুখের দিকে তাকালেন। জামানি মাথা নেড়ে জানাল, দেখেছে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি দেখেই আস্তিলিও বুঝলেন, উড়ন্ত জীবটির 'পক্ষিত্ব' সম্বন্ধে জামানির সন্দেহ দূর হয়নি। খুব সম্ভব সে ভাবছিল, ওটা পাখি না হয়ে একটা ছদ্মবেশী প্রেতাত্মাও হতে পারে!

আস্তিলিও আর জামানির সঙ্গে কথা বললেন না, নেমে পড়লেন গহ্বরের ভিতর। এইবার অবশ্য তিনি দড়িটাকে জামানির হাতে সমর্পণ করেননি; খুব সাবধানে ঝুলতে ঝুলতে তিনি নামতে শুরু করলেন দড়ি ধরে। যে পাথরটার সঙ্গে আস্তিলিওর দেহসংলগ্ন দড়িটা বাঁধা ছিল, সেই পাথরটা ছিল খুবই গুরুভার, অতএব তাঁর দেহের ভারে পাথরটা স্থানচ্যুত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

আস্তিলিও নামছেন, নামছেন আর নামছেন······উপর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ আলোর আভাসও ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল; তাঁর মাথার উপর, পায়ের নীচে, সামনে পেছনে চতুর্দিকে বিরাজ করছে এখন সীমাহীন অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার·····

গুহার প্রস্তর-প্রাচীর থেকে বেড়িয়ে আসা একটা পাথরে আস্তিলিওর পা ঠেকল। পাথরটা খুব ধারাল, কিন্তু সেটার উপর দেহের ভার ছেড়ে দিয়ে নির্ভর করা যায়। আস্তিলিও কিছুক্ষণ সেই পাথরটার উপর পা রেখে বিশ্রাম করলেন, তারপর আবার দড়ি ধরে অবতরণ-পর্ব······

কয়েকটা আলগা পাথর আস্তিলিওর দেহের ধাক্কা খেয়ে সশব্দে ছিটকে পড়ল, কয়েকটা নিশাচর পক্ষি ডানা মেলে উড়ে গেল, তাদের ডানার শব্দ ভেসে এল আস্তিলিওর কানে।

গহ্বরের প্রস্তর-প্রাচীর থেকে বেরিয়ে-আসা পাথরগুলো পা দিয়ে অনুভব করছিলেন আস্তিলিও, এবং মাঝে মাঝে ঐ পাথরগুলোর উপর পা রেখে তিনি ক্লান্ত বাহু দুটিকে বিশ্রাম দিচ্ছিলেন। পর পর চারটে পাথরের উপর বিশ্রাম নিয়ে পঞ্চম পাথরটির উপর অবতীর্ণ হলেন আস্তিলিও। একহাতে দড়ি আঁকড়ে অন্য হাতে জ্বলন্ত টর্চ ধরে তিনি গুহার তলদেশ আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গর্তের চারপাশের দেয়াল থেকে ছোট-বড় অসংখ্য পাথর বেরিয়ে এসে দেয়ালটাকে এমন অসমান করে তুলেছে যে, টর্চের আলো সেই প্রস্তরের বেষ্টনী ভেদ করে গুহার তলায় পৌঁছাতে পারল না। আস্তিলিও সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন : পচাঁত্তর ফিট দীর্ঘ রজ্জুর দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেছে, উপর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বরে সাড়া দিয়ে জামানির উত্তরের রেশ অস্পষ্ট হয়ে দুজনের মধ্যে এক ভয়াবহ দূরত্বের আভাস দিচ্ছে,

কিন্তু গহ্বরের তলায় পা দেওয়া তো দূরের কথা, তলদেশ এখনও রয়েছে তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে! গর্তটা নিশ্চয়ই অতল অসীম নয়, কিন্তু এই ভূতুড়ে গহ্বরের গভীরতা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে? কোথায় কত দূরে গেলে পাওয়া যাবে নীচের মাটি?

হঠাৎ আন্তিলিওর পায়ের তলায় পাথরটা নড়ে উঠল। চমকে উঠে তিনি দড়িটা চেপে ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না—পাথরটা তাঁর দেহের ভারে স্থানচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে আন্তিলিও সাহেবও ছিটকে পড়লেন সীমাহারা শূন্যতার মাঝে!

তাঁর দেহটা দেয়াল থেকে দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে নীচের দিকে পড়তে লাগল, গুহার গাত্র-সংলগ্ন ধারালো পাথরগুলো ধারালো ছুরির মতোই নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে দংশন করতে লাগল বারংবার, হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে আন্তিলিওর দেহটা স্থির হয়ে গেল। পঁচাত্তর ফিট লম্বা দড়ির দৈর্ঘ্য শেষ হয়ে গেছে। রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় শূন্যে ঝুলতে লাগলেন আন্তিলিও, তাঁর মনে হল, কোমরে-বাধাঁ দড়িটা তাঁকে দু'টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে!

আন্তিলিও সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে একটা আঠার মতো ঘন চটচটে বস্তুর উষ্ণ অস্তিত্ব অনুভব করলেন: রক্ত। ধারালো পাথরগুলো খোঁচা মেরে মেরে তাঁর পতনোন্মুখ শরীরটাকে রক্তাক্ত করে তুলেছে। কিন্তু রক্তাক্ত ক্ষতগুলোর চাইতে তাঁকে বেশী কষ্ট দিচ্ছে দড়িটা। কোমরের উপর, পাঁজরের দুপাশে শক্ত দড়ি যেন কেটে কেটে বসছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় আন্তিলিওর শরীরটা এখনও আস্ত আছে, ভগ্নাংশে পরিণত হয়নি। বুকের সঙ্গে বাঁধা থলির ভিতর থেকে টর্চটা বার করে আন্তিলিও সেটাকে জ্বেলে ফেললেন এবং চারদিকে দৃষ্টি চালনা করে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলেন। গুহাটা মোটামুটি বৃত্তাকার। তার আনুমানিক ব্যাস প্রায় চল্লিশ ফিট। গুহার ছাদ এবং ভূমির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় শূন্যে দোল খাচ্ছেন আন্তিলিও; পূর্বোক্ত দুটি স্থানের দূরত্ব তাঁর দেহের থেকে প্রায় দশ-বারো ফুট হবে। গুহার নীচে মাটি প্রায় দেখা যাচ্ছে না, অগণিত নরকঙ্কাল ও অস্থিময় নরমুণ্ডের আবরণে গুহার তলদেশের মৃত্তিকা প্রায় অদৃশ্য। অস্থিপঞ্জরগুলো কোথাও ধবধবে সাদা, কোথাও বা সময়ের স্পর্শে হলুদ হয়ে এসেছে।

ঝুলতে ঝুলতে আর দুলতে দুলতে আন্তিলিও টর্চের আলোটাকে গুহা-গহ্বরের কিনারাতে ফেললেন।

গুহার দেয়াল যেখানে নেমে এসে গুহাভূমিকে স্পর্শ করেছে, সেইখানেই মেঝের উপর এক জায়গায় আন্তিলিওর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল: হাড়ের স্তূপের মধ্যে কিছু যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে!

সচল বস্তুগুলোর স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন আন্তিলিও। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঐ জায়গাটা তিনি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

অকস্মাৎ দারুণ আতঙ্কে তাঁর শরীরের রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল! স্তূপীকৃত অস্থি-পঞ্জর আর কঙ্কাল-করোটির মধ্যে বিচরণ করছে কয়েকটা কেউটে সাপ! আন্তিলিও গুনে দেখলেন, সেখানে অবস্থান করছে সাত-সাতটি বিষধর সরীসৃপ।

টর্চের আলোতে বিরক্ত হয়ে কেউটেগুলো অনধিকার প্রবেশকারীকে সন্ধান করছে। তাদের দীর্ঘ মসৃণ দেহ কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। আবার খুলে খুলে যাচ্ছে।

সাপগুলো বুঝতে পারল, তাদের বিরক্তির কারণটি কোথায় অবস্থান করছে। শত্রুর নাগাল না পেয়ে হিংস্র আক্রোশে ফণা তুলে তারা দুলতে লাগল— একবার পেলে হয়।

অনেকের ধারণা, কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মাটিতেই কেউটে সাপের বাস দেখা যায়। ঐ ধারণা ভুল। কেউটে পরিবারের অন্তর্গত অন্ততঃ চারটি বিভিন্ন জাতের সাপ আফ্রিকাতে বাস করে। উপরোক্ত ভয়াবহ তথ্য আন্তিলিও সাহেবের অজ্ঞাত ছিল না; তিনি একথাও জানতেন যে, দেহের যে-কোন স্থানে কেউটের ছোবল পড়লে তাঁকে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকের যাত্রী হতে হবে।

আত্মরক্ষার জন্য তিনি যা করলেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। বাঁ হাতর জ্বলন্ত টর্চ ঘুরিয়ে তিনি সাপগুলোর উপর আলো ফেললেন এবং ডান হাতের পিস্তল থেকে গুলিবর্ষণ করতে শুরু করলেন। পরপর ছয়বার অগ্নি-উদ্গার করে গর্জে উঠল পিস্তল, প্রত্যেকটি গুলি অভ্রান্ত লক্ষ্যে ছয়টি সরীসৃপের দেহ বিদ্ধ করল— একটিও গুলি ব্যর্থ হল না।

সাত নম্বর কেউটের দিকে ফাঁকা পিস্তলটা ছুঁড়ে মারলেন আন্তিলিও, সাপটা চট করে গুহার গায়ে একটা ফাটলের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হল।

দড়িটা আন্তিলিওর কোমরে কেটে বসছিল, সেই যন্ত্রণা আর তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। 'যা থাকে বরাতে' মনে করে শরীরটাকে রজ্জুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে তিনি লাফিয়ে পড়লেন গুহার মেঝের উপর। সাপগুলো তখনও মৃত্যুযাতনায় ছটফট করছিল, আন্তিলিও জুতো-পরা পায়ের লাথি চালিয়ে সেগুলোকে নিরাপদ ব্যবধানে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরই একটা অস্থিময় নরমুণ্ডের উপর হোঁচট খেয়ে তিনি পড়ে গেলেন!.........

কতক্ষণ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন সে কথা আন্তিলিও নিজেও বলতে পারবেন না। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি ধীরে ধীরে আহত ও রক্তাক্ত শরীরের পরিচর্যায় মনোনিবেশ করলেন। উপর থেকে ছিটকে পড়ার সময়ে পাথরের খোঁচা লেগে যেসব জায়গা কেটেকুটে গিয়েছিল, সেই ক্ষতস্থানগুলোর উপর তিনি 'ব্যাণ্ডেজ' বেঁধে ফেললেন। অবশ্য সেইজন্য তাঁকে পরনের শার্টটা ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। গহ্বরের গায়ে যে ফোকরটার ভিতর দিয়ে সাত নম্বর সাপটা অন্তর্ধান করেছিল, সেই ফুটোটার কাছে গিয়ে আন্তিলিও লক্ষ্য করলেন বাইরের বাতাস পূর্বোক্ত গর্তটার ভিতর দিয়ে সশব্দে গুহার ভিতর প্রবেশ করছে। আন্তিলিও এইবার বুঝলেন, আশী ফিট গভীর এই গহ্বরের ভিতর সাপগুলো কোন্ পথে এসেছে। স্তূপীকৃত অস্থি-পঞ্জরের ভিতর থেকে একটা হাড় নিয়ে তিনি চটপট ঐ ফোকরটার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

এতক্ষণে আন্তিলিও সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাঁর দেহে রক্ত চলাচল করছে স্বাভাবিকভাবে। এই ভয়ানক গহ্বরটা যে 'কায়না', এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই তাঁর।

মাম্বোয়া-সর্দারদের আদেশে এই সুগভীর গহ্বরের মধ্যে অপরাধীদের নিক্ষেপ করা হত। অপরাধের গুরুত্ব সব সময় খুব বিবেচ্য নয়, মাম্বোয়া-সর্দার বা মাতব্বরদের অপ্রীতিভাজন হলেই উক্ত ব্যক্তিকে বিসর্জন দেওয়া হত কায়নার গর্ভে। মাম্বোয়ারা এই রীতি পছন্দ করত না, কিন্তু তারা জানত কেউ যদি শ্বেতাঙ্গদের কাছে মৃত্যুগহ্বরের সন্ধান দেয়, তবে

মাম্বোয়া-সর্দারদের আদেশে সেই ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য। সেইজন্যই তারা মুখ খুলত না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু যখন কাছে এগিয়ে এসেছে তখনই তারা মুখ খুলতে চেয়েছে। আত্তিলিওর মনে পড়ল নিগ্রো পুলিসম্যান ও স্থানীয় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির কথা। মরার আগে তারা মৃত্যুগহ্বরের রহস্য ফাঁস করে দিতে চেয়েছিল, কারণ তারা বুঝেছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মাম্বোয়া-সর্দারদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার আগেই মৃত্যুর স্পর্শে তাদের জিহ্বা হয়ে যায় স্তব্ধ। ঐ সব ঘটনাগুলো বার বার আত্তিলিওর মনে পড়তে লাগল।

মৃত্যুগহ্বরের ভিতর যে সব মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কথা মনে হতেই শিউরে উঠলেন আত্তিলিও। অনাহারে আর তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু-যাতনা ভোগ করেছে ঐ সব হতভাগ্যের দল, তিল তিল করে শুকিয়ে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে মৃত্যুর দিকে। সেইজন্যই এই গুহার নাম দেওয়া হয়েছে 'কায়না' অর্থাৎ 'যাতনাদায়ক মৃত্যুগহ্বর'।

নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য যুগ যুগ ধরে মাম্বোয়া-সর্দাররা এই প্রথা বাঁচিয়ে রেখে জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। মাম্বোয়া জাতির মাতব্বরদের এই নৃশংসতায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই— পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় সর্বদেশে সর্বক্ষেত্রে এই ধরনের একদল লোক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য।

আত্তিলিও হঠাৎ চমকে উঠলেন : এসব তিনি কি ভাবছেন? মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা না ভেবে তাঁর নিজের কথাই এখন চিন্তা করা উচিত। মাম্বোয়াদের মধ্যে প্রচলিত একটা ভয়ানক প্রবাদ বাক্য তাঁর মনে পড়ল— 'এখানে যে প্রবেশ করে, তার উদ্ধারের আশা নেই!'

আত্তিলিওর মনে হল, মূর্খের মতো অন্য মানুষের দুঃখের কথা ভেবে তিনি মূল্যবান সময়ের অপচয় করছেন। যদি এই গহ্বরের বাইরে তিনি না যেতে পারেন, তবে তাঁর দেহের কঙ্কালটিও একদিন এই গুহার অস্থিস্তূপের মধ্যে পড়ে থাকবে। আত্তিলিও এইবার মৃত্যুগহ্বরের গর্ভ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

দড়িটা উপরে ঝুলছিল। আত্তিলিও সেটাকে লক্ষ্য করে লাফ মারলেন। বৃথা চেষ্টা, লাফিয়ে ঐ দড়িটাকে করায়ত্ত করা সম্ভব নয়। তিনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেন, প্রতিধ্বনি তাঁকে বিদ্রূপ করল, উপর থেকে জামানির কণ্ঠস্বরে কোন উত্তর এসে পৌঁছাল না তাঁর কাছে।

আত্তিলিও এইবার অন্য উপায় অবলম্বন করলেন। অনেকগুলো পাথর আর নরকঙ্কাল টেনে জড় করলেন দড়িটার নীচে, তারপর ঐ পাথর আর হাড়ের স্তূপের উপর আরোহণ করে এক সময়ে দড়িটাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু এখনও ঝামেলা অনেক— দড়ির শেষ প্রান্তে যে গিঁট আছে সেটাকে না খুললে চলবে না। ইতিমধ্যে টর্চের ব্যাটারী শেষ হয়ে এসেছে, আলোটা কাঁপতে শুরু করল। আত্তিলিওর সমস্ত শরীর তখন অবসাদে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে, কেবল দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাঁকে

দুপায়ের উপর খাড়া করে রেখেছিল! কম্পিত হস্তে দড়ির গিঁটটা একসময়ে খুলে ফেললেন আত্তিলিও। পিস্তল আর টর্চ ব্যবহারের যোগ্য ছিল না, তাই সে দুটির পরিবর্তে কয়েকটা হাড়ের টুকরো আত্তিলিও তাঁর হাতের থলির মধ্যে ভরে নিলেন। শ্রান্ত দেহে অনেকটা দূরত্ব তাঁকে দড়ি ধরে অতিক্রম করতে হবে, ঐ অবস্থায় হাড়গোড় দিয়ে ওজন বাড়িয়ে নিজেকে ভারগ্রস্ত করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে বুঝেও মৃত্যুগহ্বর থেকে কিছু নিয়ে যাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারেননি আত্তিলিও। জীবনের আশা তিনি ত্যাগ করেছিলেন, তবু যদি জীবিত অবস্থায় কায়নার বাইরে পদার্পণ করতে পারেন, তবে ঐ হাড়গোড়গুলো বিল আর প্রফেসরের সামনে প্রমাণস্বরূপ দাখিল করতে পারবেন ভেবেই আত্তিলিও বাড়তি ওজনের ঝঞ্ঝাট বহন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

হাত আর পায়ের সাহায্যে যেভাবে মানুষ সাধারণতঃ দড়ি বেয়ে উপরে ওঠে, সেইভাবে চেষ্টা করলে খুব সম্ভব আত্তিলিও ব্যর্থ হতেন। শ্রান্ত-ক্লান্ত বাহু ও পায়ের মাংসপেশী সুদীর্ঘ রজ্জুপথে বেশীক্ষণ তার দেহভার বহন করতে পারত কিনা সন্দেহ। তাই আত্তিলিও একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। দড়িটাকে তিনি দক্ষিণ উরুর তলা দিয়ে চালিয়ে দিলেন, তারপর যে অংশটা তিনি অতিক্রম করছিলেন, দড়ির সেই অংশটুকু ডান দিকের উরুর তলা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে দক্ষিণ বাহুর ঊর্ধ্বাংশের উপর ফেলে দিচ্ছিলেন। এইভাবে যে দড়ির বেষ্টনী তৈরী হয়েছিল তার মধ্যে ডান পা ঝুলিয়ে রেখে বাঁ পা দিয়ে গুহার দেয়ালে বেরিয়ে-আসা পাথরের মাঝে মাঝে ধাক্কা মেরে উপরে উঠেছিলেন আত্তিলিও। দোদুল্যমান রজ্জুর দুটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে এবং আত্তিলিওর দুই পায়ের মাঝখানে ঘর্ষিত হয়ে শূন্য পথে ভাসমান দেহের ভারসাম্য রক্ষা করছিল; ফলে ক্লান্ত শরীরটা অল্প আয়াসেই ঝুলিয়ে রেখে মাঝে মাঝে দম নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন তিনি।......

তবু মাঝে মাঝে ক্লান্ত মুঠির বাঁধন খুলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, মাঝে মাঝেই দড়ির উপর শিথিল হয়ে এসেছে হাতের আঙ্গুলগুলো, কিন্তু কিছুতেই হাত ছাড়েননি আত্তিলিও, শক্ত করে বারবার আঁকড়ে ধরেছেন দড়িটাকে.........

গহ্বরের উপর দিকে তিনি যত উঠছিলেন, নিরেট অন্ধকার ততই হাল্কা হয়ে গহ্বরের বহির্দেশে উজ্জ্বল সূর্যালোকের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল। সেই আলোর আভাসই প্রেরণা দিয়েছে, শিথিল আঙুলের বাঁধন খুলে যেতে আবার দড়িটাকে চেপে ধরেছেন দৃঢ় মুষ্টিতে।

আত্তিলিও উপরে উঠতে লাগলেন অতি কষ্টে, ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে......

অবশেষে এক সময় তিনি গহ্বরের মুখে এসে পৌঁছালেন। মাথাটা গর্তের বাইরে ঠেলে দিয়ে সামনে দৃষ্টিপাত করলেন : ভগবানকে ধন্যবাদ, জামানি যথাস্থানেই অবস্থান করছে।

আত্তিলিওকে দেখামাত্রই জামানির দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, ওষ্ঠাধর হল বিভক্ত এবং সর্বশরীরে জাগল কম্পিত শিহরণ!

'সাহায্য কর,'— আত্তিলিও ভগ্নস্বরে বললেন, 'তাড়াতাড়ি কর!'

জামানি অবরুদ্ধ কণ্ঠে আর্তনাদ করে, 'মাসাংগা! তোমার নিজের আত্মা!'

আত্তিলিওর হাত ধরার চেষ্টা না করে সে ধপাস করে মাটির উপর পড়ে গেল।

আত্তিলিও পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনও রকমে হাত বাড়িয়ে গহ্বরের মুখে দড়ি বাঁধা পাথরটা চেপে ধরে পতন থেকে আত্মরক্ষা করলেন। তারপর শেষ শক্তি দিয়ে নিজের পতনোন্মুখ দেহটাকে টেনে আনলেন গহ্বরের বাইরে। শ্রান্ত ও অবসন্ন শরীরে অতি কষ্টে শ্বাস টানতে টানতে আত্তিলিও শুনলেন জামানির আর্তনাদ— ' মাসাংগা! তুমি মরে গেছ! আমি জানি, তুমি মরে গেছ! মরে তুমি ভূত হয়েছ! —তবে কেন থলির মধ্যে তোমার মুন্ডু আর হাড়গুলো নিয়ে এলে আমার কাছে! মাসাংগা! আমি তোমার বিশ্বস্ত অনুচর, আমার সঙ্গে তোমার একি ব্যবহার, মাসাংগা!'

আত্তিলিও হাসেননি!

হেসে ওঠার ক্ষমতা তাঁর তখন ছিল না।

সৈনিকের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা—

শয়তানের ফাঁদ

প্রথম পরিচ্ছেদ : অর্ধেক মানব আর অর্ধেক দানব

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি নামক মিত্রপক্ষের জনৈক সেনাধ্যক্ষ আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে উদ্‌যোগী হন। ঐ কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিল তাঁর দুই বন্ধু— 'প্রফেসর' ও 'বিল'। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ফরাসী বৈজ্ঞানিক, দ্বিতীয় মানুষটি হচ্ছে আমেরিকার এক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় দুঃসাহসী যুবক। বন্ধু দুটিকে নিয়ে যে অঞ্চলে প্রথম পদার্পণ করলেন আত্তিলিও, সেই জায়গাটি হল আফ্রিকার অন্তর্গত উত্তর রোডেশিয়া। পূর্বোক্ত স্থানে 'কায়না' নামে এক ভয়াবহ মৃত্যুগহ্বরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে অভিযাত্রীরা স্থানীয় সরকারকে অবাক করে দিয়েছিলেন। কায়নার গহ্বর থেকে অসংখ্য নরকঙ্কাল, করোটি, পাথরের গয়না এবং জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। ঐ সব জিনিস উপহার হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম নীচে দেওয়া হল :

গভর্নমেন্ট অব নর্দার্ন রোডেশিয়া, আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি, আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়, রয়্যাল অ্যানথ্রপলজিক্যাল মিউজিয়াম অব ফ্লোরেন্স এবং জোহানেস্‌বার্গের উইটওয়াটারস্র্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর রোডেশিয়াতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্যে সাফল্য অর্জন করার ফলে অভিযাত্রীদের সামনে দক্ষিণ রোডেশিয়ার রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। দক্ষিণ রোডেশিয়া সরকার সাধারণতঃ বিদেশীদের প্রবেশ করার অনুমতি দেন না, কিন্তু অভিযাত্রীদের বিভিন্ন গবেষণাকার্যের সাফল্যে খুশী হয়েই পূর্বোক্ত গভর্নমেন্ট নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিবরণ পাঠকদের কাছে নীরস লাগবে বলে আত্তিলিও ঐ সব বিজ্ঞান-বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব এখানে পরিবেশন করেননি, লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

দক্ষিণ রোডেশিয়াতে ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলেন আত্তিলিও। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, সেখানে গিয়ে এক বিপদজনক নাটকের মধ্যে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে ভয়াবহ নাটকের স্মৃতি আত্তিলিওর মানসপটে দুঃস্বপ্নের মতো জেগে থাকবে। সেই বন্য-নাটকে একাধিক 'ভিলেন' বা খলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল প্রকাণ্ড এক নরখাদক সিংহ, এক শয়তান যাদুকর এবং ক্রোধে উন্মত্ত একশ জুলুযোদ্ধা!

নায়কের ভূমিকায় ছিল পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী এক সুদর্শন জুলুযোদ্ধা, নায়িকার স্থান নিয়েছিল এক ষোড়শী জুলুবালিকা।

উল্লিখিত প্রধান চরিত্রগুলো ছাড়া কিছু কিছু 'এক্সট্রা' অর্থাৎ অতিরিক্ত চরিত্রের উপস্থিতি নাটকটিকে জমিয়ে তুলেছিল, যেমন— প্রচণ্ড ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন জুলু-সর্দার, নরমাংস-লোলুপ শত শত সিংহ, এবং আত্তিলিও, বিল, প্রফেসর প্রভৃতি অনিচ্ছুক অভিনেতার দল।

মূল নাটকে আত্তিলিওর ভূমিকা ছিল খুবই ছোট, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি মানুষের জীবন মরণ নির্ভর করছিল তাঁর অভিনয়ের সাফল্যের উপর; এবং ঐ দুটি মানুষের একজন হলেন স্বয়ং আত্তিলিও! তবে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও তিনি ঘাবড়ে যাননি, বেশ ভালো হয়েছিল তাঁর অভিনয়। না, ভালো বললে কিছুই বলা হয় না— এমন চমৎকার, এমন মর্মস্পর্শী হয়েছিল তাঁর অভিনয় যে, সমস্ত ঘটনা শোনার পর মনে হয় সৈনিকের পেশা গ্রহণ না করে পেশাদার অভিনেতার বৃত্তি অবলম্বন করলে অনেক বেশী যশ ও খ্যাতির অধিকারী হতে পারতেন কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি।

কম্যাণ্ডার সাহেব প্রথমে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী রাইফেল হাতেই আসরে নেমেছিলেন, কিন্তু নাটকের প্রয়োজনে অস্ত্রত্যাগ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন যাদুকরের ভূমিকায়— রাইফেলের পরিবর্তে তখন তাঁর হাতে 'ম্যাজিকের বাক্স'! সে সব ঘটনার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হবে।

পূর্বোক্ত নাটকের বিবরণী দেওয়ার আগে যখন এত কথাই বললাম, তখন যে পটভূমির উপর নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল সেই রঙ্গমঞ্চটি সম্বন্ধেও পাঠককে অবহিত করা প্রয়োজন।

মঞ্চটি ছিল ঐ অভিনব নাটকেরই উপযুক্ত— আয়তনে বিশাল এবং চমকপ্রদ দৃশ্য সজ্জায় সুশোভিত। জুলুল্যাণ্ডের উত্তর অংশে বিরাজমান ইনিয়াতি পর্বতমালার অরণ্যসজ্জিত বিপুল বিস্তৃতি নিয়ে গঠিত হয়েছিল উল্লিখিত নাটকের 'স্টেজ' বা মঞ্চ।

উত্তর রোডেশিয়া ত্যাগ করে এগারজন নিগ্রো অনুচর নিয়ে অভিযাত্রীরা ইনিয়াতি পর্বতমালার দিকে অগ্রসর হলেন। পূর্বোক্ত নিগ্রোদের সংগ্রহ করেছিল জামানি নামক আত্তিলিওর বিশ্বস্ত অনুচর ও রাঁধুনী। সকলেই জানত যে, তাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে জুলুল্যাণ্ড।

জামানি জুলুল্যাণ্ডের অধিবাসী, অতএব স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেলে তার পক্ষে খুশী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা ভয়ানক সমস্যা তাকে এমনভাবে বিব্রত করে তুলেছিল যে দেশে ফেরার আনন্দ সে প্রথমে উপভোগ করতে পারেনি। সমস্যাটা হচ্ছে এই:

আত্তিলিওকে কায়নার ভয়াবহ গহ্বর থেকে উঠতে দেখেছিল জামানি, আর তৎক্ষণাৎ বুঝে নিয়েছিল প্রভুর মতো দেখতে ঐ 'জীবটি' হচ্ছে 'প্রভুর প্রেতাত্মা'; কারণ, একটা নিঃসঙ্গ মানুষ মৃত্যুগহ্বরের অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করে আবার জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পারে, এমন অসম্ভব কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়.....কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার জামানির

মনে খটকা লাগল— একটা আস্ত ভূতের পক্ষে নিরেট রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে সবসময় চলাফেরা করা কি সম্ভব? আবার ঘর্মাক্ত হল জামানির মস্তিষ্ক......অবশেষে বিস্তর চিন্তা করে, বিস্তর মাথা ঘামিয়ে, আসল ব্যাপারটা সে ধরে ফেলল— আত্তিলিও হচ্ছেন, 'অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক প্রেত!' না হলে, কায়নার মতো ভয়াবহ মৃত্যুগহ্বরের ভিতর থেকে একটা আস্ত মানুষ কি কখনো জ্যান্ত অবস্থায় ফিরতে পারে?......

যাই হোক, 'প্রেত-মানুষ' যে তার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে তাকে মাতৃভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে এই চমকপ্রদ তথ্যটি আবিষ্কার করার পরই মনের মেঘ কেটে গেল, উৎফুল্ল হয়ে উঠল জামানি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জুলুদের দেশে আত্তিলিও

আত্তিলিও তাঁর অভিযাত্রীদল নিয়ে জুলুল্যাণ্ডের ভিতর এসে পৌঁছালেন। তিনি জানতেন দলের নেতা হিসাবে দলীয় নিরাপত্তার গুরু দায়িত্ব এখন থেকে তাঁকেই বহন করতে হবে। শ্বেতাঙ্গ সরকার অভিযাত্রীদের জুলুল্যাণ্ডে প্রবেশের অনুমতি দিলেও তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে অসম্মত। সরকার স্পষ্ট জানিয়েছিলেন— অভিযাত্রীরা জুলুল্যাণ্ডে প্রবেশ করার ফলে যদি কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেজন্য অভিযাত্রীরাই দায়ী হবেন— স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট জুলুদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছুতেই হস্তক্ষেপ করবেন না, অবশ্য বিদ্রোহ কিংবা গণহত্যা সংঘটিত হলে আলাদা কথা।

ওসব কথা শুনে ঘাবড়ে যাওয়ার পাত্র নন আত্তিলিও। তিনি আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারতেন; জুলুদের ভাষা তিনি এমনভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, ঐ ভাষা বলতে বা বুঝতে তাঁর কিছুমাত্র অসুবিধা হত না। আত্তিলিও তাঁর জুলু-অনুচর জামানির কাছে যা শুনেছিলেন, তা থেকে জুলুদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, জাত্যভিমানে গর্বিত জুলুজাতি অতিশয় সাহসী ও সহজ-সরল— আধুনিক জীবনযাত্রার পদ্ধতি তাদের পছন্দ নয়, তারা অনুসরণ করে পূর্বপুরুষদের প্রচলিত রীতিনীতি। আফ্রিকার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জাতিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জুলুজাতি।

সব কিছু শুনে আত্তিলিওর মনে হয়েছিল জুলুল্যাণ্ডে তাঁদের বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে না। নিশ্চিন্তমনে দলবল নিয়ে তিনি একটা বৃত্তাকার পর্বত-চূড়ার দিকে অগ্রসর হলেন। উক্ত পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিল অনেকগুলো কুটির। সেই কুটিরগুলোই ছিল আত্তিলিওর লক্ষ্যস্থল। এখানে বাস করে জুলুদের সর্বাধিনায়ক জিপোসো। শ্বেতাঙ্গ সরকার কখনও তার কথার উপর কথা বলেন না; স্থানীয় ব্যাপারে জিপোসো হচ্ছে জুলুরাজ্যের মুকুটহীন রাজা।

'দেখো,' প্রফেসার বললেন, 'সর্দারের নিশ্চয়ই চল্লিশটি বৌ আছে।'

ঠিকই বলেছেন প্রফেসার। তবে সর্দার-পত্নীদের সঠিক সংখ্যা অনুমান করার জন্য

প্রফেসরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করলে ভুল হবে— জুলুজাতির সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যারা অবহিত, তাদের পক্ষে যে কোনও জুলু-পুরুষের আস্তানার সম্মুখীন হয়ে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর সংখ্যা বলে দেওয়া খুবই সহজ। জুলুরা গ্রামবাসী নয়; প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ তার বৌদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বাস করে— সবচেয়ে বড় কুটিরটাতে বাস করে কর্তা স্বয়ং, এবং গরু রাখার জন্য যে বিস্তীর্ণ স্থানটিকে বেড়ার সাহায্যে ঘিরে ফেলা হয়, সেই ঘেরা-জায়গার চারপাশে মালিকের স্ত্রীদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট থাকে একটি করে কুটির। পূর্বোক্ত পত্নীরা তাদের নিজস্ব সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঐ সব কুটিরে বাস করে। অতএব বৃহত্তম কুটিরটির আশেপাশে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কুটিরগুলোর সংখ্যা দেখে অনায়াসেই আস্তানার মালিকের স্ত্রীর সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। বহু কুটির নিয়ে গঠিত জুলুদের এই আস্তানাকে বলে 'ক্রাল'। একটি ক্রাল থেকে আর একটি ক্রালের দূরত্ব খুব কম নয়। বেশ কয়েক মাইল দূরে দূরে অবস্থিত ক্রাল প্রায়ই দেখা যায় জুলুদের দেশে।

প্রফেসর বললেন, 'দেখো, ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

হ্যাঁ, ওরা অপেক্ষা করছিল। পুরুষদের নিয়ে গঠিত এক বৃহৎ জুলু জনতা নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করছিল। তাদের চারপাশে দণ্ডায়মান জুলুমেয়েরা কলকণ্ঠে উত্তেজনা প্রকাশ করলেও পুরুষরা ছিল প্রস্তর মূর্তির মতো নিশ্চল, নীরব।

জিপোসোর নিজস্ব গুপ্তচর বিভাগ যে অতিশয় সক্রিয়, এই ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। কারণ জিপোসোর আস্তানা বা ক্রালের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অভিযাত্রীরা কোনও মানুষকে দেখতে পাননি, অথবা ঢাকের আওয়াজও তাঁদের শ্রুতিগোচর হয়নি— অথচ যথাস্থানে পৌঁছেই দেখলাম তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে এক বিপুল জনতা। জুলুরা কি ভাবে বাস করে সে কথা আগেই বলেছি, কাজেই দূর-দূরান্তে অবস্থিত বিভিন্ন ক্রাল থেকে যে ঐ সব মানুষকে যথাসময়ে ডেকে আনা হয়েছে, একথা অনুমান করা কঠিন নয়।

ভিড়ের মধ্যে জুলুদের অধিনায়ক জিপোসো দাঁড়িয়েছিল জনতার ঠিক মাঝখানে। তার অঙ্গ বেষ্টন করে ঝুলছিল একটা লেপার্ডের চামড়া। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য জানোয়ারের লেজ ঐ লেপার্ড চর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জুলুসর্দারের অঙ্গের শোভা বর্ধন করছিল। তার কেশশূন্য মস্তকে উষ্ণীষের অভাব পূরণ করেছিল অনেকগুলো রঙিন পাখির পালক। বহু বর্ণে রঞ্জিত ঐ পালকগুলো বাতাসের ধাক্কায় দুলছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রখর সূর্যালোকে জ্বলে জ্বলে উঠছিল দোদুল্যমান রামধনুর রঙিন সমারোহ।

জিপোসোর গায়ের রং কালো নয়,— হালকা-বাদামী। সেই বাদামী দেহের অপূর্ব ভঙ্গি, উন্নত মস্তক ও কালো দুই চোখের তীব্র উদ্ধত চাহনি যেন নীরব ভাষায় এক প্রচণ্ড পুরুষের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে চাইছে— প্রথম দর্শনেই মনে হয়— হ্যাঁ, একটা পুরুষের মতো পুরুষ বটে সর্দার জিপোসো।

'সালাগাত্লে,' আন্তিলিও বললেন, 'তুমি শান্তিতে থাক।'

'স্যাগাবোনা, জা বাব', স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল হল জুলুসর্দারের মুখমণ্ডল, 'ফদার, তুমি শান্তপ্রিয় মানুষ।'

জামানি হাঁটু পেতে বসে সর্দারের সামনে ভূমিতে ললাট স্পর্শ করল। জিপোসো একবার তার দিকে তাকিয়ে জামানির অভিবাদন গ্রহণ করল, তারপর অন্তিলিওর দিকে ফিরল, 'আমি শুনেছি তুমি ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছ।'

মুহূর্তের মধ্যে আন্তিলিও অনুভব করলেন প্রবল প্রতাপশালী এই জুলুসর্দারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। জনতার প্রবল হর্ষধ্বনি থেকে বোঝা গেল, জুলুরাও অভিযাত্রীদের পছন্দ করেছে। আন্তিলিওর অনুচর জামানি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করল। যোদ্ধাদের হাতে বর্শাগুলো আনন্দের আবেগে শুন্যে দুলে উঠল বারংবার, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত নারীকণ্ঠে জাগল তীব্র উল্লাসধ্বনি!

তারপর সর্দার জিপোসোর আদেশে মহামান্য অতিথিদের জন্য এল মেহগনি কাঠের আসন, খাদ্য, পানীয়। সকলে মিলে একসঙ্গে পানভোজন করতে করতে গল্পগুজব আরম্ভ করলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রফেসরের কীর্তি

জামানি কাজের লোক। অভিযাত্রীরা যেদিন জুলুদের দেশে পদার্পণ করলেন, সেইদিনই রাতের দিকে তাঁদের বসবাসের উপযুক্ত একটা সুন্দর উপত্যকা আবিষ্কার করে ফেলল জামানি। এক সপ্তাহ লাগল সব গুছিয়ে ঠিকঠাক করতে, ইতিমধ্যে কুলির সাহায্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসার ব্যবস্থাও হয়েছিল— তারপর স্থায়ীভাবে একটা তাঁবু খাটিয়ে বেশ কিছুদিন জুলুদের দেশে থাকার বন্দোবস্ত করলেন অভিযাত্রীরা।

স্থায়ী আস্তানা পেতে ফেলার পরই ম্যাজিক, যাদু-বিদ্যা, ডাকিনী-তন্ত্র প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে অভিযাত্রীদের পরিচয় হতে লাগল প্রতিদিন। জুলুরা অলৌকিক কার্যকলাপে বিশ্বাসী। তাদের ধারণা প্রতিদিনে ছোটখাট ব্যাপার থেকে শুরু করে যাবতীয় আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনার জন্য দায়ী পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার দল। প্রেতাত্মার রোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন যাদুকরের সাহায্যপ্রার্থী হয়। জুলুদের উপর তাই যাদুকরদের প্রভাব খুব বেশী।

আন্তিলিও এবং তাঁর দুই বন্ধু আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা করতে এসেছিলেন, তাই জুলুজাতির গড়পড়তা দৈহিক পরিমাপ দরকার ছিল। মাপ দেওয়ার আগে প্রত্যেক জুলু তার পছন্দসই যাদুকরের কাছ থেকে কবচ বা তাবিজ সংগ্রহ করেছিল— ঐ কবচ নাকি তাদের সাদা মানুষের ম্যাজিক থেকে রক্ষা করবে! কিন্তু মাপ নেওয়ার ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর অভিযাত্রীদের কাছ থেকে তামার তার, 'টম্বাকো' (তামাক), দেশলাই, ছোরা প্রভৃতি উপহার পেয়ে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। জিনিসগুলো তাদের যে সত্যি সত্যি দিয়ে দেওয়া হল, সে কথা তারা প্রথমে বুঝতে পারল না— এমন মূল্যবান সব উপহার কেন তাদের দেওয়া হচ্ছে? তারা তো সাদা মানুষদের জন্য কিছুই করেনি! তবে? .....অবশেষে যখন তারা বুঝল ঐ সব জিনিস তাদের উপহার দেওয়া

হয়েছে এবং এগুলো আর ফেরত নেওয়া হবে না, তখন তারা ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল। বিস্ময়ের চমক কেটে যেতেই জাগল আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস। উত্তেজিত আনন্দিত জুলুদের সশব্দ হাস্যধ্বনি শুনে অভিযাত্রীরাও খুশী।

কিন্তু অভিযাত্রীরা যখন 'প্লাস্টার অব প্যারিস' দিয়ে মুখের ছাপ নেবার চেষ্টা করলেন, তখন তাঁরা দেখলেন এই ব্যাপারটা আগের মতো সহজে হওয়ার নয়। প্যারিস প্লাস্টারের ছাপ তোলার হাঙ্গামা যথেষ্ট। ঘন আঠার মতো অর্ধতরল জিনিসটা যখন ব্যক্তিবিশেষের মুখের উপর মাখানো হয়, তখন সেই লোকটির নাকের দুই ফুটো দিয়ে দুটি বড় খড় চালিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়, এবং পূর্বোক্ত তরল প্লাস্টার শুকিয়ে শক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ লোকটির একটুও নড়াচড়া করার উপায় থাকে না। মুখের গোঁফ দাড়ি প্রভৃতি ছাপ তোলার আগে তেল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়; কিন্তু তেলের পরিমাণ কম হলে প্লাস্টারের ছাঁচ বা মুখোস টেনে নেওয়ার সময় মুখের গোঁফদাড়ি ছিঁড়ে মুখের ছাপের সঙ্গে উঠে আসে! ব্যাপারটা মোটেই আরামদায়ক নয়।

তবে এই সব অসুবিধা সহ্য করতে জুলুদের বিশেষ আপত্তি ছিল না। তাদের আপত্তির কারণ অন্য। জুলুদের সামনেই অভিযাত্রীরা জামানির মুখের ছাপ নিলেন। জুলুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখল, কিন্তু একজন মুখের ছাপ দিতে রাজি হল না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে ঐ ছাপ তুলতে দিলে তাদের 'দ্বিতীয় মুখ' সাদা মানুষদের সঙ্গে থেকে যাবে এবং কোনও শত্রু যদি উক্ত 'দুই নম্বর মুখে' আঘাত করে তবে মুখের প্রকৃত অধিকারীর উপর সেই আঘাত এসে পড়বে। অতএব বহু মূল্যবান উপহারের বিনিময়েও তারা মুখের ছাপ তুলতে দিতে রাজী নয়।

কয়েকজন যাদুকর গম্ভীরভাবে জানাল, যাদু-বিদ্যার সাহায্যে এমন অভিনব দুর্ঘটনা থেকে জুলুদের রক্ষা করার ক্ষমতা তাদের নেই। ব্যস! হয়ে গেল! যাদুকর যেখানে ভয় পায়, সেখানে এগিয়ে যাওয়ার সাহস আছে কার? .....ইতিপূর্বেও কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টা সংস্কার-অন্ধ মানুষের কাছে পরাজিত হয়েছে, মনে হল আত্তিলিওর দলও কুসংস্কারের কাছে পরাজিত হবে। কিন্তু অভিযাত্রীরা জানতেন কুসংস্কারকে পরাস্ত করতে হলে তার বিরুদ্ধে অন্ধ-সংস্কারকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হয়— অবশ্য যদি সেরকম সুযোগ পাওয়া যায়।

সুযোগ এল অপ্রত্যাশিতভাবে।

বহু দূরবর্তী এক ক্রাল থেকে জনৈক জুলুযোদ্ধা অভিযাত্রীদের তাঁবু পরিদর্শন করতে এল। তাঁর বাঁ দিকের গাল ফুলেছে দেখে আত্তিলিও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল বেচারা দাঁতের ব্যথায় ভুগছে, খারাপ দাঁতের জন্যই তার গণ্ডদেশের ঐ দূরবস্থা। সিগারেট উপহার দিয়ে আত্তিলিও তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন, তারপর দাঁতের চিকিৎসা করার জন্য এগিয়ে এলেন প্রফেসর।

লোকটিকে হাঁ করতে বলে প্রফেসর তার মুখের ভিতর একটা ক্ষতযুক্ত গর্ত দেখতে পেলেন। লবঙ্গ দিয়ে তৈরী একরকম চটচটে আঠার মতো ঘন পদার্থ দিয়ে ক্ষতটাকে ঢেকে

দিলেন প্রফেসর। ঐ অদ্ভুত চটচটে পদার্থটি প্রফেসরের নিজস্ব আবিষ্কার। যাতনাদায়ক দাঁতের রোগে ঐ বস্তু ছিল অব্যর্থ ঔষধ। কিছুক্ষণের মধ্যে চটচটে জিনিসটা জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়, আর তৎক্ষণাৎ দাঁত ব্যথার উপশম হয় মন্ত্রের মতো। লোকটাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দুজনে মিলে তাকে ক্যানভাসের উপর শুইয়ে ফেলে মুখে প্যারিস প্লাস্টারের প্রলেপ লাগাতে শুরু করলেন। হঠাৎ দাঁতের যন্ত্রণা কমে যাওয়ায় লোকটাও অবাক হয়ে গিয়েছিল, বাদ-প্রতিবাদ না করে সে প্রফেসর আর আত্তিলিওর হাতে আত্মসমর্পণ করল। কিছুক্ষণ পরে কাজ শেষ হয়ে যেতেই অভিযাত্রীরা তার মুখের উপর থেকে শক্ত প্লাস্টারের ছাপ, অর্থাৎ লোকটার মুখের ছাপ তুলে ফেললেন।

জুলুযোদ্ধা হতভম্ব হয়ে একবার গালের উপর হাত বুলিয়ে নিল, একবার হাঁ করল, তারপর আবার মুখটা বন্ধ করল। তার ভয়ানক দাঁতের ব্যথা এমন চটপট সেরে যাওয়ায় সে যে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অভিযাত্রীরা তাকে কিছু উপহার দেবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রফেসরের হাতে একটা আসাগাই (বর্শা) গুঁজে দিল। —ডাক্তারের 'ফী'।

পরক্ষণেই দেখা গেল দারুণ আনন্দে চিৎকার করতে করতে জুলুযোদ্ধা তীরবেগে ছুটছে! অসহ্য যন্ত্রণা থেকে এমন আকস্মিকভাবে মুক্তি পেয়ে তার উল্লাস যেন ফেটে পড়তে চাইছে.....

পরের দিন অভিযাত্রীরা দেখলেন 'দ্বিতীয় মুখ' সম্বন্ধে জুলুদের ভয় ভেঙে গেছে একদিনের মধ্যেই। স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে সর্বসমেত উশটি জুলু এসে অভিযাত্রীদের জানাল, দাঁতের ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মুখের ছাপ তুলে চিকিৎসা করাতে তাদের আর আপত্তি নেই। আরোগ্যলাভ করতে পারলেই তারা খুশী, 'দ্বিতীয় মুখ' নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে চায় না!......

চিকিৎসার ফল হল অতীব সন্তোষজনক। জুলুরা নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, হাতে তৈরী সুন্দর সুন্দর কাঠের জিনিস ও আসন অভিযাত্রীদের উপহার দিল। ইতিপূর্বে ঐ সব জিনিস দাম দিয়েও কিনতে পারেননি অভিযাত্রীরা— বিনীতভাবে, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে অসম্মতি জানিয়েছিল জুলুরা। এখন সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই ঐ সব বস্তু উপহার দিয়ে রোগমুক্ত জুলুরা অভিযাত্রীদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। অভিযাত্রীরা যে শুধু নানা রকম ভালো ভালো উপহারই পেয়েছিলেন তা নয়, শতাধিক স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। এই জন্য অবশ্য প্রফেসরকেই ধন্যবাদ দিতে হয়— তাঁর দাঁতের রোগের অব্যর্থ দাওয়াই অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সন্ত্রাস ও বিভীষিকা

জুলুদের দেশে বৃষ্টিপাত একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বৃষ্টিপাতের ফলে বিস্তীর্ণ প্রান্তরগুলো হয়ে ওঠে সবুজ ঘাসের রাজত্ব; এবং ঐ ঘাসজমি থেকে আহার্য সংগ্রহ করে জুলুদের গৃহপালিত গরুর পাল মনের আনন্দে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। গরু হচ্ছে জুলদের সবচেয়ে

বড় সম্পদ। গরুর বিনিময়ে তারা পত্নী সংগ্রহ করতে পারে, তা ছাড়া গোমাংস ও গোদুগ্ধ তাদের উদরের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতেও সাহায্য করে।

বর্ষার জল যে শুধু জুলুদের গো-সম্পদ বৃদ্ধি করে তা নয়, অবিশ্রান্ত ধারাপাত দেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। বৃষ্টিপাতের ফলে শ্যাম-সবুজ অরণ্যের বুক থেকে আহার্য সংগ্রহ করে তৃণভোজী জেব্রা, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি জন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং ঐ সব পশুর মাংসে জীবনধারণ করে জুলুল্যাণ্ডের অগণিত সিংহের দল। কিন্তু বৃষ্টি না হলে বন্য পশুরা শুষ্ক বনভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়, আর ক্ষুধার্ত সিংহরা আকৃষ্ট হয় গোমাংস ও নরমাংসের প্রতি— ফলে জুলুল্যান্ডের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ধ্বংস করে শুরু হয় ভয়াবহ বিভীষিকার রক্তাক্ত তাণ্ডব।

অনাবৃষ্টি যে জুলুদের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর, কতখানি প্রাণঘাতী সর্বনাশ যে ডেকে আনতে পারে বৃষ্টিবিহীন খরার জ্বলন্ত অভিশাপ— তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলেন অভিযাত্রীরা....

আস্তিলিও এবং তাঁর দলবল জুলুল্যান্ডে পদার্পণ করার কয়েক মাস পরেই সেখানে অনাবৃষ্টির সূত্রপাত হয়। শুষ্ক বনভূমি থেকে আহার্য সংগ্রহ করতে না পেরে বহু তৃণভোজী পশু মৃত্যুবরণ করল। যারা বাঁচল তারা অন্যত্র যাত্রা করল তৃণশ্যামল অরণ্যের সন্ধানে। দক্ষিণ দিকের পথে ছুটল ইম্পালা, অরিক্স, ইল্যাণ্ড, ন্যু, জেব্রা, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি তৃণভোজী পশু। ধাবমান পশুদের খুরে খুরে ধূলো উড়ে দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে দিল। পাহাড়ের চূড়ার বিভিন্ন আস্তানা থেকে জুলুরা সেই ধূলোর মেঘ লক্ষ্য করতে লাগল উদ্বিগ্ন চিত্তে। অনাবৃষ্টির দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি সময়ে অদৃশ্য হল সেই ধূলোর মেঘ। সেই সঙ্গে অন্তর্ধান করল তৃণভোজী পশুর দল। বলিষ্ঠ সিংহের দলও তৃণভোজীদের সঙ্গে স্থান ত্যাগ করেছিল, কিন্তু সবচেয়ে বিপদজনক জন্তুগুলো থেকে গেল জুলুল্যাণ্ডের শুষ্ক অরণ্যে— অপ্রাপ্তবয়স্ক একদল তরুণ সিংহ, অভিজ্ঞতার অভাবে যারা বেপরোয়া; বৃদ্ধ সিংহ, দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে যারা অশক্ত, কিন্তু অভিজ্ঞ শিকারীর কৌশল ও চাতুর্যে যারা ভয়ঙ্কর; এবং শাবক সমেত সিংহীর দল, যারা বাচ্চার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

ক্ষুধার্ত সিংহরা এইবার জুলুদের গরুর দিকে নজর দিল। বর্শাধারী জুলুযোদ্ধার দল সতর্কভাবে তাদের গরু রক্ষা করতে সচেষ্ট হল। সিংহরা তখন মানুষের উপর হামলা শুরু করল। কয়েকবার নর-মাংসের স্বাদ গ্রহণ করে জন্তুগুলো ক্ষেপে গেল। দলবদ্ধ নেকড়ের মতোই তারা মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, কুটিরের দরজা বন্ধ করেও কেউ আর নিরাপদ বোধ করে না— দরজা ভেঙ্গে নরখাদক সিংহের দল মানুষ ধরতে আরম্ভ করল। সিংহের এমন অদ্ভুত ভয়ঙ্কর আচরণ ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি।

এককভাবে চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল। জুলুরা দল বেঁধে অস্ত্র হাতে ভ্রমণ করত। কাঁটাগাছের বেড়া দিয়ে জুলুল্যাণ্ডের ক্রালগুলোকে ঘিরে ফেলা হল। ঐ সব ক্রালের চারপাশে সারারাত

আগুন জ্বলত। দৈবাৎ আগুন নিভে গেলেই হানা দেবে নরভুক্ শ্বাপদ। তাই শয্যা আশ্রয় করার আগে প্রত্যেক জুলু কুটিরের বহির্ভাগে অবস্থিত অগ্নিকুণ্ডে সারারাত জ্বলবার মতো কাঠ আছে কিনা দেখে নিত, ঐ সঙ্গে কাঁটার বেড়ার মধ্যেও ফাঁক আছে কি নেই দেখতে তাদের ভুল হত না।

এত সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন ঢাকের আওয়াজে দুর্ঘটনার সংবাদ ভেসে আসতে লাগল। দিনে-রাতে, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন সিংহরা আক্রমণ চালাতে শুরু করল। নিরস্ত্র বালিকা থেকে শুরু করে দুর্ধর্ষ অস্ত্রধারী যোদ্ধা পর্যন্ত কোন মানুষকেই রেয়াৎ করত না হিংস্র শ্বাপদ। দলবদ্ধ সিংহের সঙ্গে বর্শা হাতেই লড়াই করে প্রাণ দিল বহু জুলুযোদ্ধা। তাঁদের সাহস ও বীরত্বের তুলনা হয় না, কিন্তু ক্ষিপ্ত সিংহদের নিরস্ত করা গেল না কিছুতেই— সমগ্র জুলুল্যাণ্ডের উপর মাংসলোলুপ শ্বাপদের নখদন্তে সৃষ্ট হল সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব।

অভিযাত্রীদের কাজকর্মও ব্যহত হল। জুলুদের পক্ষে দূর-দূরান্তের ক্রাল থেকে এখন আর অভিযাত্রীদের তাঁবুতে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু অভিযাত্রীরা জুলুদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। প্রফেসর বিলকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সিংহের কবল থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় হতভাগ্যের চিকিৎসা করতে শুরু করলেন। অনেকে তাঁর চিকিৎসার গুণে বেঁচে গিয়েছিল।

আস্তিলিও গত্তি চিকিৎসার বিষয়ে একেবারে আনাড়ি। কিন্তু তিনিও জুলুদের সাহায্য করতে সচেষ্ট হলেন। তবে ঔষধপত্র বা শল্যচিকিৎসকের ছুরির পরিবর্তে তাঁর হাতে ছিল গুলিভরা রাইফেল। বিলকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন প্রফেসর তাঁর চিকিৎসা কার্যে সাহায্য করার জন্য, সুতরাং সম্পূর্ণ এককভাবেই সিংহ-নিধনে নিযুক্ত হলেন আস্তিলিও। খরার তৃতীয় মাসের মধ্যেই তাঁর রাইফেলের অগ্নিবর্ষী মহিমায় স্তব্ধ হয়ে গেল তিরিশটা সিংহের গর্জিত কণ্ঠ।

কিন্তু তারপরই বিপদ এল অতর্কিতে।
এক শয়তানের চক্রান্তে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন আস্তিলিও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দুয়ারে মৃত্যুর ছায়া

টোয়াবেনি ছিল জুলুল্যাণ্ডের আতঙ্ক। কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে চাইতো না। সে নিজেও লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার আগ্রহ প্রকাশ করত না। অভিযাত্রীরা অনেকবার জামানিকে পাঠিয়ে উক্ত ব্যাক্তিকে তাঁদের তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিন্তু টোয়াবেনি সাড়া দেয়নি। দুর্দান্ত প্রতাপশালী জিপোসা সর্দার পর্যন্ত টোয়াবেনিকে এড়িয়ে চলতো। আস্তিলিও যখন নিজেই এগিয়ে গিয়ে টোয়াবেনির সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন তখন তাঁর সঙ্গী হল জুলুদের সর্বাধিনায়ক জিপোসো স্বয়ং। স্পষ্টই বোঝা যায় টোয়াবেনির আস্তানার মধ্যে আস্তিলিওর নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে বলেই জিপোসো তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল।

আস্তিলিও একটা কম্বল নিয়ে গিয়েছিলেন টোয়াবেনিকে উপহার দেবার জন্য। টোয়াবেনি

একবার আত্তিলিওর দিকে দৃষ্টিপাত করল, পরক্ষণেই কম্বলটা টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে সে সবচেয়ে বড় কুঁড়ে ঘরটার ভিতর ঢুকে গেল। একটু পরেই অবশ্য কুটিরের বাইরে এসে আত্তিলিওকে উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিল টোয়াবেনি। সেই সঙ্গে ভদ্রতা করে একথাও জানালে যে, তার ক্রাল সর্বদাই আত্তিলিওকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত। ইচ্ছে হলেই তিনি যেন তার আস্তানায় চলে আসেন।

টোয়াবেনির ব্যবহার ছিল বেশ স্বাভাবিক ও ভদ্র, কিন্তু আত্তিলিওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাঁকে ঐ লোকটির সম্বন্ধে বার বার সাবধান করে দিল— অন্তরের অন্তস্থলে তিনি অনুভব করলেন টোয়াবেনি তাঁকে পছন্দ করছে না, সুযোগ পেলেই সে শত্রুতা করবে। অবশ্য প্রথম সাক্ষাৎকারের পর বেশ কয়েকবার আত্তিলিও তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তবে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটেনি। দুটি মানুষের মধ্যে বার বার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটলে সাধারণতঃ ঘনিষ্ঠতা হয়, কিন্তু নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে টোয়াবেনি নিজেকে সর্বদাই স্বতন্ত্র করে রেখেছে, মন খুলে কখনও সে কথা বলেনি আত্তিলিওর সঙ্গে।

চোদ্দটি স্ত্রী-র স্বামী এবং তিরিশটি কন্যার পিতা ছিল টোয়াবেনি। তার পরিবারবর্গের মধ্যে কারও সঙ্গেই আত্তিলিওর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কিন্তু টোয়াবেনির ষোল বছরের মেয়ে মৃদাবলি আত্তিলিওর প্রতি আকৃষ্ট হল। খুব সম্ভব বনবালা মৃদাবুলি তার সহজাত সংস্কার দিয়ে আত্তিলিওর মধ্যে এক সহানুভূতিসম্পন্ন বন্ধুকে আবিষ্কার করেছিল। মেয়েটির জীবনে যে একটি সত্যিকার বন্ধুর দরকার হয়েছিল, পরবর্তী ঘটনাস্রোত থেকে আমরা শীঘ্রই তা জানতে পারব।

একদিন মধ্যাহ্নে জলন্ত আফ্রিকার সূর্য যখন আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে সেইসময় রাইফেল হাতে আত্তিলিও এলেন টোয়াবেনির ক্রালে। সিংহের আক্রমণ থেকে তার ক্রালকে নিরাপদ রাখার জন্য টোয়াবেনি কি ব্যবস্থা করেছে সেইটা দেখাই ছিল আত্তিলিওর উদ্দেশ্য। টোয়াবেনির আস্তানার সামনে গিয়ে আত্তিলিও অবাক হয়ে গেলেন— ক্রালটাকে বেষ্টন করে বিরাজ করছে কন্টকসজ্জিত গাছপালার এক বিরাট দুর্ভেদ্য ব্যূহ, এবং ব্যূহের চারপাশ ঘিরে সারারাত ধরে জ্বলবার জন্য সংগৃহীত হয়েছে রাশি রাশি শুকনো কাঠ— একবার তাকিয়েই বোঝা যায় শতাধিক লোকের সাহায্য ছাড়া এমন প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

আত্তিলিও আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন দিনদুপুরে লোকজন, গরুবাছুর এমনভাবে বেড়ার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে কেন? সিংহগুলো কি এখানে প্রখর দিবালোকের মধ্যেই হানা দিতে শুরু করেছে?.... পানীয় জল আনতে আর গরুবাছুর চরাতে মানুষজন নিশ্চয়ই বেড়ার বাইরে যাতায়াত করে— কিন্তু কোন্ পথে? কন্টক-শোভিত ব্যূহের কোথাও তো এতটুকু ফাঁক দেখা যাচ্ছে না।.....

একটা পথের রেখা পাওয়া গেল। আত্তিলিওর মনে হল ঐ পথেই লোক চলাচল করে। সন্দিগ্ধ চিত্তে সেই পথ ধরে বেড়ার দিকে অগ্রসর হলেন আত্তিলিও, আর হঠাৎ তাঁর সামনে প্রায় দশ ফুট জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল এবং বিভক্ত বেড়ার ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করল স্বয়ং টোয়াবেনি!

'জা বাব, ভিতরে এস' টোয়াবেনি বলল, 'তাড়াতাড়ি কর। চারপাশে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে সিংহরা। আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওরা আমাদের লক্ষ্য করছে।'

আত্তিলিও ভিতরে প্রবেশ করলেন। এমন চমৎকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং বিস্ময়কর দ্বারপথের আবিষ্কার করার জন্য টোয়াবেনির বুদ্ধির তারিফ করলেন আত্তিলিও।

প্রশংসা শুনে খুশী হল টোয়াবেনি। এতদিনের মধ্যে সেদিনই শুধু তার কণ্ঠস্বরে বন্ধুত্বের আভাস পাওয়া গেল— 'দেখো, কত সহজে কোনও শব্দ না করে এটা খোলা যায় আর বন্ধ করা যায়।'

আত্তিলিও দেখলেন দুটি দড়ির সাহায্যে টোয়াবেনি তার নিরাপদ আশ্রয়ের ভিতর থেকেই কুটিরের ভিতর অবস্থিত দরজাকে ইচ্ছানুযায়ী খুলতে পারে। প্রতিরোধের এমন কৌশল যার মগজ থেকে উৎপন্ন হয়, সেই মগজের অধিকারী যে অতিশয় বুদ্ধিমান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। টোয়াবেনি জানাল একটু আগেই দরজাটা আর একবার ব্যবহার করার দরকার হয়েছিল। আত্তিলিও ঘটনার বিশদ বিবরণ শুনতে চাইলেন।

'আমার গরুর দল মাঠে ঘাস খাচ্ছিল, হঠাৎ সিংহ তাদের আক্রমণ করল', টোয়াবেনি বলতে লাগল 'আমি ঘরের ভিতর থেকে দড়ি টেনে দরজা খুলে দিতেই আমার ছেলেরা গরুগুলোকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দুটো বাছুর এর মধ্যেই সিংহের আক্রমণে মারা পড়েছিল। সিংহেরা যখন বাছুর দুটির মাংস খেতে ব্যস্ত, সেই সময়টুকুর সুযোগ নিয়েই আমার ছেলেরা ভিতরে ঢুকতে পেরেছিল— আর তারা ভিতরে আসা মাত্রই আমি আমার দড়ি টেনে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঠিক সময় মতোই দরজাটা আমি বন্ধ করেছিলাম। কারণ, খিদের প্রথম ঝোঁক কেটে গেলেই সিংহগুলো ভিতরে আসার চেষ্টা করত। ঐ পাহাড়টার ওপারে আমার ভাই-এর আস্তানায় ছেলেরা এখন চলে গেছে। ভাই-এর ক্রালটাকে ঘিরে এইরকম একটা বেড়া দেওয়া দরকার, —তাকে সাহায্য করার জন্যই রওনা হয়েছে আমার ছেলেরা।'

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল টোয়াবেনি। তার মুখের উপর ফুটে উঠল নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের পরিচিত ভঙ্গি— আর একটি কথাও না বলে সে হঠাৎ পিছন ফিরে অদৃশ্য হল তার নিজস্ব কুটিরের ভিতর।

সঙ্গে সঙ্গে বেড়ার সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত কুটিরের ভিতর থেকে একটা মুখ বাইরে উঁকি দিল।

মৃদাবুলি!

আত্তিলিও দেখলেন জুলু বালিকার মুখে আজ আনন্দের চিহ্ন নেই। বিষণ্ণভাবে সে আত্তিলিওকে তার কুটিরের ভিতর আসতে ইঙ্গিত করল।

আত্তিলিও ভিতরে ঢুকলেন। মৃদাবুলি জানাল তার মা গেছে সপত্নীদের সঙ্গে গল্প করতে অন্য কুটিরে। মায়ের অনুপস্থিতিতে শিষ্টাচারের ত্রুটি হতে দেয়নি মেয়ে— বসবার জন্য অতিথিকে একটা কাঠের আসন এনে দিল মৃদাবুলি।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পর আন্তিলিও জানালেন মৃদাবুলির মুখে বিষাদের মেঘ তাঁর ভালো লাগে না, তিনি তার হাসিমুখ দেখতে চান।

মৃদাবুলির মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। কিন্তু শুধু এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই দু'হাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে উঠল। তারপরই মেঝের উপর শুয়ে পড়ে সে ফোঁপাতে লাগল। কান্নার আবেগে তার দেহটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

আন্তিলিও হয়ে গেলেন হতভম্ব। টোয়াবেনি যদি এই কান্নার শব্দ শোনে তাহলে সে কি মনে করবে?......কথাটা চিন্তা করতেই আন্তিলিওর খারাপ লাগল। তিনি মনে মনে কামনা করলেন এই মুহূর্তে যেন কেউ এসে পড়ে, তাহলে এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি থেকে তিনিও পরিত্রাণ পেতে পারেন। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গেই দ্রুত ধাবমান পদশব্দ তাঁর কানে এল। কিন্তু না —কেউ এল না। খুব সম্ভব, আন্তিলিও ভুল শুনেছেন। একটা মোরগ ক্রুদ্ধস্বরে ডেকে উঠল, গোয়ালের বেষ্টনী থেকে ভেসে এল গোবৎসের করুণ কণ্ঠধ্বনি—তারপর আবার সব চুপচাপ। —কান্নার প্রথম আবেগ সামলে নিল মৃদাবুলি, দু'একবার ফুঁপিয়ে সে আত্মসংবরণ করল। অবশেষে মর্মযাতনার তীব্র উচ্ছ্বাস কেটে গেল, শান্ত সংযত স্বরে কথা বলতে পারল জুলু বালিকা, 'টোয়াবেনি ওকে খুন করবে— কিংবা আমাকে।'

'আমাকে' অর্থাৎ মৃদাবুলিকে খুন করা টোয়াবেনির মতো বাপের পক্ষে খুব অসম্ভব নয়, কিন্তু আন্তিলিওর জিজ্ঞাস্য হল এই 'ও' কে?

ধীরে ধীরে সব কিছুই জানতে পারলেন আন্তিলিও। 'ও' হচ্ছে এক তরুণ জুলুযোদ্ধা, নাম তার ন্‌গো। উক্ত জুলু যুবকের সঙ্গে আন্তিলিও ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। মৃদাবুলি অসঙ্কোচে জানাল সে আর ন্‌গো পরস্পরকে বিবাহ করতে চায়। টোয়াবেনিকে তিরিশটা গরু কন্যাপণ হিসাবে দিতে চেয়েছিল ন্‌গো, কিন্তু টোয়াবেনি তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে রাজি হয়নি।

এতগুলো গরুর বিনিময়েও টোয়াবেনি কন্যাদান করতে রাজি হয়নি শুনে অবাক হয়ে গেলেন আন্তিলিও! ন্‌গোকে তিনি খুব ভালো করেই জানেন, পাত্র হিসাবে সে চমৎকার ছেলে —তবে টোয়াবেনির রাজি না হওয়ার কারণ কি?

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বালিকা জানাল টোয়াবেনি একসময়ে প্রভাবশালী যাদুকর ছিল। টোয়াবেনির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার করে সর্দার জিপোসো এবং 'ইনডানাদের' সভা (জ্ঞানী ব্যাক্তিদের সভা) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যাদুকরের সম্মানিত পদ থেকে খারিজ করে দেয়। এই ঘটনা ঘটেছিল কয়েক বছর আগে। অভিযোগ যে এনেছিল সে হচ্ছে জুলুদের এক ছোটখাট নেতা, ন্‌গো তারই পুত্র। কিছুদিন আগে অভিযোগকারী —অর্থাৎ, ন্‌গোর পিতা —সিংহের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে। শত্রু সিংহের কবলে মারা গেছে বটে কিন্তু টোয়াবেনির বিদ্বেষ আজও জাগ্রত —যার অভিযোগের ফলে টোয়াবেনি পদমার্যাদা হারিয়েছে, তার পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না।

টোয়াবেনির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বক্তব্য কি ছিল, অথবা কোন্ ধরনের ছিল —এই সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বার বার আন্তিলিওকে এক কথা বলতে লাগল, 'বাবা

বলছে ন্‌গোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্মতি দেবার আগে সে মেয়ের আর ন্‌গোর মরা মুখ দেখবে।'

আন্তিলিও জুলুদের নিয়ম-কানুন যেটুকু জানতেন, তা থেকে বুঝলেন এই বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

'জা বাব' মৃদাবুলি বলল, 'আমি তোমার সাহায্য চাই।'

'তা তো বুঝলুম' 'আন্তিলিও মনে মনে বললেন, 'কিন্তু আমি বিদেশী মানুষ, জুলুদের সামাজিক ব্যাপারে হাত দেব কি করে?'

তাঁর মৌনব্রত দেখে মৃদাবুলি নিরস্ত হল না। সে আন্তিলিওকে এই ব্যাপার নিয়ে টোয়াবেনির সঙ্গে কথা কইতে অনুরোধ করল। সে একথাও বলল আন্তিলিও যদি জিপোসোকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলেন, তাহলে হয়তো মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে —সর্বাধিনায়ক জিপোসো যদি চায় তাহলে টোয়াবেনির ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এই বিবাহ হওয়া সম্ভব, জুলুল্যাণ্ডে জিপোসোর কথার উপর কথা বলার ক্ষমতা কারও নেই।

অশ্রুসজল চক্ষে বালিকা বার বার তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল, তার বিশ্বাস —আন্তিলিও যদি হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে তার মৃত্যু নিশ্চিত।

এই মেয়েটিকে তিনি কি উপায়ে সাহায্য করতে পারেন সেই কথাই ভাবছিলেন আন্তিলিও, হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে মৃদাবুলির সমস্ত শরীর হল আড়ষ্ট, মুখ হল রক্তহীন, বিবর্ণ ও বিকৃত!

আন্তিলিও চমকে উঠলেন, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো এক ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে এল, নিশ্চয়ই ওকে অজান্তে বিষ খাওয়ানো হয়েছে?

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মৃদাবুলির পিছনে ছায়া-আচ্ছন্ন কুটিরের যে জায়গায় মধ্যাহ্নের সূর্যালোক প্রবেশ করেছিল, সেই আলোক-উজ্জ্বল স্থানে আবির্ভূত হল দ্রুত ধাবমান এক ছায়া!

আন্তিলিও বুঝলেন বিষ-টিষ কিছু নয়; অতিজাগ্রত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রখর অনুভূতি দিয়ে আসন্ন বিপদের আভাস পেয়েছে বনবালা মৃদাবুলি —তাই এই ভাবান্তর।

বালিকার পিছনে, প্রায় ছ'ফিট দূরে কুটিরের প্রবেশ-পথে নড়ে উঠেছে সর্পিল ছায়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিপদ

সাপের মতো লম্বা দোদুল্যমান ছায়াটা যে একটি আন্দোলিত লাঙ্গুলের ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা সহজেই বুঝলেন আন্তিলিও, সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার পিছনে অবস্থিত নিরেট কায়ার স্বরূপ নির্ণয় করতেও তার ভুল হল না— সমগ্র আফ্রিকাতে ঐভাবে চাবুকের মতো লেজ আছড়াতে পারে একটিমাত্র জীব —সিংহ!

ভয়াবহ পরিস্থিতি। দরজার ওপাশে অপেক্ষা করছে ক্ষুধিত শ্বাপদ! যে কোন মুহূর্তেই সে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে!

সতৃষ্ণ নয়নে রাইফেলটার দিকে তাকালেন আন্তিলিও। ছায়া দেখে বোঝা যায় সিংহ ওত পেতে বসে আছে দরজার বাইরে বাঁদিকে। ডানদিক দিয়ে ঘুরে রাইফেল তুলতে গেলে অস্ত্র তুলে নেবার আগেই সিংহ তাকে দেখতে পাবে এবং তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাঁদিক দিয়ে ঘুরে দেয়ালে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রাইফেলের নল ধরে সেটাকে টেনে আনা যায় বটে, কিন্তু ঐ ভাবে অস্ত্রটাকে বাগাতে হলে সিংহের খুব কাছাকাছি যেতে হয়।

আন্তিলিও শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করতে চাইলেন। তিনি বসে ছিলেন, এইবার উঠে দাঁড়ালেন; আস্তে-আস্তে, নিঃশব্দে।

দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন আন্তিলিও। কাঁটাগাছ ঘেরা অত উঁচু বেড়াটাকে যে জানোয়ার লাফ মেরে ডিঙ্গিয়ে আসতে পেরেছে, সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও বৃহৎ দেহের অধিকারী। দারুণ ক্ষুধার্ত না হলে সিংহ এরকম দুঃসাহসের পরিচয় দেয় না —আন্তিলিও বুঝলেন সিংহকে হত্যা করতে না পারলে আজ মৃত্যু তাঁর নিশ্চিত।

কিন্তু ঘরের মেঝেতে বিছানো মাদুরটাই গোলমাল বাধাল। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে কট কট শব্দে প্রতিবাদ জানাতে লাগল মাদুর! আন্তিলিও মনে মনে মাদুরটাকে অভিশাপ দিলেন। কুটিরের ভিতর বদ্ধ স্থানে ঐ কট কট শব্দটা তাঁর কানে পিস্তলের আওয়াজের মতো আঘাত করছিল, অপেক্ষমান শ্বাপদ যে ঐ আওয়াজ থেকেই শত্রুর গতিবিধি বুঝতে পারছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য উপায় না থাকায় আন্তিলিও ঐভাবেই এগিয়ে চললেন। তিনি জানতেন, উজ্জ্বল দিবালোকের ভিতর দাঁড়িয়ে কুটিরের ম্লান অন্ধকারে জন্তুটা ভাল দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু একটু পরে অন্ধকারটা সহ্য হয়ে গেলেই সে ভিতরে ঢুকে পড়বে। ইতিমধ্যে যদি তিনি কিছু না করতে পারেন, তবে সিংহের কবলে তাঁর এবং মৃদাবুলির অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হতে পারে সে কথা চিন্তা করে শিউরে উঠলেন আন্তিলিও।

মৃদাবুলির সমস্ত শরীর তখন আড়ষ্ট। চোখে না দেখেও সে বুঝতে পেরেছে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রস্তুতি চলেছে তার পিছনে। বালিকার ভীতিবিহ্বল দুই চক্ষু লক্ষ্য করছে আন্তিলিওর গতিবিধি এবং তার জিহ্বা হয়ে গেছে মৌন, নির্বাক। খুব ধীরে ধীরে তাকে পেরিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালেন আন্তিলিও সাহেব।

প্রবেশ পথের মুখেই দাঁড়িয়ে আছে সিংহ। তার দেহটা আঁন্তিলিওর চোখের আড়ালে, অদৃশ্য, দৃষ্টিগোচর হচ্ছে শুধু তার ছায়া আর কর্ণগোচর হচ্ছে দেওয়ালের ওধার থেকে ভেসে আসা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর জান্তব শব্দ।

চট করে থাবা চালিয়ে দিলেই এখন সিংহ আন্তিলিওকে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু রাইফেলটা এসে গেছে তাঁর হাতের নাগালের মধ্যে— যা করতে হয় এখনই করতে হবে, সময় নেই— আন্তিলিও হাত বাড়ালেন।

তাঁর ঘর্মাক্ত হাতের মুঠি রাইফেলের ঠাণ্ডা নলটাকে স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল

শ্বাপদ কণ্ঠের গর্জনধ্বনি। রাইফেল উঠে এল হাতে। একটা সোনালী বাদামী দেহ চমকে উঠল বিদ্যুৎ ঝলকের মতো—

প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন আন্তিলিও! পশুরাজ ভারসাম্য রাখতে পারল না, সংঘাতের ফলে সেও মাটির উপর গড়িয়ে পড়ল।

সিংহ আবার উঠে আক্রমণ করার আগেই আন্তিলিও গড়াতে গড়াতে খোলা দরজা দিয়ে কুটিরের বাইরে চলে গেলেন। আকস্মিক বিপদে আন্তিলিওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি, গড়গড়ি দেবার সময়ে চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছিলেন তিনি— অন্ধকার কুটির থেকে বাইরে তীব্র সূর্যালোকের মধ্যে এসে তাঁর চক্ষু যে সাময়িক দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে সেই ভয়াবহ তথ্য চরম মুহূর্তেও তিনি ভুলে যাননি, হাতের রাইফেলটাও তিনি হস্তচ্যুত হতে দেননি— অস্ত্রটাকে তিনি ধরে রেখেছিলেন শক্ত মুঠিতে।

আন্তিলিও যে-মুহূর্তে রোদের দিকে পিছন ফিরে রাইফেল তুলে কুটিরের ভিতর দৃষ্টিপাত করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই সিংহও ধরাশয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ল এবং চূড়ান্ত ফয়সালা করার জন্য তাঁকে লক্ষ্য করে লাফ দিতে উদ্যত হল— হাঁটু পেতে বসে রাইফেল উঁচিয়ে বললেন আন্তিলিও, 'শুয়ে পড়ো মৃদাবুলি।'

বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়ল মৃদাবুলি। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড সিংহনাদ। রাইফেলের কর্কশ ধমক। বারুদের উগ্র গন্ধের সঙ্গে মিশল শ্বাপদ-দেহের দুর্গন্ধ— এবং রক্তের গন্ধ!

আবার জাগল শ্বাপদ কণ্ঠের ভৈরব হুঙ্কার! রক্তাক্ত শরীরে গর্জে উঠল আহত সিংহ, মাথার উপর দুলে দুলে উঠল ঝাঁকড়া কেশর; তার জলন্ত দৃষ্টি একবার পড়ছে ধরাশায়ী মৃদাবুলির দিকে, আবার ঘুরে যাচ্ছে কুটিরের বাইরে উপবিষ্ট অস্ত্রধারী মানুষটার দিকে— সে এখনও ঠিক করতে পারছে না কার উপর প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। সিংহ মনস্থির করার আগেই আন্তিলিওর রাইফেল আবার অগ্নিবর্ষণ করল। লক্ষ্য ব্যর্থ হল না, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল সিংহের মাথার খুলি— সব শেষ! পশুরাজ আর কোনদিন নরমাংস খেতে চাইবে না।

....কিন্তু মৃদাবুলি? সে কথা কইছে না কেন? বালিকার দেহের উপর ঝুঁকে পড়লেন আন্তিলিও। সিংহ তার দেহস্পর্শ করতে পারেনি। সে অজ্ঞানও হয়নি, —দারুণ আতঙ্ক সাময়িকভাবে তার বাক্‌শক্তি ও চলৎশক্তিকে লুপ্ত করে দিয়েছে, কিন্তু তার চেতনা সম্পূর্ণ জাগ্রত— দুই চোখের নীরব ভাষায় বালিকা আন্তিলিওকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল।

আর তারপর যেন শুরু হল নরক-গুলজার। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসতে লাগল বহু মানুষের পায়ের আওয়াজ। ভয়ার্ত গরু বাছুরের হাম্বাধ্বনি। টোয়াবেনি এসে উপস্থিত হল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। সেই সঙ্গে সেখানে এসে ভিড় করল বহু নারী ও বালক-বালিকা। পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করতে করতে তারা এগিয়ে এসে কুটিরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল, সিংহের মৃতদেহ নজরে আসা মাত্র আবার পিছিয়ে গেল সভয়ে।

আন্তিলিও কুটিরের বাইরে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যেই তিনি রাইফেলে

আবার গুলি ভরে নিয়েছেন এবং তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মৃদাবুলির বাপ টোয়াবেনি। টোয়াবেনির জ্বলন্ত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে আন্তিলিওর মনে হল— চোখ নয়, একজোড়া ধারালো ছুরির ফলা ঝকঝক করছে হত্যার আগ্রহে। তিক্ত কণ্ঠে আন্তিলিও প্রশ্ন করলেন, 'সিংহ ভিতরে এল কি করে?'

অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গিতে উত্তর এল, 'জানি না। আমি কুটিরের ভিতর ছিলাম। সিংহ কি করে এসেছে বলতে পারব না।'

টোয়াবেনি একটু থামল, তার পাতলা নাকের উপর ফুটে উঠল কুঞ্চন রেখার চিহ্ন, বলল, 'গন্ধ পাচ্ছি, আমি ভয়ের গন্ধ পাচ্ছি।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : রহস্যময় ঢাক ও নিগ্রোদের অজ্ঞতা

'ভয়', টোয়াবেনি আবার বলল, 'আমি ভয়ের গন্ধ পাচ্ছি।'

খুব অদ্ভুত কথা সন্দেহ নেই। ভয়ের আবার গন্ধ কি? কিন্তু শুধু যে কথাটাই অদ্ভুত তা নয়, টোয়াবেনির বলার ভঙ্গিও ছিল অদ্ভুত আর রহস্যময়।

আন্তিলিও বেড়ার গায়ে লাগানো দরজার দিকে চাইলেন। দরজাটা ঠিক মৃদাবুলির কুঁড়েঘরের দিকে— সব ঠিক আগের মতোই আছে? ...না! সব ঠিক নেই। আন্তিলিও সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছে তাঁর জুতোপরা পায়ের ছাপগুলো ধুলোর উপর থেকে অদৃশ্য। খুব তাড়াতাড়ি কেউ ঐ ছাপগুলো মুছে ফেলেছে!

কে? কেন? কোন্ উদ্দেশ্যে?

নীচু হয়ে ভাল করে জমি দেখতে লাগলেন আন্তিলিও— তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা পায়ের ছাপ উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সেই সবুট পদচিহ্নকে প্রায় লুপ্ত করে তার উপর আত্মপ্রকাশ করেছে আর একটি গুরুভার জীবের সুগভীর পদচিহ্ন— সিংহের পায়ের দাগ!

ব্যাপারটা এইবার আন্তিলিওর বোধগম্য হয়েছে। কোনও এক ব্যক্তি টোয়াবেনির আস্তানায় তাঁর উপস্থিতির সব চিহ্ন মুছে ফেলতে চেয়েছিল বলেই জুতোর ছাপগুলো হয়েছে অদৃশ্য, উক্ত ব্যক্তির পরিচয় আর উদ্দেশ্যও এখন তাঁর কাছে গোপন নেই!

সিংহের মুখে যদি তাঁর দেহটা টোয়াবেনির ক্রাল ছেড়ে অদৃশ্য হত, তবে কারও পক্ষে সঠিক ঘটনাটা অনুমান করা সম্ভব ছিল না; কারণ, আন্তিলিও যে অকুস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন সে কথা জানত শুধু টোয়াবেনি। হ্যাঁ, মৃদাবুলিও জানত আন্তিলিওর উপস্থিতি— কিন্তু নরখাদক সিংহ তার নিকটস্থ দুটি মানুষকে জীবিত রাখত কি? অতএব দেখা যাচ্ছে জুতো পরা পায়ের ছাপগুলো যদি মুছে ফেলা যায়, তাহলে সিংহের কবলগ্রস্ত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের উপস্থিতির আর প্রমাণ থাকে না তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, বনের জানোয়ার মানুষের ইচ্ছা পূরণ করবে কেন? তা করবে না,

কিন্তু বন্ধ দরজা যদি হঠাৎ খুলে গিয়ে খাদ্যসংগ্রহের পথ উন্মুক্ত করে দেয়, তবে সবচেয়ে কাছাকাছি জ্যান্ত খাবারের দিকেই এগিয়ে আসবে মাংসলোলুপ শ্বাপদ এবং মৃদাবুলির যে কুঁড়ে ঘরটাতে আন্তিলিও ঢুকেছিলেন সেটা যে দরজার সবচেয়ে নিকটবর্তী কুটির সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সমস্ত পরিকল্পনাটি নিখুঁত। গোলমাল শুনে অন্যান্য কুটির থেকে বেরিয়ে এসে জুলুরা কেউ আন্তিলিওর জুতোর ছাপ দেখতে পেত না। আন্তিলিও যদি সিংহের মুখে উধাও হতেন, তবে তো কথাই নেই— কিন্তু যদি তাঁকে ফেলে মৃদাবুলিকে তুলে নিত তাহলেও নিকটেই অবস্থিত আন্তিলিওকে নিশ্চয়ই সে জ্যান্ত রাখত না, এবং নখে দন্তে ছিন্নভিন্ন অভিযাত্রীর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে টোয়াবেনি যখন শপথ করে বলত তার অজ্ঞাতসারে সাদা মানুষটি মৃদাবুলির কুটিরে প্রবেশ করেছে, তখন তার কথাই অভ্রান্ত সত্য বলে গৃহীত হত— এমন কি সর্বাধিনায়ক জিপোসোর মতো বুদ্ধিমান মানুষও আন্তিলিওর মৃত্যুর জন্য নরখাদক সিংহকেই দায়ী করত— কাঁটার বেড়াতে ঘেরা আস্তানার মধ্যে সিংহের অনুপ্রবেশ কি করে ঘটল তাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না।

'আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল,' আন্তিলিওর ব্যঙ্গোক্তি শোনা গেল, 'তবে ঐ দরজাটা চমৎকার। খুবই কার্যকরী দরজা। এবার ওটা দয়া করে খুলে দাও, আমি বাইরে যাব।'

আন্তিলিও ভেবেছিলেন টোয়াবেনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, চিৎকার করে অভিশাপ দেবে, হাতের বর্শা তুলে মারতে আসবে— কিন্তু নাঃ। সেরকম কিছুই সে করল না। এক গাল হেসে দড়ি ধরে টান মারল টোয়াবেনি, দরজা খুলে গেল— আর দরজা খোলার সময়ে তার একটা পা এসে পড়ল অবশিষ্ট একমাত্র জুতোর ছাপটার উপর।

'ঐ ছাপটাকে অবহেলা করা ঠিক হয়নি,' আন্তিলিও বললেন, 'কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে, ওটা আমি দেখে ফেলেছি।'

এখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আন্তিলিও— তিনি আর মৃদাবুলি যখন কথা বলছিলেন তখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি মেয়ের কথা শুনেছে টোয়াবেনি, তারপর ফিরে গিয়ে নিজস্ব কুটিরের নিরাপদ স্থান থেকে দড়ি টেনে দরজা খুলে দিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছে ক্ষুধার্ত সিংহের জন্য— সে জানত চারদিকে ওত পেতে বসে আছে দলে দলে নরখাদক শ্বাপদ, দরজা খোলা থাকলে এক বা একাধিক সিংহের আর্বিভাব ঘটবেই ঘটবে। টোয়াবেনি যা ভেবেছিল তাই হল। খোলা দরজা দিয়ে একসময়ে প্রবেশ করেছে পূর্বোক্ত সিংহ; শয়তান যাদুকরও সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করতে একটুও দেরি করেনি! তারপর সে অবাধ্য কন্যা ও পরচর্চায় নিযুক্ত সাদা মানুষটার অপঘাত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেছে সাগ্রহে! সিংহ তার শিকার নিয়ে মৃদাবুলির কুটির থেকে বেরিয়ে এলেই সে আবার দড়ি টেনে শ্বাপদের পলায়নের পথ মুক্ত করে দিত— কিন্তু এমন চমৎকার পরিকল্পনাটা নষ্ট হয়ে গেল রাইফেলের অগ্নিবর্ষী মহিমায়। গুলির আওয়াজ শুনেই বেরিয়ে এসেছে টোয়াবেনি— সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝেছে সর্বনাশ হয়েছে, সব কিছু ভেস্তে দিয়েছে সাদা মানুষের রাইফেল.....

উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁবুর দিকে পা চালালেন আন্তিলিও। পথের মধ্যে আর কোনও সিংহের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। অন্যদিনের মতো সিংহ শিকারের চেষ্টা করলেন না তিনি। সিংহের আকস্মিক আক্রমণ তাঁকে ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছিল— অন্ততঃ সেদিনটা তিনি ঐ ভয়ঙ্কর জীবের মারাত্মক সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন। নরখাদকের চাইতে নরঘাতকের দুরভিসন্ধির কথা ভেবেই তিনি বেশি উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন,— তিনি বুঝেছিলেন মৃদাবুলি আর ন্‌গো এখন মোটেই নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে শয়তানের চক্রান্তে তাদের প্রাণহানি ঘটতে পারে। আন্তিলিও যে তার শয়তানি ধরে ফেলেছিলেন, সিংহের আবির্ভাবের রহস্য যে তাঁর কাছে গোপনীয় নেই, সে কথা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে টোয়াবেনি— অতএব আন্তিলিওর উপরেও সে হামলা চালাতে পারে যখন তখন এবং সেই ভয়াবহ সম্ভবনার কথা যে কম্যাণ্ডার সাহেবের মনে উঁকি দেয়নি তা নয়।

'কাল সকালে উঠে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে জিপোসোর সঙ্গে দেখা করা'— আন্তিলিও মনে মনে বললেন। তিনি জানতেন সর্বাধিনায়ক তাঁর কথা বিশ্বাস করবে।

তাঁবুতে ঢুকতেই জামানি তাঁকে জানাল পরিস্থিতি খুব খারাপ। সারাদিন ধরে টমটম (ঢাক) বেজেছে। ঐ শব্দের সূত্র ধরে জানা গেছে যে, দলবদ্ধ সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে জুলুদের দুটি আস্তানা। বিল আর প্রফেসর বিশ্রাম নিতে তাঁবুতেও এসেছিলেন, সিংহ-ঘটিত দুঃসংবাদ কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তাঁরা ওষুধপত্র আর রাইফেল নিয়ে অকুস্থলের দিকে ছুটে গেছেন। তবে আরও খারাপ খবর আছে— জুলুল্যাণ্ডের পশ্চিম অংশে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

'বিদ্রোহ! কার বিরুদ্ধে?' চমকে প্রশ্ন করলেন আন্তিলিও।

'জাতির মাতব্বর আর যাদুকরদের বিরুদ্ধে', জামানি বলল, 'ওরা সিম্বাদের (সিংহদের) থামাতে পারছে না বা থামাচ্ছে না। একজন জুলু-সর্দারকে তীর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে। জিপোসোর হয়ে খাজনা আদায় করতে গিয়েছিল ঐ সর্দার। তার অনুচরকে তীর মেরে খুন করা হয়েছে শুনে জিপোসো ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছে, সে চলে গেছে হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে— সঙ্গে গেছে জুলুল্যাণ্ডের সেরা দু'শ যোদ্ধা।'

'বাঃ। চমৎকার', আন্তিলিও ভাবলেন, 'জিপোসোর কাছ থেকে এখন আর কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।'

'আর সুকামবানা'— জামানি আবার বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়ে সে রান্নাঘরের দিকে ছুটে চলে গেল।

সুকামবানা নামক লোকটিকে চিনতেন আন্তিলিও। সে ছিল জুলু-শিকারীদের যাদুকর, অত্যন্ত বেয়াড়া ধরনের লোক— টোয়াবেনির স্বল্প সংখ্যক বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। ধাঁ করে আন্তিলিওর মাথার ভিতর একটা ভয়াবহ সম্ভবনা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল— সুকামবনা আর টোয়াবেনির অশুভ যোগাযোগ কোনও ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের সূচনা করছে না তো?.......

নৈশভোজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আন্তিলিও তাঁর তাঁবুতে জামানিকে ডেকে পাঠালেন। জামানি সহজ ভাবেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল, কারণ, প্রত্যেক রাতেই পরের দিনের কর্মসূচী সে আন্তিলিওর কাছে জানতে পারত। কিন্তু সে সব কথা না তুলে মাসাংগা যখন

তাকে সুকামবানার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে ঘাবড়ে গেল। মুখ ফসকে দু'একটা কথা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য জামানি তখন মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে, কিন্তু এখন আর আন্তিলিও তাকে ছাড়তে রাজি ন'ন— জেরার মুখে সে আরও কয়েকটা গোপনীয় কথা ফাঁস করে ফেলল। শেষকালে আন্তিলিও যখন শপথ করে বললেন সর্বাধিনায়ক জিপোসোকে তিনি কিছু বলবেন না, তখনই সব কিছু খুলে বলতে রাজি হল জামানি।

জামানির বক্তব্য সংক্ষেপে পরিবেশিত হলে যা হয় তা হচ্ছে এই—

বর্ষার দেবতা 'আনজিয়ানা' জুলুদের পূজা প্রার্থনা আর কাকুতি-মিনতি শুনেও অবিচলিত; বৃষ্টির নাম নেই, খরদাহে জ্বলছে জুলুদের দেশ, সিংহরা সংখ্যায় বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে তাদের সাহস আর ঔদ্ধত্য— জন্তুগুলো এখন আর মানুষকে ভয় করে না। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য জুলুল্যাণ্ডের মানুষ অতীন্দ্রিয় জগৎকে অর্থাৎ প্রেতাত্মাদের দায়ী করছে। আন্তিলিওর কাছে টোয়াবেনি বলেছিল তার ছেলেরা নাকি টোয়াবেনির এক ভাই-এর ক্রালে গেছে একটা বেড়া বাঁধার কাজে সাহায্য করতে— কথাটা আদপেই সত্যি নয়। একদল ক্ষিপ্ত জুলুকে সংঘবদ্ধ করার জন্য টোয়াবেনির ছেলেরা যেখানে গিয়েছিল সেটি হচ্ছে আর এক শয়তানের আস্তানা— সুকামবানার ক্রাল!

জামানির বক্তব্য থেকে আরও একটি তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন আন্তিলিও— সুকামবানার সঙ্গে নাকি জরুরী পরামর্শ করেছেন 'আনজিয়ানা' স্বয়ং! এই অতি মূল্যবান সংবাদটি অবশ্য সুকামবানা নিজেই জুলুদের জানিয়েছে, জামানিও বাদ যায়নি।

এই পর্যন্ত বলেই জামানি হঠাৎ কাঁপতে শুরু করল, তার কথাগুলো মুখের ভিতর আটকে যেতে লাগল বার বার; ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় ফিস ফিস করে ভয়ার্ত জামানি যা বলল তা থেকে আন্তিলিও বুঝলেন সুকামবানা নাকি সবাইকে বলেছে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী হচ্ছে এক জুলুযোদ্ধা! সুকামবানার মতে উক্ত জুলুযোদ্ধার চোখদুটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে অমঙ্গলের অভিশাপ, এবং এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে উদ্ধারলাভ করতে হলে অবিলম্বে অভিশপ্ত চক্ষুবিশিষ্ট ঐ মানুষটিকে শাস্তি দেওয়া দরকার— কিন্তু অনেক মানুষের ভিড়ের ভিতর থেকে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে হলে 'গন্ধ বিচারের' সভায় যে মানুষটি ঐভাবে বিচার করতে সক্ষম, সেই অদ্বিতীয় যাদুকরকে তার অধিকৃত পদ থেকে খারিজ করে তার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে ঈর্ষাকাতর জ্ঞানী ব্যাক্তিদের সভা এবং সর্দার জিপোসো। বর্ষার দেবতা আনজিয়ানা এই অবিচারে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, অনাবৃষ্টির জন্য জিপোসোর অবিচারও কিছুটা দায়ী বলে মতপ্রকাশ করেছে সুকামবানা।

জিপোসো এবং জ্ঞানী ব্যাক্তিদের বিচারে টোয়াবেনিকে যে দোষী সাব্যস্ত করে যাদুকরের সম্মানিত পদ থেকে বিচ্যুত করা হয় তা শুনেছিলেন আন্তিলিও— অতএব তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন সুকামবানার উল্লিখিত যাদুকরটি টোয়াবেনি ছাড়া আর কেউ নয়।

জামানির কাছ থেকে আরও একটি সংবাদ জানতে পারলেন আন্তিলিও। সংবাদটি হচ্ছে এই—

জিপোসো বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করার আগে সুকামবানা গন্ধের সাহায্যে বিচার করার

অনুমতি চেয়েছিল। জিপোসো অনুমতি দেয় না। সে জানত 'গন্ধ বিচার' অনিবার্যভাবেই নরহত্যা ঘটাবে, এমন কি গণহত্যার মতো বীভৎস কাণ্ড ঘটাও অসম্ভব নয়।

কিন্তু জিপোসো এখন অনুপস্থিত, সুকামবানা আর টোয়াবেনিকে বাধা দেবে কে? আন্তিলিও বললেন, 'তাহলে নিশ্চয়ই কাল ওরা গন্ধ বিচারের সভা ডাকছে।'

'না, না, কাল নয়' জামানি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কাল নয় মাসাংগা, কাল কিছু হবে না।'

'তবে? কবে হবে ঐ বিদঘুটে কাণ্ড?'

জবাব নেই। জামানি আবার বোবা। মাসাংগার অনেক অনুরোধ-উপরোধেও তার মৌনভঙ্গ হল না।

পরের দিন কোথাও গেলেন না আন্তিলিও, তাঁবুতেই বসে থাকলেন। ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। আন্তিলিও ঢাকের ভাষা জানেন না, কিন্তু ঘন ঘন দ্রুততালে সেই ধ্বনিতরঙ্গের প্রবল উত্তেজনা তিনি অনুভব করতে পারলেন। ঢাক কি বলছে জানার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু জানবেন কি করে? তাঁবুর নিগ্রোরা হঠাৎ ঢাকের ভাষা ভুলে গেছে! আন্তিলিওর বিশ্বস্ত অনুচর জামানিও ব্যতিক্রম নয়। বার বার প্রশ্ন করে একই উত্তর পেলেন আন্তিলিও— ঢাকের ভাষা তারা নাকি কিছুই বুঝতে পারছে না! এক রাতের মধ্যে আয়ত্ত-বিদ্যার এমন হঠাৎ-বিলুপ্তি এবং স্মরণশক্তির এমন আকস্মিক বিপর্যয় দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আন্তিলিও!....

অষ্টম পরিচ্ছেদ : গন্ধের বিচার

রাত এল। যথা নিয়মে আবার এল প্রভাত। আজ আর ঢাক বাজছে না। আগের দিনের অবিরাম ধ্বনিতরঙ্গের পরে এই অস্বাভাবিক স্তব্ধতা যেন ভয়ংকর এক ঘটনার পূর্বাভাস।

আন্তিলিও উঠে দাঁড়ালেন, জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হলেন, তারপর পদার্পণ করলেন তাঁবুর বাইরে। জামানিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'আমি টোয়াবেনির কাছে যাচ্ছি। তুমিও সঙ্গে চল। আন্তিলিও যা ভেবেছিলেন তাই হল— জামানি তাঁর আদেশ অমান্য করে দাঁড়িয়ে রইল এবং বার বার তাঁকে তাঁবু ছেড়ে বাইরে যেতে নিষেধ করল। সে একথাও বলল তার নিষেধ অগ্রাহ্য করা মাসাংগার উচিত নয়।

আন্তিলিও শুনলেন না। তিনি জানতেন জামানি তাঁকে ভালবাসে, তাঁর বিপদ হতে পারে বলেই সে তাঁকে কোথাও যেতে বারণ করছে। কিন্তু আন্তিলিওর কানে তখনও বাজছে জুলু বালিকার কাতর প্রার্থনা— 'জা বাব, আমি সাহায্য চাই।'

আন্তিলিও অনুমান করেছিলেন ম্দাবুলি আর ন্গোর সর্বনাশ করার জন্য এক চক্রান্তের জাল বুনছে দুই শয়তান— টোয়াবেনি ও সুকামবানা। চক্রান্তকারীদের কি করে বাধা দেবেন সে কথা আন্তিলিও নিজেও ভাবতে পারেননি, বিশেষতঃ ষড়যন্ত্রের চেহারাটা তখন পর্যন্ত

তাঁর কাছে অস্পষ্ট— কিন্তু যে ভয়াবহ বিপদের ফলে দুটি নিরপরাধ মানুষের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে, তাতে যথাসাধ্য বাধা দেওয়া উচিত মনে করেই তিনি টোয়াবেনির আস্তানা লক্ষ্য করে যাত্রা করেছিলেন। সঙ্গে ছিল নিত্যসঙ্গী রাইফেল আর ক্যামেরা। পথে যেতে একটা সিংহের দেখা পেয়েছিলেন তিনি। ক্যামেরার সাহায্যে পশুরাজের আলোকচিত্র গ্রহণ করতেও তাঁর ভুল হয়নি। সিংহটা তাঁকে আক্রমণের চেষ্টা না করে বিলক্ষণ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল। সেদিন সকালে গুলির আওয়াজে জুলুদের কাছে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে রাজি ছিলেন না আন্তিলিও।

প্রায় এক ঘণ্টা হেঁটে তিনি টোয়াবেনির ক্রালের নিকটে অবস্থিত পাহাড়ের উপর এসে পৌঁছালেন। সেখান থেকে চারদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করে তিনি দেখলেন তাঁর উল্টোদিকে যে পাহাড়টার উপর এই সময়ে টোয়াবেনির গরুগুলো ঘাস খেয়ে বেড়ায়, সেখানে তারা নেই— গরুগুলোকে ক্রালের ভিতর তাদের নির্দিষ্ট আবেষ্টনীর মধ্যে আজ বন্দী করে রাখা হয়েছে। আস্তানার দরজাটা খোলা এবং সেই উন্মুক্ত প্রবেশপথের মুখে ভিড় করেছে জুলু-রমণীর দল। দ্বারের বাইরে ছোট ছোট কয়েকটা দলে বিভক্ত হয়ে উত্তেজিত স্বরে কথা কইছে প্রায় শখানেক পুরুষ। বিস্তীর্ণ মাঠের এখানে ওখানে কালো-কালো ছাপ দেখে আন্তিলিও বুঝলেন, যে সব ঝোপঝাড় বা শুষ্ক নালার মধ্যে সিংহের লুকিয়ে থাকার সম্ভবনা ছিল, সেই জায়গাগুলো জুলুরা আগুনে পুড়িয়ে সাফ করে ফেলেছে!

দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন আন্তিলিও। এই মুহূর্তে পিছন ফিরে তিনি যদি যাত্রা করেন তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। যেখানে আছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বিপদের ভয় নেই। কিন্তু অত দূর থেকে কিছু দেখা বা শোনার আশা তাহলে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। সামনে এগিয়ে গেলে অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তবে এটুকু বিপদের ঝুঁকি নিলে হয়তো তিনি এমন দৃশ্য দেখতে পাবেন যা ইতিপূর্বে ইউরোপ বা আমেরিকাবাসী কোন শ্বেতাঙ্গের দৃষ্টিগোচর হয়নি। হয়তো এসব দুর্লভ দৃশ্যের আলোকচিত্র গ্রহণ করার সুযোগও পেতে পারেন তিনি, এবং—

এবং বরাত ভাল থাকলে রক্তারক্তির ভয়াবহ সম্ভাবনাকেও হয়তো রোধ করতে পারবেন।

মুহূর্তের আবেগে পরিচালিত হলেন আন্তিলিও, হাতের রাইফেল মাটিতে নামিয়ে তিনি পাহাড় ভেঙ্গে নীচের দিকে নামতে লাগলেন। আন্তিলিও ভেবেছিলেন নিরস্ত্র অবস্থায় গেলে জুলুরা নিশ্চয়ই তাঁর মনোভাব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবে না। তাছাড়া রাইফেল এখন কোন্ কাজে লাগবে? অবস্থা যদি ঘোরালো হয়, তবে শ'খানেক বর্শার বিরুদ্ধে একটা রাইফেল নিয়ে তিনি কি করতে পারেন?

পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে নামতে তিনি যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছেন সেই সময়ে হঠাৎ জনতার ভিতর থেকে একটি উত্তেজিত তীব্র স্বর সকলকে সাবধান করে দিল।

একশ' লোকের জনতা এক মুহূর্তে চুপ, সকলের দৃষ্টি পড়েছে আন্তিলিওর দিকে!

পাহাড়ের মাঝামাঝি নেমে এলেন আন্তিলিও। জনতা কথা কইল না, নিঃশব্দে তাঁকে

লক্ষ্য করতে লাগল। নীচু জায়গাটা পার হয়ে পরবর্তী উচ্চভূমির উপর পা রাখলেন আস্তিলিও, সঙ্গে সঙ্গে মুখর হয়ে উঠল মৌন জনতা! সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে চায়।

উঁচু জমি পার হয়ে এসে দাঁড়ালেন জুলুদের মাঝখানে— তৎক্ষণাৎ চিৎকার, গোলমাল, হৈ হৈ, ধুন্ধুমার কাণ্ড!

আস্তিলিও জুলুদের কাছে বিনীত ভদ্র ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত, কিন্তু জনতার মধ্যে কেউ তাঁকে ভদ্রতাসূচক অভিবাদন জানিয়ে অভ্যর্থনা করল না। ভদ্রতা, শিষ্টতা প্রভৃতি সৌজন্যবোধ সেদিন জুলুদের ভিতর থেকে অন্তর্ধান করেছে— সাদা মানুষের অনধিকার চর্চায় তারা বিরক্ত, কয়েকজন আবার বিরূপ মনোভাব গোপন করতেও চাইল না। আস্তিলিও দেখেও দেখলেন না, বুঝেও বুঝলেন না, সোল্লাসে হাত নেড়ে তিনি জুলুদের অভিবাদন জানালেন, 'সালাগাতলে!'

একজন উত্তর দিল। সেই একজন অবশ্য খুব সাধারণ মানুষ নয়; যে-লোকটি আস্তিলিওর অভিবাদনে সাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে জুলুদের মধ্যে এক প্রাচীন ইনডানা (জ্ঞানী ব্যক্তি)। সাহস ও বীরত্বের জন্য সে যৌবনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং জুলুদের সামাজিক ব্যাপারে তার মতামতের মূল্য ছিল খুব বেশী।

ঐ বিশিষ্ট লোকটির সঙ্গে আস্তিলিও সাহেবের যে বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে কোনও তরফ থেকেই কৃত্রিমতার স্থান ছিল না।

স্খলিত চরণে এগিয়ে এসে পূর্বোক্ত ইনডানা আস্তিলিওর হাতে হাত দিয়ে করমর্দন করল।

আস্তিলিও বললেন, 'ওদের জানিয়ে দাও আমি এখানে দর্শক হিসাবে এসেছি। যা দেখব, যা শুনব, সেকথা আমি শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের কাছে বলব না।'

ভীষণ চ্যাঁচামেচি গোলমাল হচ্ছিল। হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলল ইনডানা। কয়েক মিনিট ধরে নির্বাক জুলুজনতাকে উদ্দেশ্য করে সে কথা বলল। প্রথমেই সে জনতাকে জানিয়ে দিল সাদা মানুষের সঙ্গে 'ম্যাজিকের বাক্স' (ক্যামেরা) ছাড়া কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই, অতএব তার উদ্দেশ্য খারাপ নয়। তারপর অভিযাত্রীদের সততা ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের প্রমাণ হিসাবে সাদা মানুষদের বিভিন্ন কীর্তি-কলাপের কথা বলতে আরম্ভ করল— সিংহের আক্রমণে আহত জুলুদের চিকিৎসা করে অভিযাত্রীরা যে অনেককে বাঁচিয়ে তুলেছেন সেই সব কথা সে উল্লেখ করল, সিংহ শিকারের কথা, দাঁতের ব্যথা উপশম করে জুলুদের আরাম দেওয়ার ইতিহাস প্রভৃতি সব ঘটনার কথাই সে বলেছিল এবং পরিশেষে সাদা মানুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান উপহারগুলোর কথাও সে জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলল না।

ইনডানার কথা শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলল সুকামবানা। ঝড়ের বেগে সে অনেক কথাই বলে গেল। উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত সেই দ্রুত বাক্যঝটিকার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হচ্ছে—

'চুলোয় যাক সাদা মানুষরা!'

জনতা এইবার একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। জনতার এক অংশ জানাল আস্তিলিওর উপস্থিতি তাদের কাছে আপত্তিকর নয়, অপর অংশ বিদেশীকে ঘটনাস্থলে থাকতে দিতে

অসম্মত। আস্তিলিও কোন দিকে নজর দিলেন না, নির্লিপ্তভাবে তিনি 'ম্যাজিকের বাক্স' হাতে ফটো তুলতে শুরু করলেন।

সুখের বিষয় অকুস্থলে টোয়াবেনি উপস্থিত ছিল না। সে থাকলে হাওয়া বদলে যেত। আস্তিলিও পূর্বোক্ত ইনডানাকে ভোটের সাহায্যে সমস্যার সমাধান করতে বললেন। ভোট নেওয়া হল। শূন্যে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে জ্বলে জ্বলে উঠল অনেকগুলো বর্শাফলক— অধিকাংশ মানুষই হাতের অস্ত্র তুলে ধরে আস্তিলিওর স্বপক্ষে রায় দিল। যারা বিদেশীর উপস্থিতি চায়নি, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি মেনে নিল। এই ব্যাপারে সুকামবানার আর কিছু বলার উপায় থাকল না। জনতাকে উদ্দেশ্য করে সে একটি হুকুম দিল, সঙ্গে সঙ্গে আস্তিলিওর উপস্থিতি ভুলে গেল জনতা— সুকামবানা আর জ্ঞানী ব্যাক্তিদের মাঝখানে রেখে তারা গোল হয়ে বসে পড়ল।

তারপর বৃত্তাকারে উপবিষ্ট জনতার ভিতর থেকে জাগল মিলিত কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি। খুব ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে গান গাইছে জনতা। ঐক্যতান সঙ্গীত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুটির থেকে বেরিয়ে এল টোয়াবেনি! চতুর্দিকে দণ্ডায়মান জুলু-মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে সরে দাঁড়াল, বৃত্তাকারে উপবিষ্ট পুরুষরা বৃত্ত ভেঙ্গে তাকে মধ্যস্থলে প্রবেশ করার পথ ছেড়ে দিল। টোয়াবেনি কারও দিকে চাইল না, তার গতিবিধি এখন সম্মোহিত ব্যক্তির মতো আড়ষ্ট এবং তার ভাবলেশহীন চক্ষু-দুটির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে একটা শাণিত বর্শাফলকের উপর। ঐ বর্শাটাকে মাটিতে পুঁতে তার চারপাশে গোল হয়ে বসেছিল পুরুষের দল।

টোয়াবেনির উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠের মৃদু সঙ্গীতধ্বনি উচ্চস্বরে বেজে উঠল। টোয়াবেনির পাতলা ছিপছিপে শরীরটা দুলতে লাগল একবার সামনে, একবার পিছনে... তীব্রতম পর্যায়ে উঠে গেল গায়কদের কণ্ঠস্বর...উদারা, মুদারা, তারা... তারপর আবার নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল সুরের ঢেউ, মৃদু থেকে হল মৃদুতর, অস্পষ্ট এবং পরিশেষে বিরাম লাভ করল স্তব্ধতার গর্ভে। গান থামল। এখন মৌন জনতার নির্নিমেষ দৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য হল টোয়াবেনি। আস্তিলিও অনুভব করলেন এক ভয়ঙ্কর প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে নির্বাক মানুষগুলো।

টোয়াবেনির নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত; তার দেহে বুঝি ভর করেছে প্রেতাত্মা। আচম্বিতে এক প্রকাণ্ড লাফ মেরে সে ভূ-পৃষ্ঠে প্রোথিত বর্শার কাছ থেকে ছিটকে অনেক দূরে এসে পড়ল, তারপর ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক জুলু-যোদ্ধার দেহের ঘ্রাণ গ্রহণ করল। আবার ঘুরে এসে সে লাফিয়ে লাফিয়ে যোদ্ধাদের কাছে গিয়ে শুঁকতে লাগল। এক একটি লোককে দু'বার, তিনবার করে সে শুঁকল, তবু শেষ হল না গন্ধের বিচার এবং ক্লান্ত হল না টোয়াবেনি, যন্ত্রের মতো লাফাতে লাফাতে সে যোদ্ধাদের দেহের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে লাগল বারংবার......

আস্তিলিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন এইভাবে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে কি করে? অনেকেই, বিশেষ করে অভিজ্ঞ শিকারীরা জানেন, মানুষ অথবা জানোয়ার ভয় পেলে তাদের শরীর থেকে এক ধরনের গন্ধ নির্গত হয়, —কিন্তু সেই গন্ধকে আবিষ্কার করতে পারে বিশেষ কয়েক শ্রেণীর পশুর ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়। হয়তো দীর্ঘকাল অনুশীলন করার ফলে

বন্যপরিবেশের মানুষ টোয়াবেনি ঐ বিদ্যাকে আয়ত্ত করেছে, হয়তো সত্যিকার অপরাধীর দেহ-নিঃসৃত ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে ভয়ের গন্ধ এবং অনুশীলন করে যদি কেউ ঐ গন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারে তবে তার পক্ষে অপরাধীকে সনাক্ত করা খুবই সহজ। কিন্তু অনাবৃষ্টির জন্য কোনও মানুষ অপরাধ বোধ করে ভয়ার্ত হয়ে উঠবে না, কাজেই গন্ধের বিচার এখানে একবারেই অকেজো। জুলুদের পক্ষে সব কিছুই বিশ্বাস করা সম্ভব হলেও আত্তিলিওর পক্ষে এমন কড়া গাঁজা হজম করা দুঃসাধ্য।

'ঐ যে! ঐ যে সেই লোক, যার দুই চোখে জড়িয়ে আছে অমঙ্গলের অভিশাপ'— তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠল টোয়াবেনি। জনতা চিৎকার করে উঠল।

শূন্যে লাফিয়ে উঠল একশ' যোদ্ধা, তাদের ঘর্মাক্ত দেহে চকচক করে উঠল সূর্যরশ্মি। একটি লোকের হাত চেপে ধরল টোয়াবেনি, শুরু হল ধস্তাধস্তি। জনতা ছুটে এসে দুজনকে ঘিরে ফেলল। অত লোকের হুটোপুটির ভিতর ধৃত ব্যক্তির চেহারা দেখতে পেলেন না আত্তিলিও, তবে বুঝলেন গন্ধের বিচার শেষ হয়েছে—

ধরা পড়েছে অপরাধী!

নবম পরিচ্ছেদ : ক্রুদ্ধ জনতা

আত্তিলিও অবাক হয়ে ভাবছেন টোয়াবেনির ষড়যন্ত্রের শিকার কে হতে পারে, —হঠাৎ তাঁর পাশ কাটিয়ে কেউ যেন ছুটে বেরিয়ে গেল। তিনি ঘুরে দেখলেন একটি মেয়ে। সে ছুটছিল তীরবেগে, পিছন থেকে তার মুখ দেখতে পেলেন না আত্তিলিও, তবু মেয়েটিকে তিনি চিনতে পারলেন— মৃদাবুলি! তাকে চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন আত্তিলিও; তাকে কেউ দেখতে পায়নি— সকলেরই ব্যগ্র দৃষ্টি সেইখানে, যেখানে জুলুদের মাঝখানে টোয়াবেনির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে একটি হতভাগ্য মানুষ! জনারণ্যের ভিতর থেকে তার চেহারা দেখতে না পেলেও মৃদাবুলির আচরণেই আত্তিলিও বুঝে গেছেন টোয়াবেনির কবলে পড়ে যে মানুষটি ছটফট করছে সে ন্‌গো ছাড়া আর কেউ নয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান জুলু বালিকার উদ্দেশ্যও তিনি ধরে ফেলেছেন— সে ছুটে চলেছে সর্বাধিনায়ক জিপোসোর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

আত্তিলিওর ভ্রু কুঞ্চিত হল।

চারদিকে অগণিত নরখাদক সিংহের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি এড়িয়ে অরণ্য-প্রান্তর ও পর্বতের দুস্তর বাধা ভেদ করে বালিকা কি জিপোসোর সঙ্গে দেখা করতে পারবে? পারবে কি সেই লোকটাকে বাঁচাতে যে এখন ছটফট করছে ক্ষিপ্ত কুসংস্কার-অন্ধ জনতার মধ্যে?....

হ্যাঁ, ছটফট করছে ন্‌গো, তাকে চেপে ধরেছে ক্রুদ্ধ জনতা। একদল জুলুযোদ্ধা তাকে শুন্যে তুলে ফেলল, তারপর হাতে হাতে তাকে তুলে নিয়ে এল একটা মস্ত গাছের নীচে। আত্তিলিও গাছটার দিকে তাকালেন, পত্রবিহীন ঐ বিশাল শুষ্ক বৃক্ষটির নাম তিনি শুনেছেন—

''যাতনাদায়ক বৃক্ষ''। তার জুলু অনুচর জামানি একদিন তাঁকে পূর্বোক্ত গাছটির নাম এবং কার্যকারিতা সবিস্তারে জানিয়ে দিয়েছিল। জামানির মুখ থেকেই আত্তিলিও শুনেছেন যে, গাছের গুড়ির সঙ্গে বেঁধে প্রাচীনকালে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হত— রজ্জুবদ্ধ অপরাধীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচাগান চালাত বর্শাধারী যোদ্ধার দল এবং ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে খুঁচিয়ে মারত ঐ হতভাগ্য মানুষটিকে...

আত্তিলিও সচমকে ভাবলেন তাঁকেও কি আজ ঐরকম বীভৎস হত্যাকাণ্ডের দর্শক হতে হবে? তা ছাড়া আর একটা ভীষণ সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে হল—

নরমাংসের স্বাদ গ্রহণ করলেই সিংহ যেমন মানুষখেকো হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই মানুষের ভিতরকার পশুও রক্তপাতের জন্য হন্যে হয়ে ওঠে— ন্‌গোর রক্তপাতে উল্লসিত জনতার মধ্যে যদি রক্তের তৃষ্ণা জাগে, তাহলে তারা কি আত্তিলিওকে রেহাই দেবে?...

ইতিমধ্যেই তাদের পরিবর্তন এসেছে। শান্তশিষ্ট মানুষগুলো বন্য পশুর মতোই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, তাদের চোখেমুখে এখন রক্তলোলুপ শ্বাপদের হিংস্র অভিব্যক্তি!

আত্তিলিওর পা দুটো তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল সেইখানে, যেখানে পড়ে আছে তাঁর রাইফেল— প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তিনি পলায়নের ইচ্ছা দমন করলেন।

ষোল বছরের একটি বালিকা যদি এই ক্ষিপ্ত যোদ্ধাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়, নিরাপরাধ মানুষের প্রাণ রক্ষা করার জন্য এটুকু মেয়ে যদি চতুর্দিকে ভ্রাম্যমান শত শত নরখাদক সিংহের ভয়াবহ উপস্থিতি অগ্রাহ্য করতে পারে, তবে আত্তিলিওর মতো একজন সৈনিক পুরুষের পক্ষে পালিয়ে আত্মরক্ষার চিন্তা করাও অন্যায়।

তিনি পলায়নের ইচ্ছা দমন করে যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হলেন।

চারপাশে দণ্ডায়মান জনতা ও ন্‌গোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন আত্তিলিও— ক্রুদ্ধ জনতার আস্ফালন এখন থেমে গেছে, তারা ধীরভাবে অপেক্ষা করছে ইনডানাদের কথা শোনার জন্য। যতই রাগ হোক, জুলুরা 'ইনডানা' উপাধিপ্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যাক্তিদের মতামত কখনও অগ্রাহ্য করে না। সব সমেত তিনজন ইনডানা সেখানে উপস্থিত ছিল।

প্রথমেই এগিয়ে এল সেই ইনডানা, যে প্রথমেই আত্তিলিওর সঙ্গে করমর্দন করেছিল। ঐ লোকটি ন্‌গোর কাছে জানাতে চাইল সে অপরাধ স্বীকার করতে রাজি আছে কি না। ন্‌গো জানাল সে নিরপরাধ। ইনডানাটি তখন জনতাকে জিপোসোর জন্য অপেক্ষা করতে অনুরোধ করল। তার কথার ভঙ্গিতে বোঝা গেল ন্‌গোর অপরাধ সম্বন্ধে সে নিজেও নিঃসন্দেহ নয়।

এইবার দু'নম্বর ইনডানা তার অভিমত প্রকাশ করল। তার কথা হচ্ছে এই মুহূর্তে গাছের সঙ্গে বেঁধে ন্‌গোকে মেরে ফেলা উচিত। জুলুদের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ধীরে ধীরে খুঁচিয়ে মারার পক্ষপাতী সে নয়, চটপট মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতেই সে ব্যগ্র— কারণ, জিপোসো অকুস্থলে এসে পড়ে সব ওলট-পালট করে দিতে পারে এমন সম্ভাবনার কথাও জনতাকে

সে জানিয়ে দিল এবং 'শুভ কার্যে' বিলম্ব না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে পরবর্তী বক্তাকে স্থান ছেড়ে দিল।

জনতার একাংশ প্রবল হর্ষধ্বনিতে সমর্থন জানল, আর একদলের তরফ থেকে শোনা গেল শ্লেষতিক্ত ব্যঙ্গধ্বনি!

এইবার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল তিন নম্বর ইনডানা। তার বক্তব্য হচ্ছে, চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বিচার না করলে অন্যায় হবে: অতএব গরম জলের সাহায্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয়ের যে প্রাচীন প্রথা আছে, সেই পদ্ধতি অনুসারেই ন্গোর বিচার হওয়া দরকার। ন্গোর ডান হাত ফুটন্ত গরম জলে ডুবিয়ে দিয়ে যদি দেখা যায় সে অক্ষত আছে, তবেই বোঝা যাবে সে নির্দোষ।

জনতা সোল্লাসে চিৎকার করে এই প্রস্তাব সমর্থন করল। সঙ্গে সঙ্গে কুটিরের ভিতর থেকে একটা মস্ত বড় হাঁড়ি নিয়ে এল টোয়াবেনি। আত্তিলিও বুঝলেন, শয়তানটা আগেই সব ঠিক করে রেখেছিল। ন্গোর সামনে ফুটন্ত গরম জলের হাঁড়ি রাখা হল। সে পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু শয়তান টোয়াবেনি বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে ন্গোর ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিল হাঁড়ির ভিতর।

কয়েক মুহূর্ত.... ন্গোর হাত ছেড়ে দিল টোয়াবেনি.... সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল ন্গো— গরমজল তার হাতটাকে ঝলসে দিয়েছে।

'ওই হচ্ছে অপরাধী', চেঁচিয়ে উঠল সুকামবানা, 'বেঁধে ফেল ওকে গাছের সঙ্গে তারপর ধীরে ধীরে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে ওকে শেষ করে দাও। শয়তান ন্গোই বৃষ্টি বন্ধ করেছে আর সিম্বাদের (সিংহদের) লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের উপর।'

তৎক্ষণাৎ জন বারো বলিষ্ঠ যোদ্ধা ন্গোকে ধরে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে ঘিরে শুরু হল উদ্দাম নৃত্য। নাচতে নাচতে বর্শাধারী যোদ্ধারা গোল হয়ে ঘুরতে লাগল ন্গোকে মাঝখানে রেখে। ন্গোর সামনে দিয়ে ঘুরে যাওয়ার সময়ে প্রত্যেক যোদ্ধা তাঁর দেহ লক্ষ্য করে সজোরে বর্শা চালনা করতে লাগল এবং এমন অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে চালিত বর্শা ফলকের গতিবেগ তারা রোধ করছিল যে, লক্ষ্যস্থলের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে এসেই থেমে যাচ্ছিল অস্ত্রের শাণিত ফলক!

এখন সময় হয়নি—

ধীরে ধীরে কমে আসবে লক্ষ্যস্থল ও দংশন-উদ্যত বর্শাফলকের মধ্যবর্তী দূরত্ব, মৃদু আঘাতে রক্ত পান করবে একটির পর একটি শাণিত বর্শা, অজস্র অগভীর ক্ষত থেকে ঝরতে থাকবে রক্তের ধারা, তারপর একসময়ে প্রচণ্ড আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যাবে হতভাগ্য ন্গোর হৃৎপিণ্ড। কিন্তু—

কিন্তু নির্বাক ও নিশ্চেষ্ট হয়ে এই বীভৎস দৃশ্য দেখার জন্যই কি অপেক্ষা করছেন আত্তিলিও?

দশম পরিচ্ছেদ: যাদুকরের ভূমিকায় আত্তিলিও

অনাবৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, চিরস্থায়ী হতে পারে না। আত্তিলিও আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন— নাঃ, কোনও আশা নেই, এখানে সেখানে কিছু কিছু মেঘ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু বৃষ্টি সুদূর পরাহত।

'পকেট ব্যারোমিটার' নামক যে ছোট যন্ত্রটি সর্বদা আত্তিলিওর সঙ্গী, সেই যন্ত্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। ব্যারোমিটারের কাঁটা দেখে বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টি আসন্ন, খুব সম্ভব দু'চারদিনের মধ্যেই বর্ষণ শুরু হবে। কিন্তু আত্তিলিওর তো দুদিন পরে হলে চলবে না, এই মুহূর্তে বৃষ্টির দরকার— তবে?...

আত্তিলিও ঘড়ি দেখলেন। ঠিক এগারোটা বেজেছে। প্রায় এক ঘন্টা হল মৃদাবুলি চলে গেছে এখান থেকে। সমবেত কণ্ঠে ঐকতান সঙ্গীত বেজে উঠেছে তীব্র শব্দে, দ্রুততর হয়ে উঠছে নৃত্যের ছন্দ— বর্শাগুলো কিন্তু এখনও ন্গোর দেহ স্পর্শ করেনি। ন্গোর দিকে তাকালেন আত্তিলিও। একটুও বিচলিত হয়নি সে। তার সুশ্রী মুখমণ্ডলে গভীর অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের চিহ্ন!...

আত্তিলিও চিন্তা করতে লাগলেন। একজন ইনডানা যেন একটু আগেই কি বলছিল..... কি বলছিল? ..... হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে— দু' ঘন্টা পরেই দূরবর্তী অঞ্চল থেকে এই এলাকায় পদার্পণ করছে সর্দার জিপোসো এবং এলাকার মধ্যে এসে পড়লে সর্বাধিনায়ক তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কতক্ষণ অজ্ঞ থাকবে বলা শক্ত— অতএব দু'ঘন্টার মধ্যে কাজ শেষ করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছিল উক্ত ইনডানা।

দু'ঘন্টা? এই দু'ঘন্টা যদি জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন আত্তিলিও তাহলে বোধহয় ন্গোর প্রাণরক্ষা হয়। কিন্তু এই ক্ষিপ্ত জনতাকে কি অতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব? ...আত্তিলিও দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন।

একটা তীব্র চিৎকার আত্তিলিওর কর্ণকুহরে প্রবেশ করল।

না, ন্গো নয়— চেঁচিয়ে উঠেছে জনতা! রক্তপাত শুরু হয়েছে! আঘাত মারাত্মক নয়, কিন্তু বর্শার আঘাতে ন্গোর বাম জানু থেকে গড়িয়ে নামছে রক্ত!

আর রক্ষা নেই— আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠবে তারপর হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে একসময়ে নেমে আসবে মৃত্যু!

'দাঁড়াও! থামো,' চেঁচিয়ে উঠলেন আত্তিলিও। নাচ থেমে গেল। দারুণ বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যোদ্ধার দল।

আত্তিলিও বললেন, 'দাঁড়াও, জুলুরা, দাঁড়াও! বর্ষার দেবতা আনজিয়ানা এখনই বৃষ্টি পাঠিয়ে দিচ্ছে।'

একশ' মানুষ মুখ তুলল আকাশের দিকে। পরক্ষণেই জাগল ক্রুদ্ধ গুঞ্জনধ্বনি। কোথায় বৃষ্টি? আসন্ন বৃষ্টিপাতের কোন চিহ্নই নেই নীল আকাশের বুকে। কারও দিকে চাইলেন না আত্তিলিও, কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না তিনি, সোজা এসে দাঁড়ালেন জনতার মাঝখানে।

'একটু অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনো,' যে ইনডানার সঙ্গে আত্তিলিওর বন্ধুত্ব ছিল, সেই লোকটি এবার এগিয়ে এল। জনতাকে উদ্দেশ করে সে যে আদেশ-বাণী উচ্চারণ করল, তার মর্মার্থ হচ্ছে ধৈর্যধারণ করে সাদা মানুষের 'ম্যাজিকের বাক্স' কি করে সেইটা দেখাই এখন জুলুদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

আত্তিলিও ততক্ষণে তাঁর ম্যাজিকের বাক্স অর্থাৎ ক্যামেরা বাগিয়ে ধরেছেন এবং অতি মন্থর পদে অগ্রসর হয়েছেন ন্‌গোর দিকে। ক্যামেরার লেন্স ন্‌গোর বুকের কাছে ধরে ফিস ফিস করে আত্তিলিও বললেন, 'চ্যাঁচাও।'

জোরেই চেঁচিয়েছিল ন্‌গো। এমন কর্ণভেদী মনুষ্য কণ্ঠের আর্তস্বর ইতিপূর্বে কখনও আত্তিলিওর শ্রুতিগোচর হয়নি।

'দেখেছ ?' বিজয়গর্বে ঘুরে দাঁড়ালেন আত্তিলিও জনতার দিকে, 'একশ' বর্শার সামনে দাঁড়িয়ে যে ভয় পায়নি, সে এখন চেঁচিয়ে উঠেছে, —এখন বুঝেছ আমার ক্ষমতা ?'

জুলুরা চমৎকৃত! সত্যি কি ভয়ংকর ঐ ম্যাজিকের বাক্স ? আরও ভয়ঙ্কর ঐ বাক্সের চোখটা (লেন্স) ?

এইবার এক লম্বা বক্তৃতা শুরু করলেন আত্তিলিও। অভিভূত জুলু-জনতা স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেই আজগুবি, অদ্ভুত আর অসম্ভব কথাগুলো শুনতে লাগল। যত রকমের বিদঘুটে অবিশ্বাস্য বিষয়বস্তু আত্তিলিও ভাবতে পেরেছিলেন, সবগুলোকেই তিনি পরিবেশন করেছিলেন সেই বক্তৃতার মধ্যে।

টোয়াবেনি আর সুকামবানা রাগে কাঁপছিল। তাদের দিকে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন আত্তিলিও, 'কি হে! এইবার ? তোমরা কি বলতে চাও ?'

অনেক কিছুই হয়তো বলার ছিল। কিন্তু দুই শয়তান চুপ করে রইল। তারা জানত জুলুরা এখন তাদের কোনও কথায় কর্ণপাত করবে না— সাদা মানুষের ম্যাজিকের বাক্স, আর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা এখন তাদের অভিভূত করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে আত্তিলিও আর এক কাজ করেছেন— পকেট থেকে সিগারেট বার করে বিলিয়ে দিয়েছেন জুলুদের মধ্যে। জুলুল্যাণ্ডে সিগারেট অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য আর লোভনীয় বস্তু। অধিকাংশ লোকই সিগারেট নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল হত্যার আগ্রহে যারা একটু আগেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তারাই এখন ধোঁয়া ওড়াচ্ছে নির্বিকারভাবে!

আত্তিলিও জানতেন এই পরিবর্তন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আবার ক্ষেপে উঠবে জনতা। তবে কিছুটা সময় তো পাওয়া গেল। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই আত্তিলিওর উর্বর মস্তিষ্কে জন্ম নিয়েছে এক নতুন পরিকল্পনা— 'দেখেছ ?' আত্তিলিও কম্পাস বার করে সকলের সামনে ধরলেন, 'এই দেখ, ছোট্ট বর্শাটা (কম্পাসের কাঁটা) কেমন কাঁপছে ? এর মানে কি জান ?'

জুলুরা মাথা নাড়ল— না, সাদা মানুষের ভেলকি তারা বুঝতে পারে না। 'এর মানে হচ্ছে,' আত্তিলিও বললেন, 'এখনই বৃষ্টি শুরু হবে। সামনের গাছটার ছায়া এই জায়গায় পড়লেই বৃষ্টি নামবে।'

আত্তিলিও তাঁর ডান পায়ের গোড়ালি মাটিতে ঠুকে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। জনতা

এখন আর হিংস্র নয়। তাদের অস্বাভাবিক উন্মাদনা কেটে গেছে। আত্তিলিও জুলুদের স্বভাব জানতেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন উপস্থিত জনতার মধ্যে অনেক মানুষই এখন সর্বাধিনায়ক জিপোসোর আইন ভঙ্গ করার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। আত্তিলিও হয়তো জনতার শুভ বুদ্ধিকে আবার জাগিয়ে তুলে ন্‌গোকে রক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু টোয়াবেনি আর সুকামবানা তাঁকে সেই সুযোগ দিল না। শান্ত জনতাকে আবার তারা উত্তেজিত করে তুলল।

.......মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য আগুন ছাড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে..... গাছের ছায়াটা সরে সরে এসে আত্তিলিওর চিহ্নিত স্থানের খুব কাছেই এসে পড়েছে।

চাপা গলায় গর্জে উঠল টোয়াবেনি, 'ছায়াটা ঠিক জায়গায় এসে পড়লেই বৃষ্টি শুরু হওয়ার কথা। যদি তা না হয় তবে ন্‌গোকে হত্যা করা হবে।' একটু থামল টোয়াবেনি, তার অবরুদ্ধ কণ্ঠ সাপের মতো হিস হিস করে উঠল, 'তারপর সাদা মানুষের পালা।'

আত্তিলিও জানতেন সেটা সহজ নয়। জুলুরা তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস করবে না। তবে টোয়াবেনি যে তাঁকে খুন করবার চেষ্টা করবে সে বিষয়ে আত্তিলিওর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সময় কাটতে লাগল ধীরে ধীরে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল গাছের ছায়া নির্দিষ্ট স্থানের দিকে। অবশেষে এল সেই চরম মুহূর্ত, আত্তিলিওর চিহ্নিত স্থানে উজ্জ্বল রোদের আলোকে লুপ্ত করে করে নামল অন্ধকারের প্রলেপ—

গাছের ছায়া এসে পড়েছে চিহ্নিত স্থানের উপর।

জুলুরা আকাশের দিকে মুখ তুলল— নির্মেঘ আকাশে জ্বলছে মধ্যাহ্ন সূর্য, বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভবনাই সেখানে দেখা যাচ্ছে না।

জনতার মধ্যে আবার জাগল হিংস্র উত্তেজনা। আবার শুরু হল উদ্দাম নৃত্য। এবার তারা দেরি করতে চায় না, —কয়েকটা আসাগাই (বর্শা) ন্‌গোর দেহে বিভিন্ন স্থানে আঘাত করল। ক্ষতচিহ্নগুলো খুবই তুচ্ছ ছিল বটে, কিন্তু আত্তিলিও জানতেন কিছুক্ষণের মধ্যেই আঘাতের বেগ জোরালো হয়ে উঠবে— রক্ত দেখে ক্ষেপে উঠবে জুলুরা, সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক গভীর হয়ে চেপে বসতে থাকবে বর্শা-ফলকের দংশন এবং এক সময়ে চরম আঘাতে নেমে আসবে মৃত্যু।

আত্তিলিওর সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত। তিনি বুঝেছেন আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ন্‌গোর মৃত্যু অবধারিত। তারপর তাঁর পালা। টোয়াবেনির ইঙ্গিত পেলেই তারা যে আত্তিলওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে বিষয়ে আত্তিলিও ছিলেন নিঃসন্দেহ। তাঁর একমাত্র ভরসা সর্বাধিনায়ক জিপোসো। কিন্তু জিপোসোকে যে এখানে নিয়ে আসতে পারে, সেই ম্‌দাবুলি এখন কোথায় ? চতুর্দিকে ভ্রাম্যমান নরভুক্ সিংহদের নজর এড়িয়ে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে জিপোসোর সঙ্গে দেখা করতে সমর্থ হয়েছে কি জুলুবালিকা ?........

একটা বর্শার ফলা নগার বুকে বিদ্ধ হল। হৃৎপিন্ডের একটু উপরে। এগিয়ে এল আর একটা বর্শা। আত্তিলিও বুঝলেন চরম আঘাত পড়ার সময় এগিয়ে এসেছে, কিছুক্ষণের

মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবে ন্‌গো। আর তারপরই যে রক্তাক্ত বর্শাফলকগুলো নেচে উঠবে তাঁর চারপাশে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আন্তিলিও সেই দুরবস্থার কথা কল্পনা করে চমকে উঠলেন— ন্‌গোর মতো নির্বিকার মুখে অবিচলিতভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার সাধ্য তাঁর নেই.......

আন্তিলিও নিজের শ্রবণশক্তিকে বিশ্বাস করতে পারলেন না— ন্‌গোর নাম ধরে কে যেন ডাকছে!

কিন্তু না, ভুল হয়নি— উপত্যকার তলা থেকে নারীকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল আবার, 'ন্‌গো! ন্‌গো!'

আন্তিলিও দেখলেন পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে ছুটে আসছে ম্‌দাবুলি।

পাহাড়ের অপর প্রান্তে যেখানে আন্তিলিও সাহেব রাইফেল রেখে এসেছিলেন সেখানেও আবির্ভূত হয়েছে অনেকগুলো বর্শাধারী মনুষ্যমূর্তি! সর্দার জিপোসো এসে পড়েছে সসৈন্যে।

জনতা সচমকে ফিরে দাঁড়ল, তারপর প্রাণপণে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল। কেউ পালাতে পারল না, জিপোসোর সৈন্যরা প্রত্যেকটি মানুষকেই বন্দী করে ফেলল।

ম্‌দাবুলি ছুটতে ছুটতে এসে আন্তিলিওর সামনে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

আন্তিলিও বলে উঠলেন, 'ভয় নেই, ন্‌গো বেঁচে আছে।'

হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তর দিল ম্‌দাবুলি, 'তুমি— তুমিও বেঁচে আছ?'

ঠিক দুদিন পরেই বৃষ্টি নামল জুলুল্যাণ্ডে।

একাদশ পরিচ্ছেদ : সর্বাধিনায়ক জিপোসো

আহত ন্‌গো আরোগ্যলাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই জিপোসোর আস্তানাতে বিচারসভা বসল। বলাই বাহুল্য বিচারক ছিল জুলুদের সর্বাধিনায়ক জিপোসো।

বিচারের ফলাফল দেখে আন্তিলিও বুঝলেন জুলুদের নেতা অসাধারণ— তার দূরদর্শিতা, রাজনীতিজ্ঞান ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি অতুলনীয়।

ইনডানা বা জ্ঞানী ব্যাক্তিদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা উঠল না। সর্বাধিনায়ক শুধু বলল, উক্ত জ্ঞানী ব্যাক্তিদের জিহ্বা সম্বন্ধে সংযত হওয়া উচিত এবং যেহেতু তারা মূর্খের মতো কথা বলে এক অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, সেইজন্য কয়েক দিন সম্পূর্ণ মৌন থেকে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

গন্ধের বিচারে যে যোদ্ধার দল অংশগ্রহণ করেছিল, তারা রেহাই পেল না। আদালতের রায় অনুসারে প্রত্যেক যোদ্ধার উপর জরিমানা ধার্য হল— উত্তমরূপে প্রস্তুত একটি আসাগাই (বর্শা), তিনটি বাছুর ও তিনটি ছাগল। জন্তুগুলো যেমন তেমন হলে চলবে না, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সেরা জন্তুগুলোকেই দাবি করছে আদালত।

সাধারণ যোদ্ধাদের চার গুণ বেশী জরিমানা ধার্য হল সুকামবানার উপর। জরিমানার ফলে যে পশু আদায় করা হল, সেই জন্তুগুলোর মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ ন্‌গোকে

ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হল। অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করল সর্দার জিপোসো, আদালতের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য।

টোয়াবেনিকে নিজের হাতে শাস্তি দিল না জিপোসো। ঐ শয়তান যাদুকরের কুকীর্তির বিশদ বিবরণসহ তাকে প্রেরণ করা হল 'ইশোয়ি' নামক স্থানের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। শ্বেতাঙ্গদের বিচারে টোয়াবেনির যে কি দুরবস্থা হবে সে বিষয়ে জিপোসো ছিল দস্তুরমতো সচেতন।

নিজের হাতে দণ্ডবিধান করে জুলুদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হতে চায়নি বলেই সাদা মানুষের হাতে টোয়াবেনির দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল সর্দার জিপোসো। অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত এক রক্ষিবাহিনী টোয়াবেনিকে নিয়ে রওনা হল উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্যে।

জুলুদের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে পরিবারের কর্তা মারা গেলে বা অক্ষম হলে ঐ পরিবারের সব দায়িত্বই সর্দারকে বহন করতে হয়। টোয়াবেনির পরিবারভুক্ত মানুষগুলোর জন্য খুব ভাল ব্যবস্থাই করেছিল জিপোসো।

তবে টোয়াবেনির অন্যতম কন্যা ম্‌দাবুলি সম্বন্ধে আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য পাঠকের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক— কারণ, উল্লিখিত জুলুবালিকা হচ্ছে এই অরণ্য-নাটকের নায়িকা।

জিপোসো ম্‌দাবুলির সঙ্গে ন্‌গোর বিবাহের ব্যবস্থা করল। তবে টোয়াবেনির পরিবর্তে যেহেতু এখন কন্যার অভিভাবকের স্থান নিয়েছে জিপোসো, তাই বরকে পূর্ব-প্রতিশ্রুত তিরিশটি গরু কন্যাপণ দিতে হবে জিপোসোরই শ্রীহস্তে! বিচারের এই অংশটুকু শুনলে স্পষ্ট বোঝা যায় রাজ্যের সর্বত্র কি ঘটেছিল সে বিয়ে সর্বাধিনায়ক সর্বদাই অবহিত— না হলে ন্‌গোর কন্যাপণের প্রতিশ্রুতি জিপোসোর কর্ণগোচর হয় কি করে?....

আন্তিলিওর জুলু অনুচর জামানিকে নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে? জিপোসোর বিচার সভাতে জামানিকেও ডাকা হয়েছিল। সে আন্তিলিওকে সব ঘটনা খুলে বলেছিল বলেই একটা দুর্ঘটনার গতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু জুলু জাতির অধিনায়কের পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে খুব অন্যায় হয় না— বরং জাতীয় স্বার্থে সেটাই স্বাভাবিক।

অবশ্য জিপোসো একবারও বলে নি যে, জামানি মূর্খের মতো জুলুজাতির গোপন তথ্য সাদা মানুষের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে, এবং যে-মানুষ বিদেশীর কাছে এতখানি বিশ্বস্ত হতে পারে, দেশের বাইরে তার উপস্থিতি জাতির পক্ষে বিপজ্জনক। না, না, এসব কথা মোটেই বলেনি জিপোসো, —বরং জামানির প্রশংসায় সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। জিপোসো জানাল তার দেশের যে-মানুষটি এমন অদ্ভুত জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী তাকে সে হারাতে পারে না। জাতীয় স্বার্থে ঐ লোকটির সর্বদাই অবস্থান করা উচিত দেশের মধ্যে। অতএব সর্বাধিনায়কের নিজস্ব পরামর্শদাতার সম্মানজনক পদে জামানিকে বহাল করা হল এবং টোয়াবেনির ক্রাল-এর যাবতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভোগ করার অধিকার দেওয়া হল জামানিকেই।

জামানিকে শুধু ঘরই দেয়নি জিপোসো, ঘরনীর ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। দুটি জুলুযুবতীর সঙ্গে জামানির বিবাহের ব্যবস্থা করে দিল সর্বাধিনায়ক জিপোসো। দু'দুটো বৌ পেয়ে জামানি

এত খুশী হল যে, কন্যাপণ হিসাবে জিপোসোকে এক কুড়ি গরু দিতেও আর আপত্তি হল না। আন্তিলিও বুঝলেন, জিপোসো সকলের প্রতি সুবিচার করল বটে সেই সঙ্গে নিজের সম্পত্তির পরিমাণও বাড়িয়ে ফেলল সুকৌশলে!

সকলেরই যখন বিচার হল, তখন আন্তিলিওর দলবলই বা বাদ যায় কেন? জিপোসোর পরিবর্তে অন্য কোনও নেতা হলে সে স্পষ্টই বলত, 'শোন ভাই! তোমরা এখানে এসে সিংহ মেরেছ, দাঁতের ব্যথা সারিয়েছ। ভাল ভাল উপহারও দিয়েছ— সব সত্যি; কিন্তু আগে বল তো ভাই, এখানে তোমাদের কে আসতে বলেছে? শুধু জুলুদের উপকার করে উদার-হৃদয়ের পরিচয় দিতেই তোমাদের শুভাগমন হয়েছে, এমন কথা বিশ্বাস করার মতো মূর্খ আমরা নই। যা হয়ে গেল তার জন্য দেশের লোকের কাছে তোমরা খুবই অপ্রিয় হয়ে উঠবে। জুলুরা তোমাদের ভয় করবে, এড়িয়ে চলবে— কারণ, যে কোন সময়ে তাদের গোপনীয় কথা তোমরা কর্তৃপক্ষের কাছে ফাঁস করে দিতে পার। আর এখন তো জুলুল্যাণ্ডে বৃষ্টি নেমেছে, কাজেই তৃণভোজী পশুরা আবার এখানে ফিরে আসবে এবং সিংহের দলও হামলা না করে বুনো জানোয়ারের দিকে আকৃষ্ট হবে। অতএব, তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চটপট বিদায় হও, জুলুরা তাদের ব্যাপারে বিদেশীর নাকগলানো পছন্দ করে না।'

হ্যাঁ, অন্য কোনও নেতার পক্ষে ঐ কথা বলাই স্বাভাবিক, কিন্তু জিপোসো হচ্ছে অসাধারণ মানুষ— অপ্রীতিকর বক্তব্যকে সে উপস্থিত করতে পারে সুন্দরভাবে। অনর্থক তিক্ততাকে পরিহার করতে ভালভাবেই জানে সর্বাধিনায়ক জিপোসো।

অভিযাত্রীরা যে এখন পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করার কথা মুখেও আনেননি সেদিকে নজর না দিয়ে সমবেত জনতাকে জিপোসো জানিয়ে দিল, বিদেশী আগন্তুকরা জুলুদের জন্য যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করেছেন— অতএব তাঁরা দেশত্যাগ করার আগে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অবশ্য কর্তব্য। ন্‌গোকে হত্যা করার অনুষ্ঠানে লিপ্ত হওয়ার জন্য অভিযুক্ত জুলু-যোদ্ধাদের আদেশ দেওয়া হল, তারা যেন প্রত্যেকেই গৃহনির্মিত কারুশিল্পের একটি করে নিদর্শন অভিযাত্রীদের উপহার দেয়— কারণ, পূর্বোক্ত একশ অভিযুক্ত যোদ্ধা আন্তিলিওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, অতএব উল্লিখিত উপহার জরিমানাস্বরূপ দিয়ে তারা বিদেশী অতিথির মার্জনালাভ করতে পারবে। এইটুকু শাস্তি যথেষ্ট বলে মনে করল না জিপোসো; সে জানাল অভিযাত্রীদের জিনিসপত্র সসম্মানে গাড়িতে তুলে দিয়ে তাঁদের জুলুল্যাণ্ড পরিত্যাগ করার কাজে সাহায্য করতে হবে এবং ঐ সাহায্যের ভার গ্রহণ করার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করা চলবে না একথাও জানিয়ে দিতে ভুলল না জিপোসো।

এমন চমৎকার বিচারের ফলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উৎসাহ বা আনন্দের লক্ষণ দেখা গেল না। ম্রিয়মান জনতাকে লক্ষ্য কের জিপোসো গর্জন করে উঠল, 'তোমাদের জন্য যেন মাসাংগাদের যাত্রা করতে দেরি না হয়ে যায়। কাল সকালেই ওঁরা দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, তোমাদের ত্রুটির ফলে যদি যাত্রা করতে দেরি হয়, তবে জরিমানার পরিমাণ হবে দ্বিগুণ! কথাটা যেন মনে থাকে!

এইবার ভাষণ দিতে উঠলেন আন্তিলিও। খুব সহজ সরলভাবে নির্বিকারমুখে তিনি জানালেন,

যে নেতা এমন সুন্দরভাবে বিচার করতে পারে এবং নির্বাক অতিথির মনোভাব বুঝতে পেরে তার ইচ্ছা পূরণের জন্য চেষ্টিত হয়, তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা তাঁর নেই— তবে এমন একজন অধিনায়কের নেতৃত্ব লাভ করে সমগ্র জুলুজাতি যে ধন্য হয়েছে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

পরের দিন সকালে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ভিতর দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন অভিযাত্রীরা। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, যে লোকগুলো একদিন আগে বৃষ্টির জন্য নরহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তারাই আজ হাঁটু পর্যন্ত কাদাজলের ভিতর মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে বিব্রত! বৃষ্টিপাতের অবস্থা দেখে অভিযাত্রীরা বুঝলেন বৃষ্টি এখন সহজে থামছে না, অন্ততঃ বেশ কিছুদিন ধরে চলবে অনর্গল ধারাবর্ষণ। হঠাৎ জুলুল্যাণ্ড ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় পূর্ব-পরিকল্পনা ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আন্তিলিও সাহেব জিপোসোর কাছে প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করেননি। যাওয়ার আগে অশ্রুসজল চক্ষে অভিযাত্রীদের বিদায় জানাল জামানি।

জুলু-যোদ্ধারা খুব মনমরা হয়েই অভিযাত্রীদের মোট বহন করার কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল, ভাল ভাল হাতে-গড়া কারুশিল্পও তারা অভিযাত্রীদের উপহার দিতে বাধ্য হয়েছিল জিপোসোর আদেশে— অতএব তাদের মুখে-চোখে যে খুব আনন্দের চিহ্ন ফুটে ওঠেনি সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে তাদের মুখে হাসি ফুটল— আন্তিলিও সাহেব উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কুণ্ঠিত হন নি, এমন কি উপহারের বিনিময়েও অর্থ দিয়েছিলেন মুক্তহস্তে।

জুলুদের বিদায় করে অভিযাত্রীরা এইবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা-সভা ডাকলেন। হঠাৎ জুলুল্যাণ্ড থেকে বিদায় নেওয়ায় তাঁদের কর্মসূচীর পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল। আলোচনার ফলে স্থির হল, মোজাম্বিক এবং দক্ষিণ রোডেশিয়ার ভিতর দিয়ে ফিরে যাবেন বিল ও প্রফেসর। কোনও অজ্ঞাত কারণে হাতি শিকারের জন্য অস্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ করছিল বিল; কয়েকটা হাতির ভবলীলা সাঙ্গ করতে না পারলে তার স্বস্তি নেই। অতএব ঠিক হল, বায়রা থেকে ইউরোপ হয়ে যাত্রা করার আগে প্রফেসরের সঙ্গে আন্তিলিও দেখা করবেন বলে কথা হল।

তাঁরা স্থির করলেন কেপটাউন থেকে ইংল্যাণ্ড অথবা আমেরিকাতে গিয়ে নূতন করে একটা অভিযান-বাহিনী সংগঠিত করবেন এবং আফ্রিকার যে-সব স্থান আজও অনাবিষ্কৃত সেখানে পূর্বোক্ত অভিযান-বাহিনীর সাহায্যে গবেষণার কাজ চালাবেন।

পরবর্তী অভিযানের জন্য যে জায়গাটাকে আন্তিলিও মনোনীত করেছিলেন, সেটি হল আফ্রিকার কিভু অরণ্য— অতিকায় দানব-গরিলার বাসস্থান।

অভিযাত্রীদের জল্পনা-কল্পনা শুনে অদৃশ্য নিয়তির ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটেছিল মনে হয়; কারণ—

বায়রা থেকে জাহাজ ধরতে পারে নি বিল, তার আগে সে নিজেই ধরা পড়ে গেল এক স্বর্ণকেশী সুন্দরীর হাতে। কিন্তু তারপরই নববধূর সান্নিধ্য ত্যাগ করে বিল ছুটে গেল এক সাংঘাতিক ভবিতব্যের দিকে—

এইবার প্রফেসরের কথা। কেপটাউনে বন্ধুবর আন্তিলিওর সঙ্গে দেখা করার পরিবর্তে

তিনি ফ্রান্সের সেনাবাহিনীতে যোগদান করলেন এবং আমাদের কাহিনী থেকেও বিদায় গ্রহণ করলেন এখান থেকেই— আত্তিলিও গত্তির অন্যান্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর মধ্যে আমরা আর প্রফেসরকে দেখতে পাব না.....

এ দিকে কাহিনীর নায়ক আত্তিলিও কিভুর জঙ্গলে দানব-গরিলার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু গরিলার পরিবর্তে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হল দলবদ্ধ এক জান্তব বিভীষিকা!

সেই চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে আত্তিলিওর পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী।

সৈনিকের তৃতীয় অভিজ্ঞতা —

(প্রথম খণ্ড)

প্রথম পরিচ্ছেদ : আত্তিলিওর সঙ্গী

বর্তমান কাহিনীতে তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার আগে কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি বলেছেন, এই ঘটনা যদিও বহুদিন আগে ঘটেছে, তবু এখনও 'মহিষ' শব্দটি যদি তিনি শোনেন অথবা উক্ত পশু সম্বন্ধে কোনও আলোচনা যদি তাঁর শ্রুতিগোচর হয়, তাহলে তাঁর সর্বাঙ্গের মাংস-পেশী হয়ে যায় আড়ষ্ট— এখনও পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে বসে তিনি যেন শুনতে পান শত শত খুরের ভয়াবহ ধ্বনি, এখনও তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য, যেখানে প্রান্তরের উপর দণ্ডায়মান তাঁর অসহায় দেহ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে শত শত জীবন্ত বিভিষিকা সম্মুখে অবস্থিত মনুষ্য মূর্তিকে ছিন্নভিন্ন করে মাটিতে মিশিয়ে দেবার জন্য.....

এই ভীতিপ্রদ কাহিনী পরিবেশন করার আগে আফ্রিকার বুকে আত্তিলিওর প্রথম অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হওয়া দরকার— ঐ অভিজ্ঞতার মধ্যে কেবল 'মহিষ' নামক জীবটি সম্বন্ধে আত্তিলিওর বিদ্বেষমূলক মনোভাব নিতান্ত অকারণে সৃষ্ট হয়নি। কম্যাণ্ডার সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন, আফ্রিকাবাসী যাবতীয় মহিষকেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে শত্রু বলে মনে করেন। আফ্রিকার অরণ্যে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মহিষ সম্বন্ধে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন আত্তিলিও। যে শোচনীয় ঘটনার ফলে পূর্বোক্ত শৃঙ্গধারী পশুটি সম্পর্কে আত্তিলিওর মনে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছিল, সেই ঘটনার বিশদ বিবরণীর মধ্যে বর্তমান কাহিনীর শুরু।

আত্তিলিও গত্তির বয়স যখন কুড়ির কিছু বেশী, সেই সময়ে শিকার-কাহিনী, অভিযান-কাহিনী ও জীবজন্তু বিষয়ক প্রচুর পুস্তক পাঠ করে তাঁর ধারণা হল ঐ সব ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে— এইবার একটা অভিযানে বেরিয়ে পড়লেই হয়। তিনি মনে করলেন কয়েকটা ঘোড়া, রাইফেল আর গোলাবারুদের সংগ্রহ করতে পারলেই আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে অভিযান শুরু করা যায়। অ্যাংলো-ইজিপশিয়ান সুদানের অজ্ঞাত স্থানগুলোকেই

অভিযানের পক্ষে উপযুক্ত মনে করেছিলেন আন্তিলিও সাহেব। পরে অবশ্য তিনি বুঝেছিলেন পুঁথিগত বিদ্যা আর বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্য এক নয়।

একে অল্প বয়সের গরম রক্ত, তার উপর বিস্তর বই-টই পড়ে আন্তিলিও হয়ে পড়েছেন সবজান্তা— অতএব সকলের মতামত অগ্রাহ্য করে তিনি উপস্থিত হলেন সুদানের খার্তুম নামক স্থানে। শুধু গন্তব্যস্থল সম্পর্কে পরিচিত মানুষের মতামত উপেক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি আন্তিলিও, সকলের সাবধান বাণী তুচ্ছ করে তিনি মেলা-মেশা শুরু করলেন মহম্মদ আলি নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে। আন্তিলিওর শুভার্থীরা তাঁকে একবাক্যে ঐ বিপজ্জনক লোকটির সংশ্রবে আসতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু সবজান্তা আন্তিলিও কারও কথায় কান দিলেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল মহম্মদ আলি এবং আন্তিলিও গত্তির সম্পর্ক হচ্ছে কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতোই অবিচ্ছিন্ন।

খার্তুমের মানুষ মহম্মদ আলিকে ধাপ্পাবাজ মিথ্যাবাদী বলেই মনে করত। তাদের ধারণা হচ্ছে উক্ত ব্যক্তি খার্তুম ছেড়ে কোথাও যায় নি, এবং সুদানের বন্যপ্রাণী সম্পর্কে যদি কেউ তার কাছে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় লাভ করতে যায় তবে সেই নির্বোধ তিব্বতের লামার বিষয়েও মহম্মদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে— কারণ, মহম্মদ আলির কাছে সুদানের বন্যপ্রাণী আর তিব্বতের লামা দুই-ই সমান। দুটি বিষয়েই সে সমান অজ্ঞ।

মহম্মদের মুখে যেসব ভয়ানক ঘটনার চাক্ষুষ বর্ণনা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সেই সব ঘটনা যে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ না হয়ে ধাপ্পাবাজ মিথ্যাবাদীর মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনাশক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে এমন কথা আন্তিলিওর মনে আসে নি— মহম্মদ সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমত ঈর্ষাকাতর মানুষের নিন্দা বলেই মনে করেছিলেন আন্তিলিও। সুতরাং আন্তিলিওর বিচারে শিকার অভিযানের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত সঙ্গী হিসাবে বিবেচিত হল যে ব্যক্তি, তার নাম— মহম্মদ আলি।

সমগ্র খার্তুমের মানুষ একদিন বিরক্ত ও বিস্মিত হয়ে দেখল, আন্তিলিও সাহেব মহম্মদ আলিকে তাঁর পথপ্রদর্শকের কার্যে নিযুক্ত করেছেন। আন্তিলিও পরে জানতে পেরেছিলেন, কথার জাল বুনে চতুর মহম্মদ তাঁকে যে পারিশ্রমিক অর্থ দিতে রাজি করিয়েছিল, সেই টাকার অঙ্কটা ছিল যথেষ্টর চাইতেও বেশী! অবশ্য মহম্মদের পক্ষে পারিশ্রমিক অর্থ শেষ পর্যন্ত হস্তগত করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মহম্মদ আলির মৃত্যু

ছয়জন স্থানীয় অধিবাসী নিয়ে গঠিত ছোট দলটিকে নিয়ে ফাংপ্রভিন্স নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন আন্তিলিও। তিনি এবং মহম্মদ আলি ঘোড়ায় চড়ে দলের আগে আগে চলছিলেন। নির্দিষ্ট স্থানে এসে এক ব্যক্তির মুখে আন্তিলিও শুনলেন ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে আশ্চর্য দ্রষ্টব্য হচ্ছে আটশ মহিষের একটি বিরাট দল। এমন প্রকাণ্ড দল বড় একটা দেখা

যায় না। পূর্বোক্ত মহিষযূথকে স্বচক্ষে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে মাত্র কয়েকটি লোক। তারা সকলেই জানিয়েছে এমন চমকপ্রদ ও ভয়াবহ দৃশ্য কখনও তাদের চোখে পড়েনি। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন আন্তিলিও— শত শত অতিকায় মহিষ প্রায় এক মাইল স্থান ধরে সারিবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হচ্ছে এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করেই তাঁর সর্বাঙ্গ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত! তিনি ঠিক করলেন যেভাবেই হোক মহিষযূথকে তিনি একবার স্বচক্ষে দেখবেন।

তাঁবুতে ফিরে তিনি জানিয়ে দিলেন উল্লেখিত মহিষযূথের উদ্দেশ্যে তিনি শীঘ্রই যাত্রা করবেন এবং ঐ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে কোনও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে তিনি প্রস্তুত।

আন্তিলিওর ঘোষণা শেষ হতে না হতেই মোটবাহক, রাঁধুনি, ছোকরা-চাকর প্রভৃতি যে ছয়জন লোক দলে ছিল তারা সকলেই প্রাণপণে কণ্ঠস্বরের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল! সেই তুমুল কোলাহলের মধ্যে তাদের বক্তব্য কিছুই বুঝতে পারলেন না আন্তিলিও। তিনি স্বয়ং এইবার চ্যাঁচাতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ তারস্বরে চেঁচিয়ে আন্তিলিও দলের মধ্যে স্তব্ধতার সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন। তারপর তিনি মহম্মদ আলিকে ডেকে দলের লোকদের এমন অসঙ্গত আচরণের কারণ জানতে চাইলেন।

মহম্মদ আন্তিলিওকে জানাল তাঁর পরিকল্পনা শুনে উৎসাহিত হয়েই দলের মানুষ হঠাৎ কোলাহল করে উঠেছিল, অতএব ঐ নিয়ে আন্তিলিওর আর চিন্তা করা উচিত নয়!

না, আন্তিলিও আর চিন্তা করেননি, —পরের দিন যখন তাঁরা রওনা হলেন, তখনও দলের লোকদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নিয়ে মাথা ঘামাননি আন্তিলিও— কিন্তু তিন দিন পরে এক মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে উঠেই যখন তিনি আবিষ্কার করলেন মহম্মদ ছাড়া প্রত্যেকটি লোকই হঠাৎ তাঁবু থেকে অদৃশ্য হয়েছে তখনই কয়েকদিন আগের কণ্ঠস্বরের তীব্র প্রতিযোগিতার কথা তাঁর মনে হল এবং মহম্মদ আলি যে দলের লোকের উৎকণ্ঠার বিপরীত ব্যাখ্যা করে মনিবকে ধোঁকা দিয়েছে এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ রইল না একটুও।

মহম্মদকে ডাকলেন আন্তিলিও। দলের যাবতীয় মানুষ তাঁবু ছেড়ে উধাও হয়েছে এই খবরে যেন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল মহম্মদ আলি। তৎক্ষণাৎ ঘোড়া সাজিয়ে সে জানাল, সবচেয়ে বড় মহিষের মাথাটা আন্তিলিওকে যোগাড় করে দেবে বলে যে প্রতিজ্ঞা সে করেছিল, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সে বদ্ধপরিকর —হতচ্ছাড়া পলাতকদের সে বুঝিয়ে দেবে মহম্মদ আলি কোন্ ধরনের মানুষ, কারও সাহায্য ছাড়াই মহিষযূথের সংবাদ সে সংগ্রহ করবে এবং ঐ খবরের জন্য এক মুহূর্ত দেরি না করে সে যাত্রা করতে প্রস্তুত।

বলতে বলতেই সে তড়াক করে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে, আর হতভম্ব আন্তিলিওকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে!

হঠাৎ আন্তিলিওর মনে হল মহম্মদ আলিও বোধহয় অন্যান্য অনুচরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে উদ্যত হয়েছে! নিখুঁত পদ্ধতিতে ফাঁকি দেওয়ার এইটাই বোধ হয় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও আধুনিক কায়দা! আন্তিলিও সাহেবের সন্দেহ সত্য, না, অন্যায়ভাবে মহম্মদের বীরত্ব ও সদিচ্ছার প্রতি সন্দিহান হয়ে তিনি উক্ত আরব দেশীয় মানুষটির প্রতি অবিচার করেছিলেন—

সে কথা কোনদিনই জানা সম্ভব হবে না। কারণ, এতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনার স্রোত একটা প্রহসনমূলক নাটকের সূচনা করছিল — আচম্বিতে ঘটনাচক্রের দ্রুত পরিবর্তন সেই প্রহসনকে রূপান্তরিত করল এক বিয়োগান্ত নাটকের রক্তাক্ত দৃশ্যে!

এই ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের জন্য দায়ী হচ্ছে একটি প্রকান্ড বন্য মহিষ। যে দলটাকে আত্তিলিও অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, এই জন্তুটা সেই দলভুক্ত নয়— একটা দলছাড়া মহিষের একক উপস্থিতি সমস্ত ঘটনা স্রোতকে বদলে দিয়েছিল।

মহম্মদ তখনও ঘোড়ার পিঠে দৃশ্যমান, আত্তিলিও প্রাণপণে চেঁচিয়ে তাকে ফিরে আসতে বলছেন— হঠাৎ ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করে আত্তিলিওর থেকে প্রায় তিনশ ফুট দূরে আর্বিভূত হল এক কৃষ্ণকায় বিপুলবপু বন্য মহিষ! জন্তুটা ঝড়ের বেগে ধেয়ে এল মহম্মদ আলির বাহন আরবী ঘোড়াটার দিকে!

'সাবধান! চেয়ে দেখ— সামনে বিপদ।' চেঁচিয়ে মহম্মদকে সাবধান করে দিলেন আত্তিলিও, পরক্ষণেই ছুটলেন তাঁবুর ভিতর থেকে রাইফেল হস্তগত করার জন্য।

মুহূর্তে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এলেন আত্তিলিও। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে— প্রচণ্ড সংঘর্ষে মিলিত হল মহিষ ও ঘোটক! আত্তিলিও দেখলেন মহিষের শিং ঘোড়ার বুকের ভিতরে ঢুকে গেছে! পরক্ষণেই ঘোড়াটাকে শিং বিঁধিয়ে শূন্যে তুলে ফেলেছে মহিষ এবং দারুণ যাতনায় মহিষের মাথার উপর ঘোড়া ছটপট করছে!

মহম্মদ আলি ছিটকে পড়েছিল কয়েক গজ দূরে। ছুটে পালানোর জন্য সে তাড়াতাড়ি ভূমিশয্যা ত্যাগ করার চেষ্টা করল— কিন্তু সে উঠে দাঁড়ানোর আগেই মহিষ তাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল! ঘোড়াটা তখনও মহিষের মাথার উপর শৃঙ্গাঘাতে বিদ্ধ অবস্থায় ছটপট করছিল, কিন্তু ঘোটকের দেহভার মহিষাসুরের গতিরোধ করতে পারল না— সে এসে পড়ল ভূপতিত মহম্মদ আলির দেহের উপর।

ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন আত্তিলিও; অভ্যস্ত আঙ্গুলের স্পর্শে রাইফেলের বুলেট মহিষের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। আত্তিলিও দৌড়ে এলেন আবদ্ধ জন্তু দুটির দিকে। ঘোড়াটা অসহ্য যাতনায় ছটপট করছিল। আত্তিলিওর রাইফেল তার মৃত্যুকে সহজ করে দিল। মহিষের দেহে প্রাণ ছিল না, গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা গেছে।

মহম্মদের অবস্থা খুবই শোচনীয়— মহিষ আর ঘোড়া জড়াজড়ি করে তার উপরই পড়েছে, দুটি বিশাল দেহের নীচে পিষ্ট হয়ে সে এখন মৃত্যুপথের যাত্রী। শিং দুটো মস্ত বড়, প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বলে উঠল মহম্মদ, 'যেমন...যেমন...আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম'... তার কণ্ঠরুদ্ধ হল, কালো গোঁফ দুটির নীচে রক্তমাখা দাড়ির ভিতর থেকে যে হাসিটা ফুটে উঠেছিল, সেই হাসির রেখা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল মৃত্যুর স্পর্শে —হাসতে হাসতেই মৃত্যুবরণ করল মহম্মদ আলি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মহিষ

পূর্বোক্ত ঘটনার পর থেকেই মহিষ সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ পোষণ করতেন আত্তিলিও গত্তি।

একাধিক পুস্তকে মহিষ-বিষয়ক তথ্য পাঠ করে আত্তিলিও জেনেছিলেন ঐ জন্তুটি আক্রান্ত না হলে অথবা প্ররোচিত না হলে বিনা কারণে কখনও মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু মহম্মদ আলি ও তার বাহন আরবী ঘোড়াটার মৃত্যু দেখে আত্তিলিও বুঝেছিলেন কেতাবে লিখিত তথ্য আংশিক সত্য হলেও হতে পারে, সর্বাংশে সত্য কখনই নয়। এইখানে আফ্রিকার মহিষ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। মহিষগোষ্ঠীর কোনও জন্তুকেই নিরীহ বলা চলে না, মহিষ মাত্রেই ভয়ঙ্কর জীব!

গৃহপালিত মহিষও উত্তেজিত হয়ে মানুষের প্রাণহরণ করেছে এমন ঘটনা খুব বিরল নয়। মহিষগোষ্ঠীর বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর জীব অফ্রিকার 'কেপ বাফেলো'। লেপার্ড, হায়না প্রভৃতি মাংসাশী জানোয়ার কখনও কেপ বাফেলোর ধারে কাছে আসে না। স্বয়ং পশুরাজ সিংহও পূর্ণবয়স্ক কেপ বাফেলোর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অনিচ্ছুক —ক্রোধ আত্মহারা না হলে সিংহ কখনই মহিষের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয় না। রুদ্রমূর্তি মহিষকে দেখে সিংহ চম্পট দিয়েছে এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়।

মহিষ পরিবারের সকল পশুরই প্রধান অস্ত্র শিং আর খুর। কেপ বাফেলো নামক আফ্রিকার অতিকায় মহিষও ঐ দুটি মহাস্ত্রে বঞ্চিত নয়; উপরন্তু তার মাথার উপর থাকে পুরু হাড়ের দুর্ভেদ্য আবরণ— শিরস্ত্রাণের মতো মাথার উপর দৃশ্যমান ঐ কঠিন অস্থি-আবরণ ভেদ করে শ্বাপদের নখদন্ত কিংবা রাইফেলের বুলেট মস্তিষ্কে আঘাত হানতে পারে না। ঐ অস্থি-আবরণের ইংরেজি নাম 'বস্ অব দি হর্নস'; সংক্ষেপে 'বস্'। বস্-এর দুদিকে অবস্থিত শিং-এর দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩৬ ইঞ্চি থেকে ৪৫ ইঞ্চি। তবে ৫৬১/৪ ইঞ্চি লম্বা শিংও দেখা গেছে। পূর্বোক্ত মহিষের আয়ু তিরিশ বছর, কিংবা আর একটু বেশী। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত বলশালী তরুণ মহিষদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে অনেক সময় প্রাচীন মহিষরা দল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দলছাড়া মহিষ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করে এবং সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করে। নিঃসঙ্গ পুরুষ মহিষ সবচেয়ে বিপজ্জনক জানোয়ার। মহম্মদকে হত্যা করেছিল ঐ রকম একটি নিঃসঙ্গ ভয়ঙ্কর গুণ্ডা মহিষ।

আফ্রিকাবাসী মহিষদের মধ্যে 'কেপ বাফেলো' নামক জন্তুটি সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে, কিন্তু আরও দুই জাতের মহিষ আফ্রিকাতে দেখা যায়। 'গ্যামা' নামে একরকম মহিষজাতীয় জানোয়ার আরব দেশে চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া আছে 'বনগরু' বা 'পিগমি বাফেলো'। কেপ বাফেলোর কাঁধ মাটি থেকে পাঁচ ফুট কিংবা আর-একটু বেশী উঁচু হয়, কিন্তু পিগমি বাফেলোর কাঁধের উচ্চতা মাটি থেকে মাত্র তিন ফুট; তার শিং ধারালো তবে ছোট এবং দেহের রং তার অতিকায় জ্ঞাতিভাইয়ের মতো কৃষ্ণবর্ণ নয়— রক্তাভ-পীত বর্ণে রঞ্জিত ঘন রোমশ দেহ নিয়ে এক অথবা জোড়ায় জোড়ায় বিচরণ করে

সে কথা কোনদিনই জানা সম্ভব হবে না। কারণ, এতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনার স্রোত একটা প্রহসনমূলক নাটকের সূচনা করছিল — আচম্বিতে ঘটনাচক্রের দ্রুত পরিবর্তন সেই প্রহসনকে রূপান্তরিত করল এক বিয়োগান্ত নাটকের রক্তাক্ত দৃশ্যে!

এই ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের জন্য দায়ী হচ্ছে একটি প্রকান্ড বন্য মহিষ। যে দলটাকে আস্তিলিও অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, এই জন্তুটা সেই দলভুক্ত নয়— একটা দলছাড়া মহিষের একক উপস্থিতি সমস্ত ঘটনা স্রোতকে বদলে দিয়েছিল।

মহম্মদ তখনও ঘোড়ার পিঠে দৃশ্যমান, আস্তিলিও প্রাণপণে চেঁচিয়ে তাকে ফিরে আসতে বলছেন— হঠাৎ ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করে আস্তিলিওর থেকে প্রায় তিনশ ফুট দূরে আর্বিভূত হল এক কৃষ্ণকায় বিপুলবপু বন্য মহিষ! জন্তুটা ঝড়ের বেগে ধেয়ে এল মহম্মদ আলির বাহন আরবী ঘোড়াটার দিকে!

'সাবধান! চেয়ে দেখ— সামনে বিপদ।' চেঁচিয়ে মহম্মদকে সাবধান করে দিলেন আস্তিলিও, পরক্ষণেই ছুটলেন তাঁবুর ভিতর থেকে রাইফেল হস্তগত করার জন্য।

মুহূর্তে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এলেন আস্তিলিও। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে— প্রচণ্ড সংঘর্ষে মিলিত হল মহিষ ও ঘোটক! আস্তিলিও দেখলেন মহিষের শিং ঘোড়ার বুকের ভিতরে ঢুকে গেছে! পরক্ষণেই ঘোড়াটাকে শিং বিঁধিয়ে শূন্যে তুলে ফেলেছে মহিষ এবং দারুণ যাতনায় মহিষের মাথার উপর ঘোড়া ছটপট করছে!

মহম্মদ আলি ছিটকে পড়েছিল কয়েক গজ দূরে। ছুটে পালানোর জন্য সে তাড়াতাড়ি ভূমিশয্যা ত্যাগ করার চেষ্টা করল— কিন্তু সে উঠে দাঁড়ানোর আগেই মহিষ তাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল! ঘোড়াটা তখনও মহিষের মাথার উপর শৃঙ্গাঘাতে বিদ্ধ অবস্থায় ছটপট করছিল, কিন্তু ঘোটকের দেহভার মহিষাসুরের গতিরোধ করতে পারল না— সে এসে পড়ল ভূপতিত মহম্মদ আলির দেহের উপর।

ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন আস্তিলিও; অভ্যস্ত আঙ্গুলের স্পর্শে রাইফেলের বুলেট মহিষের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। আস্তিলিও দৌড়ে এলেন আবদ্ধ জন্তু দুটির দিকে। ঘোড়াটা অসহ্য যাতনায় ছটপট করছিল। আস্তিলিওর রাইফেল তার মৃত্যুকে সহজ করে দিল। মহিষের দেহে প্রাণ ছিল না, গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা গেছে।

মহম্মদের অবস্থা খুবই শোচনীয়— মহিষ আর ঘোড়া জড়াজড়ি করে তার উপরই পড়েছে, দুটি বিশাল দেহের নীচে পিষ্ট হয়ে সে এখন মৃত্যুপথের যাত্রী। শিং দুটো মস্ত বড়, প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বলে উঠল মহম্মদ, 'যেমন...যেমন...আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম'... তার কণ্ঠরুদ্ধ হল, কালো গোঁফ দুটির নীচে রক্তমাখা দাড়ির ভিতর থেকে যে হাসিটা ফুটে উঠেছিল, সেই হাসির রেখা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল মৃত্যুর স্পর্শে —হাসতে হাসতেই মৃত্যুবরণ করল মহম্মদ আলি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মহিষ

পূর্বোক্ত ঘটনার পর থেকেই মহিষ সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ পোষণ করতেন আস্তিলিও গত্তি।

একাধিক পুস্তকে মহিষ-বিষয়ক তথ্য পাঠ করে আস্তিলিও জেনেছিলেন ঐ জন্তুটি আক্রান্ত না হলে অথবা প্ররোচিত না হলে বিনা কারণে কখনও মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু মহম্মদ আলি ও তার বাহন আরবী ঘোড়াটার মৃত্যু দেখে আস্তিলিও বুঝেছিলেন কেতাবে লিখিত তথ্য আংশিক সত্য হলেও হতে পারে, সর্বাংশে সত্য কখনই নয়। এইখানে আফ্রিকার মহিষ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। মহিষগোষ্ঠীর কোনও জন্তুকেই নিরীহ বলা চলে না, মহিষ মাত্রেই ভয়ঙ্কর জীব!

গৃহপালিত মহিষও উত্তেজিত হয়ে মানুষের প্রাণহরণ করেছে এমন ঘটনা খুব বিরল নয়। মহিষগোষ্ঠীর বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর জীব অফ্রিকার 'কেপ বাফেলো'। লেপার্ড, হায়না প্রভৃতি মাংসাশী জানোয়ার কখনও কেপ বাফেলোর ধারে কাছে আসে না। স্বয়ং পশুরাজ সিংহও পূর্ণবয়স্ক কেপ বাফেলোর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অনিচ্ছুক —ক্রোধ আত্মহারা না হলে সিংহ কখনই মহিষের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয় না। রুদ্রমূর্তি মহিষকে দেখে সিংহ চম্পট দিয়েছে এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়।

মহিষ পরিবারের সকল পশুরই প্রধান অস্ত্র শিং আর খুর। কেপ বাফেলো নামক আফ্রিকার অতিকায় মহিষও ঐ দুটি মহাস্ত্রে বঞ্চিত নয়; উপরন্তু তার মাথার উপর থাকে পুরু হাড়ের দুর্ভেদ্য আবরণ— শিরস্ত্রাণের মতো মাথার উপর দৃশ্যমান ঐ কঠিন অস্থি-আবরণ ভেদ করে শ্বাপদের নখদন্ত কিংবা রাইফেলের বুলেট মস্তিষ্কে আঘাত হানতে পারে না। ঐ অস্থি-আবরণের ইংরেজি নাম 'বস্ অব দি হর্নস' ; সংক্ষেপে 'বস্'। বস্-এর দুদিকে অবস্থিত শিং-এর দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩৬ ইঞ্চি থেকে ৪৫ ইঞ্চি। তবে ৫৬১/৪ ইঞ্চি লম্বা শিংও দেখা গেছে। পূর্বোক্ত মহিষের আয়ু তিরিশ বছর, কিংবা আর একটু বেশী। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত বলশালী তরুণ মহিষদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে অনেক সময় প্রাচীন মহিষরা দল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দলছাড়া মহিষ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করে এবং সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করে। নিঃসঙ্গ পুরুষ মহিষ সবচেয়ে বিপজ্জনক জানোয়ার। মহম্মদকে হত্যা করেছিল ঐ রকম একটি নিঃসঙ্গ ভয়ঙ্কর গুণ্ডা মহিষ।

আফ্রিকাবাসী মহিষদের মধ্যে 'কেপ বাফেলো' নামক জন্তুটি সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে, কিন্তু আরও দুই জাতের মহিষ আফ্রিকাতে দেখা যায়। 'গ্যামা' নামে একরকম মহিষজাতীয় জানোয়ার আরব দেশে চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া আছে 'বনগরু' বা 'পিগমি বাফেলো'। কেপ বাফেলোর কাঁধ মাটি থেকে পাঁচ ফুট কিংবা আর-একটু বেশী উঁচু হয়, কিন্তু পিগমি বাফেলোর কাঁধের উচ্চতা মাটি থেকে মাত্র তিন ফুট; তার শিং ধারালো তবে ছোট এবং দেহের রং তার অতিকায় জ্ঞাতিভাইয়ের মতো কৃষ্ণবর্ণ নয়— রক্তাভ-পীত বর্ণে রঞ্জিত ঘন রোমশ দেহ নিয়ে এক অথবা জোড়ায় জোড়ায় বিচরণ করে

খর্বকায় মহিষ। কেপ বাফেলোর মতো দলবদ্ধ হয়ে পিগমি বাফেলো বা বনগরু কখনও বাস করে না।

আকারে ছোট হলেও ঐ মহিষগুলো যে কতখানি শক্তি, সাহস ও ক্ষিপ্রতার অধিকারী হয়, নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে তা বোঝা যাবে।

বেলজিয়ান কঙ্গোর জঙ্গলে আন্তিলিও সাহেব একবার একটা 'ওকাপি'কে জ্যান্ত অবস্থায় ধরার চেষ্টা করেন। 'ওকাপি' হচ্ছে নিরামিষভোজী দুষ্প্রাপ্য পশু। একটা ওকাপিকে জীবন্ত অবস্থায় ধরার জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছিলেন আন্তিলিও— হঠাৎ একদিন সৌভাগ্যক্রমে 'মাম্বুটি' পিগমি জাতির নিগ্রো পথপ্রদর্শকরা একটা ওকাপিকে ঘেরাও করে ফেলল। ওকাপির পদচিহ্নের কাছেই বনগরু বা খর্বকায় মহিষের টাটকা পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন আন্তিলিও। কিন্তু ওকাপির জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন বলে তাড়াহুড়োর মধ্যে তিনি পিগমিদের কাছে খর্বকায় মহিষ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেননি।

খুব মনোযোগের সঙ্গে ওকাপিকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলল। একটা বৃহৎ বৃত্তের আকার নিয়ে গোল হয়ে অবস্থান করছিল সবাই, মাঝখানে ওকাপিকে লক্ষ্য করে সেই চলন্ত মনুষ্যবৃত্তের পরিধি ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসতে লাগল... আচম্বিতে সবুজ উদ্ভিদের জাল ভেদ করে দুটি রক্তাভ বিদ্যুৎ ঝলকের প্রচণ্ড আবির্ভাব! কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড সংঘাতে ওকাপি-শিকারীরা চতুর্দিকে ছিটকে পড়তে লাগল, আন্তিলিওর মাথা থেকে উড়ে গেল হেলমেট আর হাত থেকে বেরিয়ে গেল রাইফেল— এক মুহূর্তের জন্য আন্তিলিও অনুভব করলেন তাঁর পায়ের তলা থেকে সরে গেছে মাটি এবং দেহ হয়েছে শূন্যপথে উড্ডীয়মান— পরক্ষণেই মৃত্তিকার কঠিন স্পর্শ আর চোখের সামনে সর্ষেফুল!

হৈ হৈ, চিৎকার, ধুন্ধুমার— যাচ্ছেতাই ব্যাপার!

দুটো বেঁটে বেঁটে মহিষ ধাঁ করে মানুষের ব্যূহ ভেদ করে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো অন্তর্ধান করল। সেই সঙ্গে পালিয়ে গেল আন্তিলিও সাহেবের এত সাধের ওকাপি!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মূল্যবান উপদেশ

খর্বকায় বামন মহিষের ধাক্কা খেয়ে নাস্তানাবুদ হওয়ার কয়েকদিন পরেই এক ইংরেজ-শিকারীর সঙ্গে হঠাৎ আন্তিলিওর আলাপ হয়ে গেল। ঐ ইংরেজ শিকারীটি সারা জীবন ধরে আফ্রিকাতে বন্য মহিষের গতিবিধি লক্ষ্য করেছে, বহু মহিষ শিকার করেছে এবং তার ফলে মহিষ চরিত্র সম্বন্ধে সে হয়ে উঠেছে রীতিমতো বিশেষজ্ঞ। 'ইরামা' নামক স্থানে একটি দোকান থেকে শ্বেতাঙ্গরা জিনিসপত্র কিনতেন— আমাদের আন্তিলিও সাহেব একদিন ঐ দোকানে উপস্থিত হলেন কয়েকটা প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করার জন্য। পূর্বে উল্লিখিত ইংরেজ শিকারীও একই উদ্দেশ্যে সেই সময়ে দোকানে উপস্থিত হয়েছিল!

ছোট 'বুশ ব্লাউজ' ও 'সর্ট' পরিহিত আন্তিলিওর অনাবৃত বাহু ও পায়ের বিভিন্ন স্থানে

আঘাতজনিত কালশিরার চিহ্ন দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল দোকানদার। তাকে সংক্ষেপে ওকাপি ও খর্বকায় মহিষ-ঘটিত দুর্ঘটনার কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করে দিলেন আন্তিলিও, তারপর টিনে বন্ধ শুষ্ক আনাজ ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু 'মহিষ' শব্দটি কানে যাওয়ামাত্র আগন্তুক ইংরেজ আন্তিলিওর দিকে ছুটে এল।

লোকটির কথাবার্তায় তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার চিহ্ন দেখে আন্তিলিও বুঝলেন, সে তাঁকে নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর শিকারী মনে করেছে। তিনি গরম হয়ে উঠলেন এবং শিকারী জীবনের কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, আন্তিলিও গত্তি নিতান্ত সাধারণ মানুষ নয়। লোকটি তখন তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং আবিষ্কৃত তথ্য নিয়ে কথা কইতে শুরু করল। বেশ কয়েক ঘন্টা পরে আন্তিলিও যখন তার সান্নিধ্য থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হলেন, তখন মূল্যবান সময়ের অপচয় হওয়ার জন্য তিনি মনে মনে বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আন্তিলিও উপলব্ধি করেছিলেন ইরামার এক অখ্যাত দোকানে দাঁড়িয়ে অজ্ঞাতনামা এক ইংরেজ-শিকারীর কাছ থেকে মহিষ-চরিত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ করেছিলেন বলেই তিনি সময়কালে কর্তব্য স্থির করে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মহিষ-প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলেছিল ঐ ইংরেজ শিকারী। সুদীর্ঘ শিকারী জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে সে জানতে পেরেছিল আক্রমণ-উদ্যত ক্ষিপ্ত মহিষকে বাধা দিতে পারে প্রশস্ত নদী, আগুনের জ্বলন্ত প্রতিবন্ধক এবং—

এবং মানুষের মৃতদেহ!

কথাটা শুনতে খুবই অদ্ভুত বটে, ইংরেজ শিকারী দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিল, মৃতদেহের উপর মহিষ কখনও আক্রমণ চালায় না— সে মৃতদেহ লক্ষ্য করে ছুটে আসবে, কিন্তু সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে— কিছুতেই মরা মানুষকে স্পর্শ করবে না। দূরে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার তেড়ে এসে থমকে দাঁড়াবে, —এমনি করে বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার পর এক সময়ে প্রস্থান করবে মহিষ। আন্তিলিওর হঠাৎ-পাওয়া নতুন বন্ধু বলেছিল, 'যে মুহূর্তে মহিষ দেখবে মানুষটা নড়াচড়া না করে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে, সেই মুহূর্তেই সে ধরে নেবে ওটা মৃতদেহ আর তৎক্ষণাৎ সে থেমে যাবে।'

'কিন্তু', আন্তিলিও প্রতিবাদ করেছিলেন, 'মহিষ দেখবে কেমন করে? অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি যে সব জানোয়ার শিং দিয়ে আঘাত করে, তারা তো চোখ বন্ধ করে আঘাত হানতে অভ্যস্ত।'

'বাঃ! বেশ বলেছ!' বিজয়গর্বে হুঙ্কার দিয়ে উঠল ইংরেজ-শিকারী, 'এতদিন আফ্রিকাতে থেকে তুমি এই কথা বললে? তাহলে কি জানলে ঘোড়ার ডিম! মহিষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা উঁচু রেখে শত্রুকে লক্ষ্য করে —এই বৈশিষ্ট্যের কথা কি তোমার কিছুই জানা নেই!'

তাই তো! ঠিক কথা! এইবার আন্তিলিওর মনে পড়ল তাঁর সঙ্গীর মৃত্যুকালীন ঘটনা— ঘোড়াটাকে শিং দিয়ে আঘাত করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মহিষ মাথা উঁচু রেখেছিল, সামনে এসে একবারই সে মাথা নামিয়েছিল চরম আঘাত করার জন্য।

'বাঃ! বেশ বলেছ!' সুযোগ পেয়ে আবার বিদ্রূপ করল ইংরেজ-শিকারী, 'আঘাত

করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মহিষ তার মাথা উঁচু করে রাখে, কারণ ঐ জন্তুটা হচ্ছে পয়লা নম্বরের শয়তান। সে জানে মাথা উঁচু করলে খুলির উপর বসানো পাথরের মতো শক্ত হাড়ের 'বস্' তার মস্তিষ্ক ও কপালকে শত্রুর আক্রমণ থেকে সবচেয়ে ভালভাবে রক্ষা করতে পারে, তবু সে মাথা উঁচু করে রাখে। কেন জানো? কারণ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহিষ তার শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে অব্যর্থ সন্ধানে আঘাত হানতে চায়। আর সেইজন্যই সে মাথা তুলে শত্রুকে দেখতে থাকে, অন্যান্য শিংওয়ালা জন্তুর মতো চোখ মুদে আক্রমণ করে না। মহিষের সামনে যদি কখনও যাও, তবে এই কথাগুলো মনে রাখবে, কখনও ভুলবে না।'

ইংরেজ-শিকারীর উপদেশ আন্তিলিওর মনে গেঁথে বসে গিয়েছিল। অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় অকস্মাৎ অবচেতন মনের গহন অন্তস্থল থেকে ঐ কথাগুলো ভেসে এসেছিল তাঁর স্মৃতির দরজায় এবং সেই জন্যই নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন আন্তিলিও সাহেব।

কিন্তু যে আধ-পাগলা ইংরেজ সারাজীবন ধরে মহিষ-চরিত্র নিয়ে গবেষণা করে ঐ জন্তু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়েছিল, সেই মানুষটা তার নিজের কথাগুলোই একদিন ভুলে গেল। একবারই ভুল করেছিল ইংরেজ-শিকারী, কিন্তু ভ্রম-সংশোধনের সুযোগ সে আর পায়নি। আন্তিলিওর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কয়েক মাস পরেই একটি আহত মহিষের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ইংরেজ-শিকারী প্রাণ হারিয়েছিল!

উক্ত ইংরেজ যেখানে মারা যায়, সেই জায়গাটা হচ্ছে 'অ্যাংকোলে' নামক নিগ্রো জাতির বাসস্থান। ইংরেজ শিকারীর আরও একটি কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছিলেন আন্তিলিও। ঐ অঞ্চলেই এবং সেই প্রমাণটা যে উপস্থিত করেছিল সে শ্বেতাঙ্গ নয়— জনৈক কৃষ্ণকায় অ্যাংকোলে-শিকারী।

মানুষ যে ঠাণ্ডা মাথায় কতখানি সাহসের পরিচয় দিতে পারে, স্নায়ুর উপর তার সংযম যে কত প্রবল হতে পারে, তা দেখেছিলেন আন্তিলিও— ধনুর্বাণধারী এক অ্যাংকোলে শিকারীর বীরত্ব তাঁকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রাণ নিয়ে খেলা

বেলজিয়ান কঙ্গোর যে অঞ্চলে অ্যাংকোলে জাতি বাস করে, সেই জায়গাটা প্রধানত বন্য মহিষের বাসভূমি। বামন মহিষ নয়, অতিকায় মহিষাসুর কেপ বাফেলোর ভয়াবহ উপস্থিতি ঐ অঞ্চলের অরণ্যকে করে তুলেছে বিপজ্জনক। অ্যাংকোলে নিগ্রোদের ভাষায় অতিকায় মহিষের নাম 'জোবি'। স্থানীয় মানুষ অর্থাৎ অ্যাংকোলে জাতির নিগ্রোরা খুব লম্বা-চওড়া নয়— বেঁটে-খাটো, রোগা ও অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির এই মানুষগুলোকে দেখলে অপরিচিত বিদেশীর পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয় যে, প্রয়োজন হলে ঐ ছোটখাটো মানুষগুলো কতখানি দুঃসাহসের পরিচয় দিতে পারে। আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে নিগ্রোরা ফাঁদ পেতে অথবা মহিষের

চলার পথে গর্ত খুঁড়ে মহিষ শিকারের চেষ্টা করে, কিন্তু অ্যাংকোলে-শিকারী অমন নিরাপদ পন্থায় শিকারকে ঘায়েল করার পক্ষপাতী নয়। কোন্ বিস্মৃত যুগে অ্যাংকোলে জাতির এক পূর্বপুরুষ আবিষ্কার করেছিল মহিষ চরিত্রের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য— মরা মানুষকে মহিষ আঘাত করে না! তারপর থেকেই যুগযুগান্তর ধরে অ্যাংকোলে-শিকারীরা যে পদ্ধতিতে মহিষ শিকার করে থাকে, সেই বিপজ্জনক পদ্ধতির অনুসরণ করার সাহস অন্য কোনও জাতিরই নেই। আন্তিলিও সাহেব একবার অ্যাংকোলে জাতির মহিষ-শিকারের কায়দা দেখেছিলেন। সমস্ত ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখার পর আন্তিলিও বলেছিলেন সাদা কিংবা কালো চামড়ার অন্য কোনও জাতির শিকারী ঐভাবে অপঘাত মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে সাহস করবে না। তাঁর নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আন্তিলিও জানিয়েছিলেন, পৃথিবীর সেরা লক্ষ্যভেদী শিকারী যদি কাছেই রাইফেল বাগিয়ে বসে থাকে, তাহলেও অ্যাংকোলে-জাতির পদ্ধতিতে মহিষ শিকার করতে তিনি রাজি নন।

ঘটনাটা এইবার বলছি।

একটি ছোট-খাটো চেহারার অ্যাংকোলে-নিগ্রো আন্তিলিওকে তাদের মহিষ-শিকারের পদ্ধতি দেখাতে রাজি হয়েছিল। অবশ্য লোকটি আগে আন্তিলিওর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল যে, কোনও কারণেই তিনি উক্ত শিকারীকে বাধা দিতে পারবেন না এবং শোচনীয় দুর্ঘটনার সম্ভবনা দেখলেও গুলি চালাতে পারবেন না। একটা উঁচু গাছের উপর আন্তিলিও যখন বসলেন, তখনই অ্যাংকোলে-শিকারী তার কর্তব্যে মনোনিবেশ করল।

মুক্ত প্রান্তরের উপর এখানে ওখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ছোট ছোট হলুদ রঙের ঘাসঝোপ! ঐরকম একটি ঘাস ঝোপের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটি। অস্ত্রের মধ্যে তার সঙ্গে ছিল তীর-ধনুক আর একটা ছোট ছুরি।

গাছের উপর থেকে খুব মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে আন্তিলিও আবিষ্কার করলেন দূর প্রান্তরের সীমানায় যেখানে এক সারি সবুজ ঘাস আত্মপ্রকাশ করেছে সেইখানে বিচরণ করছে অনেকগুলো কৃষ্ণকায় চতুষ্পদ মূর্তি— মহিষ!

প্রান্তরের বুকে তৃণভোজনে ব্যস্ত মহিষযূথের পিছনে বাঁদিকে অবস্থান করছে এক ভীষণ দর্শন পুরুষ মহিষ। আন্তিলিও বুঝলেন ঐ জন্তুটাই হচ্ছে দলের প্রহরী এবং আংকোলে-শিকারীর লক্ষ্যস্থল 'জোবি'— ওকেই হত্যা করার চেষ্টা করছে ছোটখাট মানুষটি!

গাছের উপর থেকে আন্তিলিও দেখলেন ঘাসঝোপের ভিতর থেকে হঠাৎ মহিষের খুব কাছে কাছেই আবির্ভূত হল একটি মনুষ্যমূর্তি।

লোকটি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, গাছের উপর থেকে তার শরীরটা আন্তিলিওর দৃষ্টিগোচর হলেও মাটিতে দাঁড়িয়ে মহিষের পক্ষে লোকটিকে দেখা সম্ভব ছিল না। লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে চটপট ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করে মাটির উপর শুয়ে পড়ল। ধনুকের টংকার-শব্দ আন্তিলিওর কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সংঘাতের আওয়াজ এবং জান্তব কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি— মহিষের স্কন্ধে বিদ্ধ হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে একটা তীর।

'সর্বনাশ', আন্তিলিও মনে মনে বললেন, 'এইবার তীর-বিদ্ধ মহিষ হাঁক দিয়ে দলকে

সংকেত জানাবে। সেই শব্দ শোনামাত্র মহিষের দলটা ছুটে আসবে অ্যাংকোলে-শিকারীর দিকে।

সেরকম কিছু হল না। আহত মহিষ একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করল, বিরক্তভাবে দু একবার মাথা নাড়ল, মনে হল একটা বিরক্তিকর মাছিকে সে তাড়াতে চেষ্টা করছে— তারপর চারদিকে সঞ্চালিত করল তীক্ষ্ণদৃষ্টি, —যেন এক গোপন শত্রুকে সে আবিষ্কার করতে চাইছে!.....

উদ্বেগজনক কয়েকটি মুহূর্ত..... মহিষযূথ সরে যাচ্ছে দূরে... তীরবিদ্ধ মহিষ সঙ্গীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। সে এখনও বুঝতে পারছে না সঙ্গীদের অনুসরণ করা উচিত, না, তাদের ফিরে আসার জন্য হাঁক দেওয়া উচিত। মহিষ মনস্থির করার সময় পেল না, অ্যাংকোলে-শিকারী তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে অবার তীর ছুড়ঁল, তারপর শুয়ে পড়ল মাটিতে। দ্বিতীয় তীরটা ঘাড়ের উপর বিঁধতেই ক্ষেপে গেল মহিষ। লোকটিকে সে দেখতে পায় নি কিন্তু তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ছে ধনুকের অস্পষ্ট টংকারধ্বনি— শব্দের দিক্ নির্ণয় করতেও মহিষের ভুল হল না।

যেদিক থেকে ধনুকের শব্দ এসেছে সেই দিকেই ছুটল মহিষ— কিন্তু সোজা নয়— বৃত্তের আকারে গোল হয়ে ঘুরে এল জন্তুটা, সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাতাস থেকে শত্রুর গায়ের গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। আন্তিলিও যে গাছটার উপর আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই গাছ আর শায়িত নিগ্রো শিকারীর মধ্যবর্তী স্থানের মাঝামাঝি এসে মহিষ বোধহয় মানুষের গায়ের গন্ধ পেল, সে থমকে দাঁড়াল, বারবার বাতাসে ঘ্রাণ গ্রহণ করল— তারপর আবার কয়েক পা এগিয়ে এসে বাতাস শুঁকতে লাগ.... অবশেষে মানুষটাকে সে আবিষ্কার করে ফেলল! ঠিক যে জায়গায় নিগ্রো শিকারী শুয়ে ছিল, সেই দিকেই ছুটল মহিষ। দিক্ নির্ণয়ে তার একটুও ভুল হয়নি, পদভরে মাটি কাঁপিয়ে সে ধেয়ে এল উল্কা বেগে!

গাছের উপর থেকে আন্তিলিওর মনে হল ধরাশায়ী মানুষটার উপর এসে পড়েছে একজোড়া প্রকাণ্ড শিং, এই বুঝি হতভাগ্য শিকারীকে মাটিতে গেঁথে দেয় একজোড়া জান্তব তরবারি— কিন্তু সেই রক্তাক্ত দৃশ্যে আন্তিলিওর চোখ দুটি পীড়াগ্রস্ত হওয়ার আগেই অকুস্থল থেকে একটা ধুলোর মেঘ লাফিয়ে উঠে তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করল। একটু পরেই জোর বাতাসের ধাক্কায় সরে গেল ধূলো। আন্তিলিও দেখলেন অ্যাংকোলে-শিকারী অক্ষত অবস্থায় মাটিতে, আর তার সামনেই থমকে দাঁড়িয়ে মহিষ। জন্তুটা অস্থিরভাবে মাটিতে পদাঘাত করছে এবং তার নাসিকা ও কণ্ঠ থেকে উদ্গীর্ণ হচ্ছে অবরুদ্ধ রোষের ভয়াবহ ধ্বনি!.....

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : একটি নির্বিকার মানুষ

'যাক্ বাঁচা গেল!' আন্তিলিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলেন মহিষ পিছন ফিরল। কিন্তু না, —অত সহজে রেহাই দিল না যমদূত— ক্ষণিকের জন্য লাফিয়ে সরে গিয়েছিল মহিষ, তৎক্ষণাৎ ঘুরে এসে আবার মানুষটাকে পরীক্ষা করতে লাগল সে।

লোকটি একটুও নড়ছে না, তার ধরাশায়ী দেহে কোথাও জীবনের লক্ষণ নেই। তার সর্বাঙ্গে পড়ছে তপ্ত নিঃশ্বাস, কানে আসছে রক্ত-জল-করা গর্জন ধ্বনি, খুরের আঘাতে কাঁপছে চার পাশের মাটি— তবু অ্যাংকোলে শিকারীর দেহ নিস্পন্দ, নিশ্চল!

আন্তিলিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন নিজের উপর কতখানি কর্তৃত্ব থাকলে ঐ অবস্থায় মড়ার ভাণ করে পড়ে থাকা যায়!......

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পর মহিষ ফিরে গেল। লোকটি তখনও ধরাশয্যা ত্যাগ করার চেষ্টা করল না। ভালই করল, কারণ— একটু দূরে গিয়েই আবার ফিরল মহিষ। আগের মতোই শায়িত মনুষ্যদেহের চারপাশে চলল মহিষাসুরের আস্ফালন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তারপর আবার পিছন ফিরে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করল জন্তুটা।

আন্তিলিওর সর্বাঙ্গ দিয়ে তখন ঘাম ছুটছে। তিনি এতক্ষণে বুঝেছেন কেন অ্যাংকোলে-জাতি এমন বিপজ্জনক পদ্ধতিতে মহিষ শিকার করে। তীরের বিষ মহিষের দেহে প্রবেশ করার অনেক পরে তার মৃত্যু হয়। একশ ফুটের বেশী দূর থেকে তীর ছুঁড়ে মহিষকে কাবু করা সম্ভব নয়— কারণ, দূরত্ব খুব বেশী হলে নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাত করার ক্ষমতা কমে যায়। একশ ফুটের মধ্যে গাছে উঠে মহিষকে আঘাত করাও অসম্ভব— তীরের নাগালের মধ্যে আসার আগেই মহিষের দৃষ্টি বৃক্ষে উপবিষ্ট শিকারীর দিকে আকৃষ্ট হবে এবং তৎক্ষণাৎ সে সবেগে স্থান ত্যাগ করবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। মাটিতে দাঁড়িয়ে কোনও গোপন স্থান থেকে মহিষকে তীরবিদ্ধ করলে শিকারীর মৃত্যু অনিবার্য— মহিষের তিনটি ইন্দ্রিয়ই শক্তিশালী! চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার ত্র্যহস্পর্শ যোগে মহিষ চটপট শিকারীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তার দিকে ধাবিত হবে এবং তীরের বিষ মহিষের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে তার মৃত্যু ঘটানোর আগেই তীক্ষ্ণ শিং আর খুরের আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত এক মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে শিকারীর দেহ। ছুটে পালানো সম্ভব নয়, দ্বিপদ ও চতুষ্পদের দৌড়-প্রতিযোগিতায় মানুষের জয়লাভের কোনও আশাই নেই।

মৃতদেহের প্রতি মহিষের অহিংস মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ না করলে অ্যাংকোলে-শিকারীর পক্ষে অন্য কোন উপায়ে মহিষমাংস সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, সেই জন্যেই ধনুর্বাণ-সম্বল অ্যাংকোলে জাতি এমন বিপজ্জনক ভাবে মহিষ শিকারে প্রবৃত্ত হয়।

আচ্ছা, এইবার কাহিনীর পূর্বসূত্র ধরে দেখা যাক আমাদের পরিচিত অ্যাংকোলে-শিকারীর ভাগ্যে কি ঘটল। মহিষ আরও কয়েকবার শিকারীর কাছে এসে ফিরে গেল— পাঁচ-পাঁচবার ঐভাবে ছুটোছুটি করার পর মহিষ যখন আরও একবার ঘুরে আসছে, সেই সময় আন্তিলিও দেখলেন জন্তুটা হঠাৎ হাঁটু পেতে বসে পড়ল— তারপর এক ডিগবাজি খেয়ে সশব্দে শয্যাগ্রহণ করল মাটির উপর, আর উঠল না।

আত্তিলিও বুঝলেন মহিষের মৃত্যু হল ; এতক্ষণ পরে কার্যকরী হয়েছে তীরের বিষ !

মহিষের মৃতদেহ থেকে প্রায় পনের ফুট দূরে শায়িত একটা নিশ্চল মনুষ্যমূর্তি হঠাৎ সচল হয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর দূরবর্তী মহিষযূথের প্রস্থান পথের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সর্বাঙ্গ থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলল এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো টান করে আড়ষ্টভাব কাটিয়ে নিয়ে বাঁ হাতে আটকানো খাপ থেকে ছুরিটা টেনে নিল। বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর একবার ছুরির ধার পরখ করে নিয়ে অ্যাংকোলে-শিকারী তার পরবর্তী কর্মসূচী অনুসরণ করতে উদ্যত হল......

গাছ থেকে নেমে আত্তিলিও যখন লোকটির কাছে এসে পৌঁছালেন, সে তখন অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে 'জোবির' মৃতদেহের চামড়া ছাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত। লোকটির ভাবভঙ্গি দেখে আত্তিলিওর মনে হল সে যেন খুব সহজভাবে একটা দোকানের ভিতর বসে কসাই-এর কর্তব্য করছে— তার নির্লিপ্ত আচরণ দেখে কে বলবে একটু আগেই তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল মূর্তিমান মৃত্যুদূত !

লোকটি মাথা না তুলেই আত্তিলিওর উপস্থিতি অনুভব করল। নিবিষ্টচিত্তে মৃত পশুর চামড়াতে ছুরি চালাতে চালাতে সে বলল, 'একটু পরেই আমার পরিবারের সবাই এখানে এসে পড়বে। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই ওই চমৎকার মাংস তারা নিয়ে যাবে।'

আত্তিলিও বললেন, 'কিন্তু জোবির বদলে যদি তোমার মরা শরীরটা পড়ে থাকতে দেখত, তাহলে কি হত ?'

সহজ গাম্ভীর্যের সঙ্গে অ্যাংকোলে-শিকারী উত্তর দিল, 'আমার পরিবারের লোকরা তাহলে ছেঁড়া-খোঁড়া শরীরের টুকরোগুলো নিয়ে গ্রামের পিছনে পুঁতে ফেলত। ঐখানে কোনও খারাপ প্রেতাত্মা যায় না।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ভয়াবহ পরিস্থিতি

অ্যাংকোলে-শিকারীর অদ্ভুত কৌশল ও স্নায়ুর উপর আশ্চর্য সংযম দেখে ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠেছিলেন আত্তিলিও। কতখানি মানসিক শক্তি থাকলে মানুষ নির্বিকারভাবে ঐ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে তাঁর ধারণা সেদিন খুব স্পষ্ট ছিল না।

দু' বছর পরে তিনি নিজে যখন ঐ অবস্থায় পড়লেন, তখনই বুঝতে পারলেন কি অসাধারণ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল পূর্বোক্ত ক্ষুদ্রকায় নিগ্রো শিকারী।

খুব ভেবে দেখলে অবশ্য বলতে হয় আত্তিলিওর অবস্থা নিগ্রো শিকারীর চাইতেও খারাপ ছিল— অ্যাংকোলে-শিকারী স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল এবং এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তার পেশাগত শিক্ষা আর সুদীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতির ইতিহাসও ধর্তব্য— কিন্তু আত্তিলিও সাহেব কোনদিনই বন্য মহিষের মতো বদখৎ জানোয়ারের সম্মুখীন হওয়ার

অভিলাষ পোষণ করেননি। ঘটনাচক্রের শিকার হয়ে এক অভাবনীয় বিপদের সামনে রুখে দাঁড়াতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।

যখনকার কথা বলছি সেই সময়ে আত্তিলিও গত্তি আফ্রিকার কিভু হ্রদের তীরবর্তী সাময়িক আস্তানা থেকে তৃচিবিন্দা নামক স্থানের অরণ্যে অভিযান চালানোর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁর অভিযানের লক্ষ্যবস্তু ছিল দানব-গরিলা ! ঐ জীবটির সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

দৈবক্রমে একদিন আত্তিলিওর সঙ্গে একজন বেলজিয়ামের অধিবাসীর পরিচয় হয়ে গেল। ঐ লোকটি জানাল কিভু হ্রদ আর টাঙ্গানিকা হ্রদের মধ্যবর্তী প্রান্তরে তার সঙ্গে গেলে একদল মহিষের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে পারবেন আত্তিলিও সাহেব ! গরিলা ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে সে সময় মাথা ঘামাচ্ছিলো না আত্তিলিও, কিন্তু লোকটি বলল, আড়াইশো মহিষ নিয়ে গঠিত ঐ প্রকাণ্ড দলটার ফটো তোলার কাজ চিড়িয়াখানাতে ফটো নেওয়ার মতোই সহজ। এত সহজে আড়াইশো মহিষের একটা প্রকাণ্ড দলকে তাঁর ক্যামেরাতে বন্দী করা যাবে শুনে রাজি হয়ে গেলেন আত্তিলিও।

'তুমি একটা উই-এর ঢিপি বেছে নেবে।' লোকটি বলল, 'ঐ ঢিপির পিছন থেকে ফটো তুলবে। এমন সুযোগ আর কখনও পাবে না।'

বেলজিয়ানের কথায় খুব নিশ্চিন্ত হয়ে আত্তিলিও গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা হলেন। ব্যাপারটা মোটেই বিপদ্জনক নয়, চিড়িয়াখানাতে যাওয়ার মতোই সোজা— অতএব শিকারে যাওয়ার উপযুক্ত 'বুট' পরার প্রয়োজন মনে করেন নি আত্তিলিও ; শহর অঞ্চলে যে সাধারণ জুতো পরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন সেই জুতো জোড়া পায়ে চড়িয়ে তিনি চললেন মহিষযূথের আলোকচিত্র সংগ্রহ করতে— রাইফেলটা তিনি নিয়েছিলেন নিতান্ত অভ্যাস বশে। তাঁবুর লোকজন দরকারি কাজে ব্যস্ত ছিল, তাই বাছাবাছি না করে যে নিগ্রোটিকে সামনে পেলেন তাকেই তিনি ডেকে নিলেন রাইফেলটা বহন করার জন্য। আত্তিলিও দুটো হাতই খালি রাখতে চেয়েছিলেন— লম্বা 'লেনস' আর ক্যামেরা ভালভাবে ব্যবহার করতে হলে দুই হাতই খালি রাখা দরকার। সবচেয়ে ভাল ক্যামেরাটাকেই সঙ্গে নিয়েছিলেন আত্তিলিও......

প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর বেলজিয়ান বন্ধুর নির্দেশে পথের উপর এক জায়গায় মোটরগাড়িটা থামানো হল। ঘন উদ্ভিদের জালে আচ্ছন্ন একটা সরু পথের উপর দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল বেলজিয়ান বন্ধু। লোকটি জানাল, নদীর যেখানে মহিষের দল সন্ধ্যার সময়ে জলপান করতে আসে সেই জায়গাটা সে ভালভাবেই জানে— খুব তাড়াতাড়ি চলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে সে বলল, মহিষদের আসার সময় হয়েছে, এখনই তারা এসে পড়বে।

মিনিট দশেক হাঁটার পরে সকলে এসে থামল একটা খোলা জায়গার উপর। আত্তিলিও দেখলেন প্রচণ্ড সূর্যের তাপে শুষ্ক কর্দমপিণ্ডগুলোর মধ্যবর্তী স্থানের মাটি ফেটে দেখা দিয়েছে অজস্র ফাটল। হাঁটার সময়ে ঐ ফাটলে পা পড়লেই চিৎপটাং হওয়ার সম্ভবনা। আত্তিলিও চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন— ডান দিকে প্রায় সিকি মাইল দূরে রুজিজি নদী, সামনে নাতিদীর্ঘ নলখাগড়ার নিবিড় সমাবেশ আর বাঁ দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল চোখে পড়ে

উই ঢিপির পর উই ঢিপি। 'এখানে' অসংখ্য উই ঢিপির মধ্যে একটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল বেলজিয়ান, 'ঐ জায়গাটা হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। চটপট চলে যাও, দেরি কর না।'

খুব চাপা গলায় ফিস ফিস করে কথা বলছিল বেলজিয়ান বন্ধু ; তার মতোই স্বরে আন্তিলিও জানতে চাইলেন উক্ত ব্যক্তি কোথায় অবস্থান করতে চায়।

'আমাকে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না,' লোকটি উত্তর দিল, 'কাছাকাছি থাকব।'

আন্তিলিও দেখলেন বেলজিয়ান তার নিজস্ব ভৃত্যকে নিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগল না। সমস্ত জায়গাটা খুব নির্জন অস্বস্তিকর। ফটো তোলার পরিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে সেই মুহূর্তে ফিরে যেতে পারলে খুশী হতেন আন্তিলিও। তাঁর সঙ্গী বন্দুক-বাহক নিগ্রোটির মনোভাবও বোধহয় সেইরকম— অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে লোকটি হঠাৎ কথা কইতে শুরু করল। আন্তিলিও তার একটা কথাও বুঝতে পারলেন না। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ছয়টি ভাষায় তিনি লোকটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দেখা গেল তাঁর ভাষাও লোকটির কাছে সমান দুর্বোধ্য! পর পর ছয়বার ভাষা থেকে ভাষান্তরে প্রবেশ করলেও আন্তিলিওর বক্তব্য ছিল একটি— 'ওহে বাপু দয়া করে একটু চুপ করো তো!' মুখের ভাষা না বুঝলেও তাঁর কণ্ঠস্বর আর ভাবভঙ্গি থেকে লোকটি শেষ পর্যন্ত বক্তার বক্তব্য অনুধাবন করতে সমর্থ হল। সে চুপ করল।

পরে অবশ্য আন্তিলিও জানতে পেরেছিলেন ঐ লোকটি তাঁকে একটা জরুরী সংবাদ পরিবেষণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল— দুর্ভাগ্যক্রমে তার কথা আন্তিলিও বুঝতে পারেননি, আর সেইজন্যই যথাসময়ে খবরটা শুনে সতর্ক হওয়ার সুযোগ তাঁর হল না।

খবরটা হচ্ছে এই: বেলজিয়ানের চাকরের কাছে আন্তিলিওর বন্দুক-বাহক জানতে পেরেছিল যে, তারা নদী পার হয়ে বিপরীত তীর থেকে মহিষদের উপর গুলি চালিয়ে কয়েকটা জন্তুকে হত্যা করবে বলে ঠিক করেছে। বেলজিয়ানটির কফির আবাদ আছে; সেই আবাদে নিযুক্ত মজুরদের মাংস সরবরাহ করার জন্যই মহিষ শিকারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মাঝখানে নদী থাকায় অপর পার্শ্বে অবস্থিত বেলজিয়ান-শিকারী ও তার ভৃত্যের অবস্থা দস্তুরমতো নিরাপদ! কিন্তু এপারে আর দুজন মানুষের পক্ষে ব্যাপারটা যে কতখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে সে কথা অনুমান করেই আন্তিলিওকে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করেছিল তাঁর বন্দুক-বাহক।

আন্তিলিওর পক্ষে অবশ্য নবপরিচিত বন্ধুর সদিচ্ছায় সন্দিহান হওয়া স্বাভাবিক নয়— প্রায় আড়াইশ' মহিষের মাঝখানে গুলি চালিয়ে দিলে তাদের কাছাকাছি থাকার ব্যাপারটা যে কারও কাছে চিড়িয়াখানায় যাওয়ার মতো সহজ মনে হতে পারে, এমন কথা আন্তিলিও সাহেবই বা ভাববেন কেমন করে? তিনি শুধু জানতেন মহিষের দল এখনই এসে পড়বে, অতএব একটা উই ঢিপির পিছনে আশ্রয় নেওয়া উচিত এই মুহূর্তে। দলটা এসে পড়লে আর নড়াচড়া করা সম্ভব হবে না। কয়েকশ' বন্য মহিষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন আন্তিলিও। নির্দিষ্ট উই ঢিপির পিছনে গিয়ে স্থান গ্রহণ করতে প্রায় পনের

মিনিট কেটে গেল। আন্তিলিও তাঁর 'টেলিফটোর অ্যাপারেটার' ঠিক করছেন নিবিষ্টচিত্তে— আচম্বিতে তাঁর পায়ের তলায় গুরুগম্ভীর শব্দ তুলে মাটি কাঁপতে শুরু করল। পিছন থেকে বন্দুক-বাহক নিগ্রোর অস্ফুট ভয়ার্ত স্বর আন্তিলিওর কানে এল কিন্তু তিনি পিছনে চাইলেন না, তাঁর দুই চোখের স্তম্ভিত দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হয়েছে সেইদিকে যেখানে নলখাগড়ার ঝোপ ভেদ করে খোলা মাঠের উপর আত্মপ্রকাশ করছে মহিষের দল। আন্তিলিওর মনে হল সেই চলন্ত জান্তব স্রোতের যেন বিরাম নেই— কতগুলো মহিষ আছে ওখানে?...

ভয়ঙ্কর এবং চমকপ্রদ দৃশ্যটাকে আরও জমকালো করে তুলেছে অস্তায়মান সূর্যের আলোকধারা—

মাথার উপর জ্বলছে রক্তরাঙ্গা আকাশের পট, তলায় এগিয়ে চলেছে মেঘের মতো কালো এক শরীরী অরণ্য; সেই জীবন্ত ও চলন্ত অরণ্যের মাথায় বাঁকা তলোয়ারের মতো শিং গুলোতে জ্বলে জ্বলে উঠছে রক্তলাল রবিরশ্মি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো— সঙ্গে সঙ্গে সহস্র খুরের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন কম্পিত পৃথিবী করছে ধূলি-উদ্‌গিরণ! অপূর্ব দৃশ্য!

আন্তিলিও মনে মনে তাঁর নবপরিচিত বন্ধুকে ধন্যবাদ দিলেন, সে ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে ফটো তোলা সবচেয়ে সুবিধাজনক। হাওয়ার গতি অবশ্য ভাল নয়, তবে মহিষরা যে তাঁর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারবে না, সে বিষয়ে আন্তিলিও গত্তির মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

চব্বিশটা আলোকচিত্র গ্রহণ করার পর আন্তিলিও ক্যামেরার স্বয়ংক্রিয় ম্যাগাজিন থেকে ব্যবহৃত ফিল্ম সরিয়ে নূতন ফিল্ম সংযোগ করতে সচেষ্ট হলেন। নীচু হয়ে ঐ কাজ করছিলেন তিনি। পুরানো ফিল্ম সরিয়ে নতুন ফিল্ম লাগাতে প্রায় এক মিনিট সময় লাগে। তবে আন্তিলিওর বোধহয় মিনিট খানেকের উপর আরও ত্রিশ সেকেণ্ড লেগেছিল; কারণ তাঁর পায়ের তলায় তখন জেগে উঠেছে প্রচণ্ড কম্পন— শত শত চলন্ত চতুষ্পদের পদাঘাতে মাটি কাঁপছে ভূমিকম্পের মতো!

ক্যামেরাতে নতুন ফিল্ম লাগিয়ে আন্তিলিও আবার উই ঢিপির আড়াল থেকে মুখ বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের চমক! মহিষযূথ খুব কাছে চলে এসেছে! এমন অপ্রত্যাশিত সান্নিধ্য আন্তিলিওর ভাল লাগল না। জন্তুগুলো তাঁর ডানদিক দিয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে তাদের গতিপথ একটু বদলে যাওয়ার ফলেই মহিষযূথ তাঁর কাছাকাছি এসে পড়েছে।

অবশ্য জন্তুগুলোর মধ্যে কোনও উত্তেজনা বা উগ্রতার চিহ্ন দেখা দেয়নি। তবু আন্তিলিও ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিতে পারলেন না। মুহূর্তের মধ্যে তিনি কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। মহিষের দল সোজাসুজি নদীর দিকে এগিয়ে গেলেই তিনি আবার ক্যামেরা হাতে নেবেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হচ্ছে ততক্ষণ ক্যামেরার চাইতে রাইফেলের সান্নিধ্য বেশী বাঞ্ছনীয়।

দৃষ্টি সামনে রেখে তিনি পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। শিকারীর প্রসারিত হস্তের এই ইঙ্গিত প্রত্যেক বন্দুক-বাহকের কাছেই অত্যন্ত পরিচিত— কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে

যাওয়ার পরও রাইফেলের স্পর্শ পেলেন না আন্তিলিও সাহেব। সম্মুখে চলমান ভয়ঙ্কর মিছিল থেকে চোখ ফেরানো নিরাপদ নয়, তাই চোখের দৃষ্টি যথাস্থানে রেখেই তিনি চাপা গলায় ডাকলেন— 'এই'।

ফল হল একই রকম, প্রসারিত হস্তের মতো অবরুদ্ধ কণ্ঠের ইঙ্গিতও হল ব্যর্থ— হাতে এসে পৌঁছাল না রাইফেল।

লোকটা কি গাধা নাকি? সক্রোধে দুই চোখে আগুন ছড়িয়ে পিছন ফিরলেন আন্তিলিও, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ছুটে গেল বিদ্যুৎ তরঙ্গ—

কেউ নেই পিছনে!

লোকটা যে কখন পালিয়েছে বুঝতেই পারেননি আন্তিলিও। এখন তার দ্রুত ধাবমান দেহটা তাঁর চোখে পড়ল। এর মধ্যেই সে অনেক দূর চলে গেছে, তার শরীরটা ছোট্ট দেখাচ্ছে। নদী থেকে লোকটির দূরত্ব এখন একশ গজও হবে না।

আন্তিলিও মনে মনে ভাবলেন, 'মহিষগুলো নিশ্চয়ই ওকে দেখতে পেয়েছে! সেইজন্যই তাদের গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছে!'

কিন্তু তাঁর ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে তো সমূহ বিপদ! মহিষরা যে পথ ধরে এগিয়ে আসছে, সেই পথের মাঝখানেই তো রয়েছেন তিনি— একটু পরেই তো আড়াইশ' মহিষের দল এসে পড়বে তাঁর উপর! এখন উপায়!

বন্দুক-বাহক নদীর ধার থেকে একবার আন্তিলিওর দিকে তাকাল, হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল রাইফেলটা সে ঐখানেই রেখে দিয়েছে— তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর মধ্যে। জল ছিটকে উঠল, আর তাকে দেখা গেল না।

আন্তিলিও এইবার মহিষযূথের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন! তারা এগিয়ে আসছে একই ভাবে, তবে তাদের গতিবেগ বর্ধিত হয়নি, বেশ হেলে-দুলে সহজভাবেই এগিয়ে আসছে তারা।

একটি লোককে ছুটতে দেখেও যখন তারা উত্তেজিত হয়নি, তখন আর একটি লোকের ধাবমান শরীরও বোধহয় তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে না— ভাবলেন আন্তিলিও।

দূরত্বটা চোখ দিয়ে মেপে নিলেন তিনি— 'নিতান্তই যদি তেড়ে আসে তাহলেও আমাকে ওরা ধরে ফেলার আগেই আমি রাইফেলটার কাছে গিয়ে পড়ব।'

সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি ছুটতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ— পর পর তিনবার। আন্তিলিও ভাবলেন তাঁর বেলজিয়ান বন্ধু বন্দুকের শব্দে মহিষগুলোর দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট করে তাঁকে সাহায্য করতে চাইছে। কথাটা ভাবতেই তাঁর মনের জোর বাড়ল, আরও জোরে পা চালিয়ে ছুটতে লাগলেন তিনি।

আবার বন্দুকের শব্দ। ডান পায়ের গোড়ালিতে অসহ্য যন্ত্রণা। ছিটকে পড়লেন আন্তিলিও। ক্যামেরাটা দারুণ জোরে তাঁর বুকে আঘাত করল। মাটিতে আছাড় খেয়ে ভ্রূ থেকে ঝরতে লাগল রক্তের ধারা। একবার উঠতে চেষ্টা করলেন আন্তিলিও। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে

পারলেন ব্যাপারটা কি হয়েছে। আন্তিলিও ভেবেছিলেন তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে, কিন্তু না, তা নয়— পাথরের মত শক্ত মাটির ফাটলে তাঁর পা আটকে গেছে। ফাটলের গ্রাস থেকে পা টেনে বার করলেন আন্তিলিও। পা মচকে গেছে ভীষণভাবে, গোড়ালির হাড় ভেঙ্গে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। মহিষের দল ওদিকে ভীষণ উত্তেজিত। গুলি খেয়ে কয়েকটা জন্তু মারা পড়েছে। সমস্ত দলটা এখন আন্তিলিওর দিকেই ছুটে আসছে।

একবার পা ফেলার চেষ্টা করেই থেমে গেলেন আন্তিলিও। নদী সামনে, একটি দৌড় দিলেই তিনি নিরাপদ—

কিন্তু দৌড়ানো তো দূরের কথা সহজভাবে হেঁটে চলার ক্ষমতাও তাঁর নেই।

সেই মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ল অ্যাংকোলে-শিকারীর কথা। মড়ার ভাণ করে পড়ে থেকে সেই লোকটি মহিষকে ফাঁকি দিয়েছিল। অতি দুঃখে আন্তিলিওর হাসি এল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর, সর্বশরীর কাঁপছে থর থর করে— মৃতদেহের অভিনয় করার এইটাই তো উপযুক্ত সময়!

অ্যাংকোলেকে পরীক্ষা করেছিল একটি মহিষ, তাঁকে পরীক্ষা করতে আসবে আড়াইশ' মহিষের বিপুল বাহিনী।

নাঃ অসম্ভব, আন্তিলিওর পক্ষে মড়ার ভাণ করে এই চতুষ্পদ মৃত্যুদূতদের ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর সুপ্তচেতনা ভেদ করে জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারে আঘাত করল এক আধপাগলা ইংরেজ শিকারীর কণ্ঠস্বর— 'মনে রেখ, ওরা মাথা তুলে রাখে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওরা মাথা তুলে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে'.....

হ্যাঁ, উপায় আছে! একটি মাত্র পন্থা অবলম্বন করলে হয়তো যমদূতদের কবল থেকে উদ্ধারলাভ করা সম্ভব— নতুন আশায় বুক বাঁধলেন আন্তিলিও। মহিষ চরম আঘাত হানবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মাথা তুলে শত্রুকে লক্ষ্য করে; অতএব ধাবমান মহিষযূথকে যদি তিনি হঠাৎ চমকে দিতে পারেন, তবে হয়তো জন্তুগুলো তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারে।

আন্তিলিও জানতেন মহিষের চক্ষু বিবর্ধক শক্তিসম্পন্ন। তাঁর সামান্য গতিবিধি তাদের চোখে ধরা পড়বে অসামান্য দ্রুতবেগে বর্ধিত আকারে— অতএব দুই হাত নেড়ে যদি তিনি তাদের ভড়কে দিতে পারেন, তাহলে তিনি হয়তো এ যাত্রা বেঁচে যাবেন। আড়াইশো ধাবমান মহিষের সামনে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবশ্য খুবই কঠিন, কিন্তু হাত নেড়ে চিৎকার করা ছাড়া বর্তমান অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার যখন অন্য উপায় নেই, তখন উপরোক্ত বিপজ্জনক পদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণ করার সংকল্প করলেন আন্তিলিও—

এক টান মেরে মাথা থেকে তিনি খুলে ফেললেন হেলমেট, প্রস্তুত হলেন চরম মুহূর্তের জন্য....

অষ্টম পরিচ্ছেদ : শরীরী ঝটিকার গতিপথে

পায়ে পায়ে জাগছে ভূমিকম্প, শৃঙ্গে শৃঙ্গে জ্বলছে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ, ধেয়ে আসছে মূর্তিমান মৃত্যুর শরীরী ঝটিকা—

আড়াইশ' মহিষের উন্মত্ত বাহিনী!

কখন যে তারা এসে পড়েছে বুঝতে পারেননি আত্তিলিও, তিনি শুধু চিৎকার করছেন গলা ফাটিয়ে আর মাথার হেলমেট খুলে সজোরে নাড়ছেন সেটাকে— ডাইনে, বাঁয়ে, মাথার উপর— সর্বত্র! জন্তুগুলো তাঁর এত কাছে এসে পড়েছিল যে, মহিষ দলপতির খোলা চোখ দুটোকেও তিনি দেখতে পেলেন। ভাবলেশহীন নির্বিকার দৃষ্টি মেলে জন্তুটা তাঁর দিকে তাকিয়েছিল নির্নিমেষ নেত্রে। দারুণ আতঙ্কে আত্তিলিও চোখ মুদে ফেললেন, কিন্তু তাঁর হাত দুটো যন্ত্রের মতো ঘুরতে লাগল। ঐ অঙ্গ দুটি যেন তাঁর নিজস্ব নয়, হঠাৎ যেন হাতের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছেন তিনি— অদৃশ্য এক শক্তি যেন হাত দুটিকে নাড়িয়ে দিচ্ছে বারংবার!

মুদিত নেত্রে সজোরে হাত নাড়তে লাগলেন তিনি, সেই সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার। চোখে না দেখতে পেলেও তাঁর শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করতে লাগল অনেকগুলো গুরুভার দেহের প্রচণ্ড পদধ্বনি। দ্রুত ধাবমান সেই ধ্বনিতরঙ্গ তাঁর দুপাশ দিয়ে ছুটে চলেছে ডাইনে আর বাঁয়ে....অবশেষে একসময়ে আত্তিলিওর পিছনে বহু দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল বিলীয়মান শব্দের ঢেউ, দূরে অপসৃত মৃত্যুর পদধ্বনির মতো.....

যাক! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন আত্তিলিও! এই যাত্রা বেঁচে গেছেন তিনি! হাতে রাইফেল না থাকায় তিনি ভেবেছিলেন এইবার মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু বিপদ কেটে যাওয়ার পরে বুঝলেন নিরস্ত্র ছিলেন বলেই তিনি অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে অব্যাহতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। রাইফেল হাতে থাকলেই গুলি চালাতেন তিনি, 'কিন্তু লাভ কি হত? কয়েকটা জন্তু গুলি খেয়ে মারা পড়ত, তারপরই তাঁর দেহের উপর দিয়ে ছুটে যেত চতুষ্পদ জান্তব ঝটিকা— শত শত খুরের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতেন তিনি, প্রান্তরের বুকে একদা-জীবিত মনুষ্যদেহের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পড়ে থাকত দলিত, বিকৃত, রক্তাক্ত এক মাংসপিণ্ড!

মহিষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যার অমূল্য উপদেশ যথাসময়ে স্মরণে আনতে পেরে বেঁচে গেলেন আত্তিলিও, সেই ইংরেজ-শিকারী কিন্তু সময়কালে নিজের অভিজ্ঞতার কথা ভুলে গিয়ে গুলি চালিয়েছিল এবং তার ফলেই মৃত্যুবরণ করেছিল সে। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

আত্তিলিও জানতেন বর্তমানে তিনি নিরাপদ। তবে বেশীক্ষণ স্থায়ী নয় সেই নিরাপত্তা। মহিষযূথ এখনই আবার ফিরে আসবে। যেভাবে অ্যাংকোলে-শিকারীর কাছে ছয়-ছয়বার ঘুরে এসেছিল একক মহিষ 'জোবি', ঠিক সেইভাবেই তাঁর কাছে ঘুরে আসবে মহিষের দল— পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন আত্তিলিও গত্তি।

অনুমান নির্ভুল। ঘুরে এসেছিল মহিষযূথ। তবে আত্তিলিওকে তারা দেখতে পায়নি। পা

ভেঙ্গেছে কি আস্ত আছে সে বিষয়ে একটুও মাথা না ঘামিয়ে জ্বালা-যন্ত্রণা তুচ্ছ করে তিনি ছুটে ছিলেন নদীর দিকে। মহিষগুলো যখন অকুস্থলে ফিরে এসেছিল, আত্তিলিও তখন নদীতীর থেকে বন্দুক-বাহকের পরিত্যক্ত রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঝাঁপ খেয়েছেন নদীর জলে! প্রায় পাঁচ ফুট গভীর কর্দমাক্ত জলের ভিতর দিয়ে রাইফেলে ভর দিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন এবং অতি কষ্টে নদী পার হয়ে পৌঁছালেন নিরাপদ স্থানে। তীরবর্তী কাদার উপর হামাগুড়ি দিতে দিতে শক্ত জমির উপর একসময়ে এসে পড়লেন আত্তিলিও। সঙ্গে সঙ্গে একগাল হাসি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বেলজিয়ান 'বন্ধু'!

আত্তিলিওর শোচনীয় অবস্থা তার নজরেই পড়ল না। মহানন্দে চিৎকার করে সে বলে উঠল, 'কি? কেমন দেখলে? আমি তোমায় বলেছিলাম কিনা'......

আত্তিলিও সাহেবেরও অনেক কিছু বলার ছিল। বলেন নি। কারণ, কথা বলতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর স্বরযন্ত্র কিছুক্ষণ পর্যন্ত মৌনব্রত পালন করতে চায়— অতএব 'বন্ধু' সম্বন্ধে তাঁর যে ব্যক্তিগত অভিমত জানানোর জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, সেই বক্তব্যকে তিনি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন।

'আমি তোমায় বলেছিলাম কি না?' প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে বন্ধুবর বলল, 'ঠিক চিড়িয়াখানায় যাওয়ার মতোই সহজ হবে ব্যাপারটা— এখন দেখলে তো?'

'হ্যাঁ, সবই দেখলেন আত্তিলিও, সবই শুনলেন। পরে তিনি বন্ধুকে কি বলেছিলেন জানি না। কারণ, আত্তিলিও গত্তি তাঁর আত্মজীবনীতে সে সব কথা লিপিবদ্ধ করেননি। তবে বাক্‌শক্তি ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে 'বন্ধুকে' বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ এবং সেই ভাষণের ফলে উভয়ের বন্ধুত্ব খুব গাঢ় হয়েছিল বলে মনে হয় না।

সৈনিকের চতুর্থ অভিজ্ঞতা—

শত্রু

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম পরিচ্ছেদ : নূতন অভিযানের উদ্যোগ

এই কাহিনীর প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি আফ্রিকাবাসী যাবতীয় মহিষকেই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শত্রু বলে মনে করতেন। মহিষ সম্বন্ধে কম্যাণ্ডার সাহেবের এমন অদ্ভুত বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠার মূলে যে সব কার্যকারণ বর্তমান ছিল, সেই সব ঘটনার বিবরণ প্রথম খণ্ডের পাঠকদের আজানা নয়। রাইফেলে সিদ্ধহস্ত শেতাঙ্গ সৈনিক ও শৃঙ্গধারী মহাকায় মহিষের মধ্যে স্থাপিত তুলনামূলক শত্রুতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, উভয় পক্ষই আঘাত হানতে বিলক্ষণ পটু, জয়-পরাজয় নির্ভর করছিল প্রাকৃতিক পরিবেশ আর যোদ্ধাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর— অতএব এই শত্রুতা সমানে সমানে হয়েছিল বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় না। কিন্তু পরস্পরবিরোধী যে দুটি শত্রুর সংঘাতের ফলে বর্তমান কাহিনীর অবতারণা, তাদের মধ্যে এক পক্ষ ছিল দানবের মতো বিপুল দেহ ও প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী— অপর পক্ষ খর্বকায়, দুর্বল, নগণ্য ; মহাবলিষ্ঠ শত্রুর এক চপেটাঘাতেই তার মৃত্যু ছিল অনিবার্য।

অতিকায় দানব ও খর্বকায় মানবের অসম শত্রুতার ফলে ক্ষুদ্র দেহধারী বামনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে হলেও শেষ পর্যন্ত বামনই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। যে অস্ত্রের সাহায্যে এমন অসাধ্যসাধন করতে সে সমর্থ হয়েছিল, সেই অস্ত্রটি হচ্ছে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আত্তিলিও সাহেব পূর্বোক্ত দুই শত্রুর মাঝখানে এসে পড়েছিলেন নিতান্ত ঘটনাচক্রের শিকার হয়ে, রাইফেল হাতে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলাও করেছিলেন তিনি আদর্শ সৈনিকের মতো— কিন্তু এই কাহিনীর নায়ক নন আত্তিলিও গত্তি। প্রকৃত নায়কের সম্মান কাকে দেওয়া যায় সেই বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি এইবার কাহিনী শুরু করলাম সেখান থেকে, যেখানে ঠ্যাং ভেঙ্গে আত্তিলিও তাঁবুর ভিতর শয্যাগ্রহণ করেছেন।

হ্যাঁ, শয্যা না নিয়ে আর উপায় কি ? মহিষের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণের যে কি দুরবস্থা হয়েছিল সে কথা নিশ্চয়ই প্রথম খণ্ডের পাঠকদের মনে আছে। মধ্য আফ্রিকার

'বাকাভা' অঞ্চলে অবস্থিত কিভু নামক বৃহত্তম হ্রদের তীরে তাঁবুর ভিতর শুয়ে আত্তিলিও তাঁর ভাঙ্গা পা সুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন আর স্বপ্ন দেখছিলেন।

স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবশ্য অন্য লোকের কাছে খুব মনোরম লাগবে না। আত্তিলিওর স্বপ্ন যদি চোখের সামনে নিরেট দেহ নিয়ে দাঁড়ায়, তবে অধিকাংশ মানুষই যে আতঙ্কে চমকে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আত্তিলিও স্বাভাবিক মানুষ নন, বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার উদ্দেশ্যেই তিনি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাই দূরে দৃশ্যমান অরণ্যসজ্জিত পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে তিনি যে জীবটির স্বপ্ন দেখতেন, সে হচ্ছে আফ্রিকা তথা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বানরজাতীয় জীব— দানব-গরিলা।

কিভু হ্রদের অদূরে বিরাজমান ঐ পর্বতশ্রেণীর উপর হাজার হাজার বছর ধরে যে মহারণ্য রাজত্ব করছে, সেখানে কোনও মানুষ বাস করে না। অতি দুঃসাহসী পিগমী জাতিও সেখানে কেবলমাত্র দিনের আলোতে প্রবেশ করতে সাহস পায়। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যের নিবিড় অন্তঃপুর থেকে প্রতি প্রভাতে শিশু সূর্যকে অভিনন্দন জানিয়ে তীব্রস্বরে ডেকে ওঠে দানব-গরিলা। মানুষের যাতনা-কাতর আর্তনাদের মতো অতিকায় কপিকণ্ঠের সেই রবি-বন্দনা কানে গেলে শ্রোতার সর্বাঙ্গে জেগে ওঠে আতঙ্কের শিহরণ! ঐভাবে চিৎকার করে প্রভাত-সূর্যকে অভ্যর্থনা জানায় বলেই স্থানীয় মানুষ গরিলার নাম দিয়েছে 'ন্‌গাগি' অর্থাৎ রাত্রির যে অবসান ঘটায়।' গরিলার কণ্ঠস্বরে সাড়া দিতেই সূর্যদেব প্রত্যহ পূর্বাচলে আত্মপ্রকাশ করেন এ বিষয়ে পিগমি জাতির সন্দেহ নেই কিছুমাত্র।

পিগমিরা দু'দুবার খবর পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল তারা আত্তিলিওকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক, তাঁর জন্য তারা অপেক্ষা করছে সাগ্রহে। পিগমিদের খবর পেয়ে গরিলার সন্ধানে যাত্রা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন আত্তিলিও, কিন্তু ভাঙা পা নিয়ে তখনই অভিযান শুরু করতে পারছিলেন না।

তাঁর মানসিক অবস্থা বোধহয় আহত অঙ্গটিকে আরোগ্যলাভ করতে সাহায্য করেছিল, কারণ অপ্রত্যাশিতভাবে চিকিৎসক তাঁকে জানালেন গোড়ালির হাড় জোড়া লেগে আছে, আত্তিলিও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

বেলজিয়ামের উপনিবেশ মন্ত্রীর হাত থেকে অনেক কষ্টে দানব-গরিলার বাসস্থানে প্রবেশ করার একটা 'পারমিট' বা ছাড়পত্র আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন আত্তিলিও। ঐ অঞ্চলেও প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া খুব কঠিন, তবে কয়েকটা অভিযানের সাফল্যলাভ করেছিলেন বলেই আত্তিলিও সাহেব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিন মাস পর্যন্ত নিষিদ্ধ বনভূমিতে বাস করার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট তিন মাসের মধ্যে একটি দানব-গরিলা শিকারের অনুমতিও দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। তবে নিছক শিকারের বাসনা চরিতার্থ করতে গেলে সরকারের অনুমতি পাওয়া যেত না,— আত্তিলিও সাহেব নিহত গরিলার দেহ নিদর্শন হিসাবে প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'উইটওয়াটার্‌স্র্যাণ্ড ইউনিভার্সিটি অব জোহানেসবার্গ।'

দেরির জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন আত্তিলিও। চিকিৎসক যেদিন পায়ের অবস্থা

সন্তোষজনক বলে রায় দিলেন, সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে আন্তিলিও সাহেব প্রাদেশিক কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন। কমিশনারের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেলেও যে সব কথা উক্ত ভদ্রলোকের মুখ থেকে শুনেছিলেন, আন্তিলিওর কানে তা আদৌ মধুবর্ষণ করেনি। কমিশনার সাহেব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন একটির বেশী গরিলাকে কোন কারণেই হত্যা করা চলবে না। আত্মরক্ষার ছুতো শুনতে তিনি রাজি নন, কারণ এর আগে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ জঙ্গলে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অনেকগুলো গরিলাকে হতাহত করেছে। আহতদের সংখ্যা নিহতের চাইতে বেশী। হত্যাকারীরা অবশ্য বলেছে আত্মরক্ষার জন্যই তারা গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কমিশনার তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। কমিশনার সাহেব আন্তিলিওকে জানিয়ে দিলেন ঐ ধরনের ঘটনা ঘটলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। 'কঠোর শাস্তিটা' কি রকম হতে পারে জানতে চেয়ে আন্তিলিও শুনলেন অর্থদণ্ডের পরমাণ খুব কম করে বিশ ফ্রাঙ্ক এবং কঙ্গো থেকে বহিষ্করণের আগে একবার জেল খাটতে হবে, তবে জেলের মেয়াদ কতদিন হতে পারে সে বিষয়ে এখনই কিছু বলতে পারছেন না কমিশনার।

জেল! জরিমানা! বহিষ্করণ! —আন্তিলিও হতভম্ব!

কমিশনার বিনীতভাবে জানালেন, একটু কড়াকড়ি করতে হয়েছে। গরিলারা দুষ্প্রাপ্য জীব, বিশেষ করে অতিকায় দানব-গরিলা অতিশয় দুর্লভ— তাই সরকার তাদের রক্ষা করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

'ঠিক আছে', আন্তিলিও বললেন, 'আপনার অমূল্য গরিলাদের মধ্যে একটির বেশী জন্তুকে লক্ষ্য করে আমি গুলি ছুঁড়ব না। প্রাণ গেলেও আমার কথার নড়চড় নেই জানবেন।'

আন্তিলিও চলে এলেন। কমিশনার তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চভূমিতে অবস্থিত জঙ্গলের কাছে যেতেই ভয় পাচ্ছিল, ভিতরে যাওয়া তো দূরের কথা! কমিশনারের চেষ্টাতেই কয়েকটা নিগ্রো আন্তিলিওর সঙ্গী হতে রাজি হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে ঐ ভদ্রলোকের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলেন আন্তিলিও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'মাম্বুটি পিগমি'

সারাদিন ধরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে আর কষ্টকর-ভাবে পথ চলার পর আন্তিলিও সদলবলে এসে পৌঁছালেন পাহাড়ের উপর একটা সমতলভূমিতে। ঐ সমতলভূমির পিছনে বিরাজ করছিল অরণ্যের সবুজ প্রাচীর। খোলা জায়গাটার উপর সকলে এসে দাঁড়াতেই আন্তিলিওর অনুচরদের ভিতর থেকে উঠল প্রবল হাস্যধ্বনি। হঠাৎ লোকগুলোর এমন হাসিখুশি হয়ে ওঠার কারণটা কি হতে পারে ভেবে এদিক-ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন আন্তিলিও, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ পড়ল একদল অতি খর্বকায় মানুষের দিকে। সেই বেঁটে বেঁটে বামনদের দেহে ছিল নামমাত্র আবরণ, তাদের উচ্চতা চার ফিটের মতো— বামনদের সবচেয়ে লম্বা

লোকটির দৈর্ঘ্য চার ফিট ছয় ইঞ্চির বেশী হবে না। লোকগুলোর ছোট ছোট কুঞ্চিত মুখের সঙ্গে বাঁদরের মুখের সাদৃশ্য খুব বেশী। ঐ রকম কুৎসিত মুখ, খর্বকায় দেহের মধ্যস্থলে সুগোল উদরের স্ফীতি আর সরু সরু পা দেখে মাম্বুটি পিগমি জাতিকে যদি কেউ খুব হাস্যকর মনে করে তাহলে তাকে বোধহয় দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু মাম্বুটি পিগমিদের দলে যে ছোটখাট বৃদ্ধটি ছিল, সে আন্তিলিওর নিগ্রো অনুচরদের হাস্যস্রোত পছন্দ করল না। বৃদ্ধের মাথা থেকে ঝুলছিল একটা বেবুনের চামড়া, তার নাকের গড়নও ছিল অদ্ভুত— হাড়ের উপর অংশ চ্যাপ্টা, তলার দিকটা হঠাৎ ঠেলে উঠেছে উপর দিকে। দুই চোখে বন্য উগ্রতায় জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে পূর্বোক্ত নিগ্রোদের দিকে একবার কটাক্ষপাত করল বৃদ্ধ! এমন ভয়ংকর সেই চোখের প্রভাব যে, তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল হাস্যধ্বনি, সকলের মুখে ফুটে উঠল গাম্ভীর্যের নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি।

'ইয়াম্বো, বাওয়ানা (সুপ্রভাত মহাশয়)', বৃদ্ধ বলল। বলার সঙ্গে সঙ্গে হাতের বর্শাতে ভর দিয়ে সে হেলে দাঁড়াল।

তার দুই চোখ এখন আন্তিলিওর দিকে। দৃষ্টিতে বন্ধুত্বপূর্ণ কৌতূহলের আভাস। কেউ বৃদ্ধের পরিচয় না দিলেও আন্তিলিও বুঝলেন সে হচ্ছে পিগমিদের অধিনায়ক সুলতানি কাসিউলা— কয়েকদিন ধরে সে অপেক্ষা করছে আন্তিলিওর জন্য।

'ইয়াম্বো, বাওয়ানা', বৃদ্ধের সঙ্গীরা সমস্বরে অভ্যর্থনা জানাল। চোখের ভাষা যে পড়তে জানে সে পিগমিদের ঝকঝকে চোখগুলোর দিকে এক নজর তাকিয়েই বুঝবে বামনরা নির্বোধ নয়। একটু পরেই যে নবাগত সাদা-চামড়ার মানুষটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেই আগন্তুককে দুই চোখ দিয়ে জরীপ করে নিচ্ছে খর্বকায় পিগমিরা— বুঝে নিতে চাইছে লোকটি কেমন হবে।

মুহূর্তের মধ্যেই পিগমিদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন আন্তিলিও। ছোটখাট লোকগুলোকে তাঁর খুব ভাল লেগে গেল। পিগমিরা আন্তিলিওর মনোভাব বুঝতে পারল। তৎক্ষণাৎ তারা তাঁবু ফেলার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁবু খাটানোর কাজ শেষ। মোটবাহকরা চটপট শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পারিশ্রমিক নেবার জন্য। প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকগুলো দৌড় দিল। লোভনীয় বখশিশ 'টম্বাকো' (তামাক) নেবার জন্য তারা এক মুহূর্ত দেরী করল না। তাদের অদ্ভুত আচরণের অর্থ খুবই পরিষ্কার আন্তিলিওর কাছে— রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই লোকগুলো স্থান ত্যাগ করতে চায়। তাদের বিবেচনায় এই অঞ্চল রাত্রিকালে ঘোরতর বিপদজনক।

পিগমিরা এর মধ্যে গাছের ডালপালা দিয়ে একটা সাময়িক আচ্ছাদন নিজেদের জন্য তৈরী করে ফেলেছে এবং অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশে বসে আন্তিলিওর রাঁধুনির রান্নার স্বাদ গ্রহণ করছে নিবিষ্টচিত্তে। রান্না তো ভারি, গাদা গাদা সিদ্ধ ডাঁটা। কিন্তু সেই খাদ্য পেয়েই তারা খুব খুশী, আর রাঁধুনিও তাদের পরিতুষ্ট করতে ব্যস্ত। একটু আগেই তার অট্টহাস্য যে পিগমিদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল সে কথা সে ভোলেনি। অপ্রীতিকর ব্যাপারটা মুছে ফেলে সে পিগমিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 'ন্‌গাগি'

খুব ভোরে বীভৎস চিৎকারের শব্দে আন্তিলিওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এমন উৎকট আওয়াজ আগে কখনও শোনেননি তিনি। তবু চিৎকারের কার্যকরণ অনুমান করতে তাঁর ভুল হল না। চটপট তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন আন্তিলিও। পিগমিরা আগেই উঠেছে এবং অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসে পড়েছে।

উত্তেজিত স্বরে আন্তিলিও প্রশ্ন করলেন, 'ন্‌গাগি ?'

পিগমিদের নেতা কাসিউলা গম্ভীরভাবে বলল, 'নুদিও, ন্‌গাগি (হ্যাঁ, গরিলা)।'

সমবেত পিগমিরা মাথা নেড়ে সর্দারের কথায় সায় দিল। তারপর সদ্য জাগ্রত শিশু-সূর্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। আন্তিলিওর পায়ের তলায় অবস্থিত উঁচু জমিটার অনেক নীচে কিভু হ্রদের জল যেখানে আয়নার মতো ঝকঝক করছে, মনে হল সেই তরল আয়নার উপর থেকেই উঠে আসছে প্রভাত-সূর্য।

কিছুক্ষণ পরে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ চলতে শুরু করলেন আন্তিলিও। সঙ্গে রইল খর্বকায় পিগমি পথ-প্রদর্শকের দল। আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে আন্তিলিও ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু এমন কষ্টকর পথ চলার অভিজ্ঞতা তাঁর কখনও হয়নি। পথ বলতে কিছু নেই— ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ, ঝোপ, লতা, ঘাস, জঙ্গল প্রভৃতি নিয়ে গঠিত উদ্ভিদের প্রাচীর ভেদ করে এগিয়ে যেতে যেতে প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে জেগে ওঠে সর্পাঘাতের সম্ভাবনা। মাথার উপর ডালপালা আর লায়ানা লতার মধ্যে সাপ লুকিয়ে থাকলে তাকে ছোবল মারার আগে আবিষ্কার করা সম্ভব নয় ; পায়ের কাছে যেখানে শুকনো ঝরা পাতা আর শ্যাওলার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায় সেখান থেকেও লুকিয়ে-থাকা সাপ যে কোন মুহূর্তে ছোবল বসাতে পারে— শুধু তাই নয়, এদিক-ওদিক তাকিয়ে যদিও ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, তবু প্রতিমুহূর্তে ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে আত্মগোপনকারী হিংস্র পশুর আক্রমণের আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা চমকে চমকে উঠতে থাকে, সেই সঙ্গে চোখে পড়ে বিষাক্ত কীটপতঙ্গের আনাগোনা। কয়েকটা বিচিত্র ধরনের কীট আন্তিলিওর পরিচিত নয়, সেগুলোকে তাঁর আরও বেশী ভয়ানক বলে মনে হল। কাঁটাগাছের ডালগুলো তাদের ধারালো আলিঙ্গনের চিহ্ন বসিয়ে দিতে লাগল আন্তিলিওর পরিচ্ছদ আর চামড়ার উপর, অসংখ্য নাম-না-জানা গাছের বিষাক্ত স্পর্শে ফুলে ফুলে উঠল তাঁর মুখ আর হাত, সঙ্গে সঙ্গে আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো জ্বালা-যন্ত্রণা। এর উপর আবার শ্বাসকষ্টও ছিল— উচ্চভূমির ভারি বাতাস টানতে তাঁর বিলক্ষণ কষ্ট হচ্ছিল। কয়েক ঘণ্টা পথ চলার পরই তাঁর দৃষ্টি হয়ে এল ঝাপসা, কান করতে লাগল ভোঁ ভোঁ! দাঁতে দাঁত চেপে রাইফেল আঁকড়ে ধরে অতিকষ্টে এগিয়ে যেতে লাগলেন আন্তিলিও সাহেব।

আন্তিলিওর সঙ্গী কাসিউলা নামক পিগমিদের নেতা এবং তার বারোজন অনুচর খুব সহজেই পথ চলছিল। উদ্ভিদের জটিল জালের ভিতর দিয়ে তাদের ছোটখাট শরীর চটপট পথ করে নিচ্ছিল, কিন্তু মস্ত গুরুভার দেহ নিয়ে আন্তিলিও যাচ্ছিলেন আটকে— তিনি

যখন গাছপালার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে পথ করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন এবং পায়ের তলায় গর্তগুলো দেখতে না পেয়ে ধপাধপ আছাড় খাচ্ছেন, পিগমিরা তখন হালকা শরীর নিয়ে গর্তের উপরের ঘাসপাতা মাড়িয়ে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছে! তাদের জুতো ছাড়া খালি পা খুব সহজেই নরম মাটি, শ্যাওলা ও শিকড়-বাকড়ের উপর চেপে পড়ছে— কিন্তু আন্তিলিও সাহেবের জুতো-পরা পা যাচ্ছে পিছলে, তিনি খাচ্ছেন হোঁচটের পর হোঁচট! জঙ্গলের ছায়ার মতোই নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে পিগমিরা, আবার ফিরে এসে সর্দারকে সামনের পথের খবরাখবর দিচ্ছে ফিসফিস করে, তারপরই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে বনের মধ্যে ভুতুড়ে ছায়ার মতো!...,..

আচম্বিতে আন্তিলিওর খুব কাছেই জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে এল এক তীব্র চিৎকার। ক্রুদ্ধ সিংহের গর্জনের চাইতেও ভয়ংকর, যাতনা-কাতর কুকুরের কান্নার চাইতেও করুণ, মরণাহত মানুষের আর্তনাদের চাইতেও ভয়াবহ ; যে-চিৎকার সকালে শুনেছিলেন আন্তিলিও, এই শব্দটা মোটেই সে-রকম নয়। প্রথম চিৎকারের পরেই খুব কাছ থেকে আরও অনেকগুলো কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল— কণ্ঠস্বরগুলো একই রকম তীব্র, একই রকম উগ্র, একই রকম ভয়ঙ্কর! তারপর আবার সব চুপচাপ!

চিৎকারগুলো যে গরিলাদের কণ্ঠ থেকেই এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু জন্তুগুলো কোথায় অবস্থান করছে বুঝতে পারলেন না আন্তিলিও। গাছের পাতার কম্পনও তাঁর চোখে পড়ল না, তাই তাদের গতিবিধিও ধরতে পারলেন না তিনি— তবে একটা উগ্র গন্ধ তাঁর নাকে এসেছিল বটে। আন্তিলিও ভাবতে লাগলেন এই বুঝি একজোড়া রোমশ বাহু জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর গলা চেপে ধরে!

গরিলা সম্বন্ধে যে সব গল্প শুনেছিলেন আন্তিলিও, সেই গল্পগুলো এখন তাঁর মনে পড়তে লাগল। নিগ্রোদের মধ্যে অনেকেই নাকি গরিলার কবলে পড়ে অদৃশ্য হয়েছে। শ্বেতাঙ্গ শিকারীদের মধ্যে যারা গুলি চালিয়েছে কিন্তু গরিলাকে হত্যা করতে পারেনি এবং তার ফলে গরিলার প্রচণ্ড মুষ্টি যাদের সর্বাঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, তাদের কথা মনে পড়ল আন্তিলিও সাহেবের। গরিলার নখাঘাতে ছিন্নভিন্ন পিগমিদের কাহিনীও তাঁর স্মরণপথে উঁকি দিল, আর—

আর ঠিক সেই সময় মড়াৎ করে একটা গাছের ডাল ভাঙ্গার আওয়াজ এল আন্তিলিওর বাঁদিক থেকে!

বিদ্যুৎবেগে শব্দ লক্ষ্য করে ঘুরলেন তিনি, কিন্তু কিছুই তাঁর নজরে পড়ল না।

আবার একটা ডাল ভাঙ্গার আওয়াজ এল সামনের দিক থেকে। পরের শব্দটা উঠল ডানদিকে। তারপর এদিক-ওদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল সেই শব্দ— কাদের ভারি পায়ের চাপে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে শুকনো গাছের ডাল। সেই সঙ্গে বড় বড় গাছের পাতার আলোড়ন-ধ্বনি। অরণ্যের বুকে শব্দের তরঙ্গ তুলে সরে যাচ্ছে অনেকগুলো অতিকায় জীব। যদি তাদের মধ্যে কারও হঠাৎ আন্তিলিওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার শখ হয়, তাহলে

কি হবে? ঘন উদ্ভিদের জাল ভেদ কর আক্রমণকারীকে আবিষ্কার করার আগেই তো আন্তিলিও পড়ে যাবেন দানবের খপ্পরে। রাইফেল চালানোর সময় পাওয়া যাবে কি?

না, সে সব কিছু হল না। অন্ততঃ এবারের মতো গরিলারা আন্তিলিও আর তাঁর দলবলকে রেহাই দিল। জন্তুগুলো সরে যাচ্ছে।

যে পাহাড়টার উপর আন্তিলিও তাঁর পিগমি সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই পাহাড়ের নীচের দিকেই সশব্দে নেমে যাচ্ছে গরিলার দল। যাওয়ার আগে তারা বুঝি জানিয়ে দিয়ে গেল, সাবধান! চলে যাও এখান থেকে! কথা না শুনলে বিপদ হবে।

হ্যাঁ, চলে যেতেই চাইলেন আন্তিলিও। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার ধাক্কা সামলাতে তাঁর একটু সময় লাগবে। সেদিন অন্ততঃ দানব-গরিলার সান্নিধ্যে আসার জন্য একটুও উৎসুক ছিলেন না আন্তিলিও, বরং ঐ ভয়ংকর জীবের কাছ থেকে দূরে যাওয়ার জন্যই তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। কম্পাসের দিকে তাকিয়ে পিছন ফিরে তাঁবুর দিকে যাত্রা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন পিগমি-সর্দারের কাছে। সর্দার কাসিউলা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, তারপর সোজা এগিয়ে চলল নিজের খুশীমতো। পিছন ফিরে তাঁবুর রাস্তায় পা বাড়াল না। আন্তিলিওর মেজাজ খারাপ হল; লোকটা আবার 'কিশোয়াহিলি' ভাষা ভাল বুঝতে পারে না, কিন্তু ঐ ভাষা ছাড়া আর কিভাবে আন্তিলিও ভাব প্রকাশ করবেন? এত তাড়াতাড়ি তো আর পিগমিদের ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অতএব বার বার হাত নেড়ে পূর্বোক্ত ভাষাতেই তিনি বলতে লাগলেন, 'তোমাকে পিছন ফিরতে বলছি না? আমি তাঁবুতে ফিরতে চাই।'

সর্দার কসিউলা খুব অমায়িকভাবে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ আন্তিলিওর কথা সে বুঝেছে। কিন্তু যে পথ ধরে এগিয়ে গেলে তাঁবুতে পৌঁছানো যাবে বলে ভাবছিলেন আন্তিলিও, ঠিক তার উল্টো দিকের পথ ধরেই হাঁটতে লাগল কাসিউলা! এমন নির্বিকার মানুষকে নিয়ে কি করা যায়? —উপয়ান্তর না দেখে আন্তিলিও শেষ পর্যন্ত কাসিউলাকেই অনুসরণ করলেন। ফলে দেখা গেল ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তিনি এসে পড়েছেন তাঁবুর সামনে। আন্তিলিও বুঝলেন কম্পাস প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য না নিয়েও পিগমিরা নিখুঁতভাবে পথ চলতে পারে। শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকলেও পিগমিরা কখনও পথ ভুল করে না। সত্যি, তাদের দিক্ নির্ণয় করার ক্ষমতা অদ্ভুত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বামন ও দানবের দেশ

কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। আন্তিলিও দানব-গরিলার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারলেন। কিন্তু দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পিগমিদের মতো পথ চলার কায়দাটা রপ্ত করতে পারলেন না। প্রত্যেকদিনই অরণ্য ভ্রমণ সাঙ্গ করে আন্তিলিও ভাবতেন, 'আর নয়, এবার অন্ততঃ কয়েক দিন বিশ্রাম নেব।'

পরের দিন কাসিউলা এসে ডাকা মাত্র তিনি আবার বেরিয়ে পড়তেন, অরণ্য যেন দুর্বার আকর্ষণে তাঁকে টেনে আনত।

প্রত্যেকদিন কাসিউলা তার শ্বেতাঙ্গ অতিথিকে নিয়ে যেত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। ঐ জায়গাগুলো ছিল গরিলাদের রাতের আস্তানা। তারা চলে যাওয়ার পর তাদের পরিত্যক্ত আস্তানা পর্যবেক্ষণ করে আন্তিলিও দুটি গরিলা-পরিবারের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছিলেন। পরিবার দুটি দিনের বেলা একসঙ্গে ভ্রমণ করত, কিন্তু রাতে তারা আশ্রয় নিত পৃথক আস্তানায়।

ঐ আস্তানাগুলো তৈরি করতে গরিলারা যথেষ্ট পরিশ্রম করত। দুটি বড় গাছের নীচে রাত্রিবাসের জন্য আস্তানা তৈরি করা হত। প্রথমে গাছের তলায় মাটির উপর থেকে ঝোপঝাড়, শিকড়-বাকড় তুলে জায়গাটা পরিষ্কার করত গরিলারা, তারপর সেই জায়গাটার উপর প্রচুর শ্যাওলা, গাছের পাতা বিছিয়ে প্রস্তুত করত আরামদায়ক বিছানা। অন্তঃপুরের গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টাও ছিল— মোটা মোটা লায়ানালতা টেনে এনে পর্দা দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যেত ঐ আস্তানায়।

গরিলাদের সঙ্গে যখন ছোট বাচ্চা থাকে তখন মেয়ে-গরিলা আর বাচ্চারা গাছের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। দৈত্যাকৃতি পুরুষ-গরিলা গাছের নীচে পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে তার নিজের আস্তানা ও শয্যা তৈরি করে, তারপর সেখানে নিদ্রা যায়। তবে একেবারে চিৎপাত হয়ে তারা শুয়ে পড়ে না, গাছের গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে তারা নিদ্রাসুখ উপভোগ করে। ঘুমের সময়েও বিপদের আশঙ্কায় তাদের ইন্দ্রিয় থাকে অতিশয় জাগ্রত, একেবারে অচৈতন্য হয়ে তারা কখনই নিদ্রার কোলে আত্মসর্মপণ করে না।

ভোর হলেই আবার গরিলারা বেরিয়ে পড়ে আহারের সন্ধানে। আন্তিলিও তাঁর পিগমি-বাহিনী নিয়ে গরিলাদের পরিত্যক্ত আস্তানা থেকে পদচিহ্ন ধরে জন্তুগুলোকে অনুসরণ করতেন। এই ব্যাপারে কাসিউলার দক্ষতা অসাধারণ। ঘন জঙ্গলের মধ্যে আন্তিলিও সাহেব গরিলাদের পথ-চলার চিহ্ন আবিষ্কার করতে না পারলেও কাসিউলা নির্ভুলভাবে জন্তুগুলোর গন্তব্য পথ নির্ণয় করতে পারত। কয়েক জায়গায় গরিলাদের পায়ের ছাপ তুলেছিলেন আন্তিলিও 'প্লাস্টার অব প্যারিস' নামক পদার্থের সাহায্যে। সব চেয়ে বড় পায়ের ছাপ ছিল ১৪½ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পর্যন্ত পদচিহ্নের বিস্তার ৭¾ ইঞ্চি। জন্তুটার দেহের ওজন সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেবার জন্য আন্তিলিও বলেছেন পিগমিদের পায়ের ছাপ যতটা গভীর হয়, তার চারগুণ গভীর হয়ে মাটির উপর পড়ে গরিলার পদচিহ্ন।

ঐ পায়ের চিহ্ন দেখে গরিলাদের চিনতে পারত কাসিউলা। পিগমিরা তাদের এলাকার প্রত্যেকটা গরিলার নামকরণ করেছিল। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু শুধু পায়ের ছাপ দেখেই কাসিউলা বলে দিত কোন্‌টা কোন্ জন্তুর পদচিহ্ন।

খুব ধীরে ধীরে পা চালিয়ে গরিলাদের অনুরসণ করতেন আন্তিলিও। অতিকায় বানরগুলোর গতিবিধি তিনি লক্ষ্য করতেন জঙ্গলের আড়াল থেকে অথবা গাছের উপর থেকে।

গরিলারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উদরস্থ করে। কারণ, তাদের দেহের পরিধি যেমন বিরাট,

তাদের খাদ্য তলিকার অন্তর্ভুক্ত জিনিসগুলোর আকার তেমনই অতিশয় ক্ষুদ্র। 'মিয়ান্দো' নামক এক ধরনের শাক তাদের প্রিয় খাদ্য। মিয়ান্দো ভক্ষণে ব্যস্ত একদল গরিলাকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আত্তিলিও সাহেবের। একটা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে অবস্থান করছিল মিয়ান্দো শাকের ক্ষেত, কয়েক মিনিটের মধ্যেই গরিলারা জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলল। ক্ষেতের সমস্ত শাক উদরস্থ করেই দলটা আবার খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র যাত্রা করল।

আহার্য বস্তু সংগ্রহ করার জন্যই গরিলারা সারাদিন ঘোরাঘুরি করতে বাধ্য হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা বিস্তীর্ণ এলাকার ফলমূল, শাকসবজি তারা উদরস্থ করে ফেলে। অতএব খুব বেশী ঘোরাঘুরি না করলে তাদের রাক্ষুসে খিদে মিটবে কেন? গরিলাদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে মিয়ান্দো শাক, বুনো কলা, বুনো পেঁয়াজ আর কচি বাঁশের গোড়া। ভোরবেলা থেকে শুরু করে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলে তাদের ভ্রমণ আর আহার পর্ব— তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাদের খাদ্যসংগ্রহের বিরাম নেই। খুব সম্ভব সেজন্যই তারা প্রতি রাত্রে নূতন নূতন রাতের-আস্তানা তৈরি করতে বাধ্য হয়। আহারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তারা বিকালের দিকে আগের আস্তানা থেকে এত দূরে এসে পড়ে যে সেখানে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না— অতএব রাত্রিবাসের জন্য নূতন ঘর না বেঁধে আর উপায় কি?

দুপুরবেলা গরিলারা যখন বিশ্রাম করে সেইসময় কয়েকদিন তাদের লক্ষ্য করেছিলেন আত্তিলিও। কয়েকটি পূর্ণবয়স্ক গরিলাকে সটান ঘাসের উপর লম্বা হয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে দেখা গেল, কয়েকটা জন্তু আবার গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ঘুম লাগাচ্ছে। একদিন একটা গরিলা-বাচ্চার কাণ্ড দেখে খুব মজা পেয়েছিলেন আত্তিলিও। একটা কিশোরবয়স্ক গরিলার সঙ্গে বাচ্চাটা খেলা করছিল। গাছের উপর-নীচে ছুটোছুটি করে পরস্পরকে তাড়া করছিল খেলার ছলে, কখনও লায়ানা লতা ধরে ঝুলছিল প্রবল উৎসাহে, আবার কখনও বা লুকোচুরি খেলার আনন্দে তারা মশগুল। হঠাৎ বাচ্চাটা খেলা ছেড়ে তার মায়ের কাছে এসে পড়ল। মা বসে বসে ঢুলছিল, বাচ্চার বোধহয় সেটা পছন্দ হল না। সে প্রথমে মায়ের চারপাশে লাফালাফি করল তারপর বুকের উপর লাফিয়ে উঠে চুল ধরে টানতে লাগল; অর্থাৎ যত রকমে সম্ভব মাকে বিরক্ত করতে শুরু করল। গরিলা-মা প্রথমে কিছু বলেনি, কিন্তু অত্যাচার যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন চোখ বন্ধ রেখেই বাচ্চাকে একটি 'মৃদু' চপেটাঘাত করল। থাপ্পড় খেয়ে বাচ্চাটা ফুটবলের মতো গোল হয়ে গড়াতে গড়াতে ছিটকে পড়ল অনেকদূরে! অবশ্য পরিত্রাহি চিৎকার করে সে জানিয়ে দিয়েছিল মায়ের ব্যবহারটা মোটেই ভাল লাগেনি।

গরিলা দলপতির গতিবিধি লক্ষ্য করা কিন্তু এত সহজ নয়। পথ চলার সময়ে সে থাকে দলের আগে! দল যখন পিছিয়ে আসে, সে তখন সকলের পিছনে। দলের গরিলারা যখন আহারে ব্যস্ত, দলপতি সেইসময় চারধারে ঘুরে ঘুরে টহল দেয়, নজর রাখে চারদিকে— শত্রুর আবির্ভাব হলে তার প্রথম মোকাবিলা করে দলপতি। দৈর্ঘ্যে ছয় ফিট ছয় ইঞ্চি, রোমশ কৃষ্ণ দেহের পৃষ্ঠদেশে কালোর বদলে রূপালি রং-এর ছোঁয়া মাখানো বিরাট শরীর

নিয়ে গরিলা দলপতি যখন ধীর পদক্ষেপে বনের পথে বিচরণ করে, তখন মনে হয় অরণ্য-সম্রাট তার রাজত্ব পরিদর্শন করে ফিরছে!

গরিলারা যখন স্থানত্যাগ করে অপর স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হত, ঠিক সেই সময় তাদের অনুসরণ করতেন না আত্তিলিও। কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বুঝেছিলেন পিগমিদের মতো নিঃশব্দে ঘন জঙ্গলের ভিতর চলাফেরা করার ক্ষমতা তাঁর নেই। ভারি জুতো আর ভারি শরীর নিয়ে ধুপধাপ করে বনের মধ্যে যাতায়াত করতে গিয়ে গরিলাদের চমকে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাদের মেজাজ খারাপ থাকলে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তো আছেই, সেরকম বিপজ্জনক কিছু না ঘটলেও অতি দ্রুতবেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে তারা যে অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ধাবমান গরিলাদের নাগাল পেতে হলে আবার কয়েকঘন্টা ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পিছু পিছু ছোটা দরকার। সেইখানেই আত্তিলিওর প্রবল আপত্তি, ঘন জঙ্গলের মধ্যে অনর্থক ছুটোছুটি করে কষ্ট পেতে তিনি মোটেই রাজি ছিলেন না। অতএব গরিলারা কিছুদূর এগিয়ে গেলে পিগমি-সর্দার কাসিউলার নির্দেশ অনুসারে তাদের পিছু নিয়ে এগিয়ে যেতেন আত্তিলিও এবং ঐভাবে চলাফেরা করার ফলে অনুসরণকারী মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেনি গরিলার দল।

আগেই বলেছি ঐ অঞ্চলের গরিলাদের প্রত্যেকটির নামকরণ করেছিল পিগমিরা। 'কিটাম্বো' নামে একটা মস্ত পুরুষ-গরিলাকে পিগমিরা ভীষণ ভয় করত, কিন্তু আতঙ্কের সঙ্গে একটা শ্রদ্ধার ভাবও দেখেছিলেন আত্তিলিও। একদিন কাসিউলাকে ডেকে আত্তিলিও জিজ্ঞাসা করলেন এমন ভয়ানক জন্তুটাকে তারা হত্যা করেনি কেন? উত্তরে কাসিউলা জানাল শ্বেতাঙ্গদের আইনে গরিলা মারলে শাস্তি পেতে হয় বলেই তারা উক্ত কিটাম্বোর অস্তিত্ব সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আত্তিলিও বুঝলেন কাসিউলা মিথ্যা কথা বলছে। গরিলার মাংস যে পিগমিদের প্রিয় খাদ্য এবং শ্বেতাঙ্গ শাসকের আইন অমান্য করে তারা যে সুযোগ পেলেই গরিলা শিকার করে সেই তথ্য আত্তিলিওর অজ্ঞাত ছিল না। সাদা মানুষের আইনের কথা নিতান্তই বাজে কথা, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে মহাশক্তিধর কিটাম্বোর হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার সাহস ছিল না বলেই পিগমিরা তাকে কখনও হত্যার চেষ্টা করেনি।

স্বয়ং কমিশনার সাহেব আত্তিলিওকে জানিয়েছিলেন পিগমিদের গরিলা শিকার থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেও বেলজিয়ামের শ্বেতাঙ্গ সরকার সুবিধা করতে পারেননি। ঘন জঙ্গলের মধ্যে সুবিধা পেলেই পিগমিরা গরিলা মেরেছে। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যের ভিতর ঢুকে দোষীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি সরকারের পক্ষে। কিন্তু সরকারের আইনের সাহায্য ছাড়াই গরিলারা যে খর্বকায় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে তার কারণ হচ্ছে তাদের নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্য। মাঝে মাঝে গরিলা শিকার করলেও কয়েকটা অতি-বৃহৎ অতি-হিংস্র গরিলার সামনে যেতে ভয় পেত পিগমিরা, তাদের বর্শা আর তীরধনুক নিয়ে ঐ সব অরণ্যচারী দানবের মোকাবিলা করা অসম্ভব। কিটাম্বোর মতোই ভয়ানক আর একটি পুরুষ গরিলা পিগমিদের এলাকার মধ্যে বাস করত। কিটাম্বোকে নিয়ে পিগমিরা বিশেষ

মাথা ঘামাত না, কিন্তু 'মোয়ামি ন্‌গাগি' নামক অপর গরিলাটি নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা ছিল যথেষ্ট। মোয়ামি ন্‌গাগিকে পারলে নিশ্চয়ই হত্যা করত কাসিউলা, সে চেষ্টাও যে হয়নি তা নয়, তবে পূর্বের অভিজ্ঞতার ফলে কাসিউলা জেনেছিল ঐ ভয়ংকর দানবের সামনে গেলে পিগমিদের মৃত্যু অবধারিত, তাই অনর্থক দলের লোকের প্রাণ বিপন্ন না করে অন্য উপায়ে তাকে বধ করতে চেয়েছিল পিগমি-সর্দার সুলতানি কাসিউলা।

মোয়ামি ন্‌গাগি নামের ভয়ংকর গরিলাটি সম্পর্কে সব কথা খুলে বলেছিল কাসিউলা আন্তিলিওর কাছে। নিজের জীবন বিপন্ন না করে জন্তুটাকে হত্যা করার অন্য উপায় থাকলে সে তাই করবে একথাও বলেছিল কাসিউলা— কিন্তু সেই 'অন্য উপায়' যে কি হতে পারে সে বিষয়ে সে কোনও আলোচনা করেনি এবং আন্তিলিও সাহেব ঐ ব্যাপারে পিগমি-সর্দারের নীরবতা নিয়ে মাথা ঘামাননি। মাথা ঘামালে ভাল করতেন, অন্ততঃ কয়েকটা ভয়ংকর মুহূর্তের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন। পরে যখন কাসিউলার পরিকল্পনা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তখন আর বিপদকে এড়িয়ে যাওয়ার সময় ছিল না— তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত! অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাইফেল হাতে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়েছিলেন আন্তিলিও নিতান্তই আত্মরক্ষার জন্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : গরিলারাজ 'মোয়ামি ন্‌গাগি'

পিগমিদের ভাষায় 'মোয়ামি ন্‌গাগি' কথাটির অর্থ হচ্ছে গরিলার রাজা। পিগমিদের এলাকার গরিলাদের মধ্যে পূর্বোক্ত গরিলাটি ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর। গরিলারা খুব শান্তশিষ্ট নয়, কিন্তু গরিলারাজ মোয়ামি ন্‌গাগির মতো হিংস্র ও উগ্র চরিত্র গরিলাদের মধ্যেও দেখা যায় না।

পিগমি-দলপতি কাসিউলা ঐ গরিলাটিকে ঘৃণা করত। ঘৃণাটা অহেতুক নয়। কয়েক বছর আগে কাসিউলার দলভুক্ত ছয়টি পিগমি-শিকারীর সঙ্গে তার ছেলেরাও গিয়েছিল খাবারের জন্য সাদা পিঁপড়ে ধরতে। হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো বনের ভিতর থেকে গরিলারাজ 'মোয়ামি ন্‌গগি' পিগমিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাসিউলার এক ছেলে এবং তার এক সঙ্গী গরিলার ভয়ংকর আলিঙ্গনে ধরা পড়ল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাদের সর্বাঙ্গ হয়ে গেল চূর্ণ বিচূর্ণ। দলের অন্য সবাই পালাল। দুটি মানুষকে হত্যা করেও দানব ক্ষান্ত হতে চাইল না, মৃতদেহ দুটি মাটিতে ফেলে সে পলাতক পিগমিদের তাড়া করল।

আত্মরক্ষার জন্য পিগমিরা এইবার তাদের প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করল। গরিলা তেড়ে এলে পিগিমিরা পালাতে পালাতে বর্শাদণ্ড উলটো করে মাটিতে বসিয়ে দেয়— বর্শাদণ্ড এমনভাবে মাটিতে গেঁথে যায় যে, ধারালো ফলার মুখটা ঘোরানো থাকে অনুসরণকারী গরিলার দিকে এবং ঐভাবে বর্শাদণ্ড মাটিতে বসিয়ে দেওয়ার সময়ে পলাতকরা এক মুহূর্তের জন্য থামে না, তাদের গতিবেগ থাকে অব্যাহত। ফলে যে পথ দিয়ে পিগমিরা পালাতে

থাকে সেই পথের জায়গায় জায়গায় ঘন পত্রপল্লবের অন্তরাল থেকে মাটির উপর কোনাকুনি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকগুলো বর্শার উদ্যত ফলা গরিলাকে অভ্যর্থনা করার জন্য! ক্ষিপ্ত গরিলা নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, দারুণ ক্রোধে সাময়িকভাবে সাবধান হওয়ার কথাও সে ভুলে যায়— তার ফলে পিগমিদের পিছু নিয়ে ছুটতে ছুটতে সে এসে পড়ে বল্লমে কণ্টকিত পথের উপর, আর অনিবার্য ভাবেই দানবের ধাবমান বিপুল দেহের গতিবেগে একটা-না-একটা বর্শা সবেগে ঢুকে যায় তার বুকে কিংবা পেটে!

সেদিনও পূর্বোক্ত কৌশল প্রয়োগ করল পলাতক বামনের দল। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ভীষণ গর্জন করে থমকে দাঁড়াল গরিলারাজ— তার বিপুল উদরদেশে গভীরভাবে বিদ্ধ হয়েছে একটি বর্শা!

পিগমিরা নিরাপদ দূরত্ব থেকে আহত জন্তুটাকে লক্ষ্য করতে লাগল। গরিলা বর্শাটিকে পেট থেকে বাইরে আনার জন্য প্রাণপণে টানাটানি শুরু করল। সেজন্য জন্তুটার খুবই কষ্ট হচ্ছিল সন্দেহ নেই, কারণ বর্শাফলকের দুই প্রান্ত বাঁকা 'হুক'-এর মতো তৈরি করে পিগমিরা— একবার শরীরের ভিতর ঢুকলে ঐ বাঁকানো ফলা দুটো আর সহজে বাইরে আসতে চায় না।

কয়েকবার টানাটানি করেও যখন গরিলা বর্শাটাকে পেট থেকে বাইরে আনতে পারল না, তখন সে ঝোপ-ঝাড় ভেঙ্গে বনের ভিতর অদৃশ্য হল। পিগমিরা ভাবল জন্তুটা জঙ্গলের মধ্যে কোথাও মরে থাকবে। কয়েক মাস পরে আহত গরিলা আবার পিগমিদের এলাকাতে দর্শন দিল। এবার সে একা নয়, এক সুবৃহৎ গরিলা পরিবারের দলপতি হয়ে ফিরে এসেছিল মোয়ামি ন্‌গাগি— তার দেহ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বভাব আগের চেয়েও উগ্র, আগের চেয়েও ভয়ংকর!

একদিন দুপুরবেলা আন্তিলিও যখন কিটাম্বোর দলের পিছু নিয়েছেন, সেই সময় হঠাৎ কাসিউলা থমকে দাঁড়াল। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে কিছু শুনল, বাতাসে কয়েকবার ঘ্রাণ গ্রহণ করল, তারপর পার্শ্ববর্তী ঝোপ-ঝাড় পরীক্ষা করতে লাগল।

ব্যাপারটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। অধিকাংশ সময়েই ঐভাবে গরিলাদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করে থাকে কাসিউলা, কাজেই আন্তিলিওর মনে কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি। কিন্তু সে যখন ফিসফিস করে বলল, 'ঐ যে ওদিকে গেছে ন্‌গাগি,' এবং সামনের পর্বত চূড়ার দিকে অগ্রবর্তী অস্পষ্ট পদচিহ্নগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আন্তিলিওকে এগিয়ে যেতে বলল, তখনই তাঁর সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। আন্তিলিও সাহেব দারুণ উত্তেজনায় অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন, তার উপর দুর্গম অরণ্যে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার ফলে তিনি এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কাসিউলার আচরণের অসঙ্গতি তাঁর নজর এড়িয়ে গেল। তিনি যদি সতর্ক থাকতেন তবে নিশ্চয়ই জানতে চাইতেন অন্যান্যবারের মতো সামনে এগিয়ে পথ-প্রদর্শক হওয়ার পরিবর্তে হঠাৎ কাসিউলা এখন নিজে পিছনে থেকে তাঁকে এগিয়ে যেতে বলছে কেন? আন্তিলিওর বরাত খারাপ, কাসিউলাকে কোন প্রশ্ন না করে তিনি বোকার মতো পায়ের ছাপগুলোকে অনুসরণ করলেন।

পাহাড়ের গা ছিল ভীষণ খাড়া। হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন আন্তিলিও। 'মসার রাইফেলটা' যাতে লতা আর উদ্ভিদের জালে জড়িয়ে না যায় সেদিকেও তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল, তাই আশে পাশে দৃষ্টি দেবার অবসর তাঁর হয়নি। আন্তিলিও বরাবরই লক্ষ্য করেছেন জঙ্গলের পথে পিগমিরা ছায়ার মতো নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গে যায়। তাই তাদের সাড়াশব্দ না পেলেও বামনরা যে তাঁর পিছন পিছন আসছে সে বিষয়ে আন্তিলিও ছিলেন নিঃসন্দেহ। ঝোপ-ঝাড় আর লতাপাতার বাধা ভেদ করে খাড়াই বেয়ে উঠছিলেন আন্তিলিও, মনে মনে ভাবছিলেন এই সময় যদি পাহাড়ের উপর থেকে কোনও গরিলা হঠাৎ তাদের উপর লাফিয়ে পড়ে তাহলে তিনি তো রাইফেল ব্যবহার করার সুযোগই পাবেন না— তলা থেকে বর্শা চালিয়ে পিগমিদের পক্ষেও ঐ রকম আক্রমণ রোধ করা সম্ভব নয়। গরিলা যদি ঐভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে তার প্রকাণ্ড দেহের ভারে পিষ্ট হয়ে সকলের মৃত্যু হবে, জন্তুটাকে আর কষ্ট করে হাত পা চালাতে হবে না—

অতএব চটপট পাহাড়ের উপর সমতল ভূমিতে পা রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আন্তিলিও।

হাঁপাতে হাঁপাতে আর দুড়দাড় শব্দে ঝোপঝাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আন্তিলিও পাহাড়ের উপর একটা ডিম্বাকৃতি সমতল ভূমির উপর এসে পৌঁছালেন। ঐরকম শব্দ করে গরিলার পিছু নেওয়া নির্বোধের কাজ, কিন্তু আন্তিলিও ঘন জঙ্গলের মধ্যে পিগমিদের মতো নিঃশব্দে দ্রুত চলাফেরা করতে পারতেন না। উপরে পৌঁছে ঝোপ-ঝাড়, ঘাস পাতা আর বৃক্ষশাখার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে আর রাইফেলটা মুক্ত করলেন আন্তিলিও, তারপর যে লায়ানা লতাটা এর মধ্যে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টা করছিল সেটাকে টানাটানি করে সরিয়ে দিলেন তিনি। যাই হোক, এতক্ষণ বাদে একটা সমতল স্থানে পা রাখতে পেরে আন্তিলিও একটু নিশ্চিন্ত হলেন। মৃদুস্বরে কাসিউলাকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি, আচম্বিতে তাঁর কানের পর্দা ফাটিয়ে জেগে উঠেছে তিন-তিনটি কণ্ঠের বীভৎস চিৎকার!

পরক্ষণেই সামনের ফাঁকা জায়গার বিপরীত দিকে অবস্থিত জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হল তিনটি বিপুলাকৃতি গরিলা।

এতক্ষণ পরে আন্তিলিওর বুদ্ধি খুলল—

কাসিউলা পরিচয় করিয়ে না দিলেও মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বুঝে ফেললেন আক্রমণকারী গরিলাদের সামনে এগিয়ে এসে যে দানবটা দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে সে কিটাম্বো নয়— স্বয়ং মোয়ামি ন্‌গাগি! উক্ত গরিলার মেজাজ খুব ভাল নয় বলেই শুনেছিলেন আন্তিলিও, অন্ততঃ সেই মুহূর্তে তার খারাপ মেজাজ যে আরও খারাপ হয়েছে, সে বিষয়ে আন্তিলিওর একটুও সন্দেহ ছিল না।

আরও একটি কারণে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। এতক্ষণ তাঁর ধারণা ছিল পিগমিরা ধারে কাছেই আছে! হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর ত্রিসীমানায় কেউ নেই।

আন্তিলিও দেরি করলেন না, রাইফেল তুললেন। সবার আগে ধেয়ে আসছে গরিলারাজ মোয়ামি ন্‌গাগি, তার জ্বলন্ত কয়লার মতো দুই প্রদীপ্ত চক্ষু আর হাঁ করা মুখের দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি।

জন্তুটার বুক লক্ষ্য করে তিনি গুলি ছুঁড়লেন। গরিলা মাটিতে পড়ল না! সে আরও জোরে চিৎকার করে উঠল। তার গতিবেগ হয়ে উঠল দ্রুত থেকে দ্রুততর— ঝড়ের বেগে সে এগিয়ে আসতে লাগল আন্তিলিওর দিকে।

আন্তিলিও হতভম্ব! এত কাছ থেকে তিনি কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন? গরিলা তখন তাঁর কাছ থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরে আছে। রাইফেলে গুলি ছিল না, চটপট গুলি ভরে আন্তিলিও আবার রাইফেলের ঘোড়া টিপলেন।

দ্বিতীয় বারের উদ্যম ব্যর্থ হল না। গরিলা থেমে গেল, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। জন্তুটা এত কাছে এসে পড়েছিল যে, তার ধাক্কায় একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে ছিটকে এসে লাগল আন্তিলিওর হাঁটুতে।

গরিলারাজ মোয়ামি ন্‌গাগি সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। কিন্তু তখনও আন্তিলিওর বিপদ কাটেনি। দানবের দুই সহচরী ধেয়ে আসছে তাঁকে লক্ষ্য করে। রাইফেল তুললেন আন্তিলিও, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কমিশনার সাহেবের সাবধানবাণী—

'জেল! জরিমানা! বহিষ্কার।'

ওরে বাবা! গরিলার চাইতে কমিশনারের আইন কিছু কম বিপদজনক নয়! আন্তিলিও শূন্যে রাইফেল তুলে তিনবার আওয়াজ করলেন। বরাত ভাল, তাতেই কাজ হল। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে মেয়ে গরিলা দুটো পালিয়ে গেল বনের মধ্যে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আন্তিলিও মাটিতে বসে পড়লেন। আর তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা ছিল না। একটু দূরেই ধরাশায়ী গরিলারাজের প্রকাণ্ড মৃতদেহটা তিনি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। আর হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রের গুণে জনশূন্য অরণ্য দলে দলে মানব-সন্তান প্রসব করতে শুরু করল। একটু আগেই যেখানে জন-মানুষের চিহ্ন ছিল না, সেখানেই কোথা থেকে কে জানে এসে দাঁড়াল একদল বেঁটে মানুষ। মাম্বুটি পিগমি!

সুলতানি কাসিউলা বীর বিক্রমে এগিয়ে এসে মৃত গরিলার মস্ত বড় উদরের উপর পা তুলে দিল, তারপর পেটের উপর একটা শুষ্ক ক্ষতচিহ্নের দিকে আন্তিলিওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাল, কয়েক বছর আগে ঐ জায়গাতেই পিগমিদের বর্শা বিঁধেছিল।

'যাক, এতদিনে প্রতিশোধ নেওয়া হল', সগর্বে বলে উঠল কাসিউলা, 'মোয়ামি ন্‌গাগি মারা গেছে।'

আন্তিলিওর সর্বাঙ্গ তখন রাগে জ্বলছে। কাসিউলা যে কিটাম্বোর নাম করে মোয়ামি ন্‌গাগির ডেরার দিকে তাঁকে চালিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই— পিগমিদের বর্শা আর তীরধনুক ঐ দানবের বিরুদ্ধে অচল বলে স্বয়ং আন্তিলিওকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে কাসিউলা।

খুব রেগে গেলেন আন্তিলিও, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না। কাসিউলার ভুলটা যে নিতান্ত ইচ্ছাকৃত সে কথা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

সৈনিকের পঞ্চম অভিজ্ঞতা —

নরখাদক দেবতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : কাপালালোর পরামর্শ

আত্তিলিও গত্তি তাঁর পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন যে কোন নূতন স্থানে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ওয়াকাপাগা নামক নিগ্রোদের গ্রামে পৌঁছে তিনি একটি মানুষকেও দেখতে পেলেন না। তবে হ্যাঁ, কয়েকটা ছাগল গ্রামের ভিতর থেকে ব্যা ব্যা শব্দে আগন্তুকদের সম্বন্ধে তাদের মতামত জানিয়েছিল বটে!

'ব্যাপারটা কি?' আত্তিলিও মোটবাহকদের সর্দার কাপালালোকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকগুলো কি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল?'

কাপালালো মনিবের সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে মোট-বাহকদের মালপত্র সেখানেই নামিয়ে রাখতে আদেশ করল, তারপর পুবদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, 'শোনো।'

আত্তিলিও কান পেতে শুনলেন নির্দিষ্ট দিক থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীত ও বাদ্যের সুমধুর ধ্বনি। তাঁর মনে হল দূরবর্তী নদীতটই পূর্বোক্ত গীতবাদ্যের উৎসস্থল। সম্ভবতঃ ঐখানেই সমবেত হয়েছে গ্রামের সমস্ত মানুষ।

'বিয়ের ব্যাপার নাকি?' আবার প্রশ্ন করলেন আত্তিলিও।

উত্তর এল না। কাপালালো হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। আত্তিলিও বিরক্ত হলেন। চারদিন ধরে কুম্ভীরসঙ্কুল জলপথে নৌকো চালিয়ে এবং আগুনঝরা রোদের ভিতর বারো ঘণ্টা পা চালিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পথের মধ্যে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে অসংখ্য কীটপতঙ্গ, তাদের কামড়ের জ্বালায় তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলছে— বলাই বাহুল্য শরীরের এমন অবস্থায় বিয়ের উৎসব দেখার ইচ্ছে তাঁর ছিল না।

এখন তিনি তাঁবু খাটিয়ে ভিতরে ঢুকে বিশ্রাম নিতে চাইছেন। বিশ্রামের আগে পরিষ্কার জল আর সাবান সহযোগে সমস্ত শরীর ধুয়ে পতঙ্গের দংশনে ক্ষতবিক্ষত স্থানগুলোতে 'আইওডিন' লাগানো দরকার— এখন কি উৎসব-টুৎসব ভালো লাগে?

অতএব আত্তিলিও গর্জে উঠলেন, 'বিয়ে-ফিয়ের ব্যাপার নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাতে

চাই না। গাঁয়ের সর্দারকে এখনই ডেকে আনো। লোকজন লাগিয়ে সে এখনই পানীয় জল আর স্নানের উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা করুক। তারপর জ্বালানি কাঠ, ফল, ডিম, মুরগি সব চাই— ঝটপট! জলদি!'

কাপালালো এক পা নড়ল না। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে সে আত্তিলিওর দিকে তাকাল। তার চোখের ভাষা অতিশয় স্পষ্ট— 'আহা! অবোধ বালক। তুমি জানো না তুমি কি বলছ!'

খুব বিশ্বাসী মানুষ কাপালালো। তার বুদ্ধি বিবেচনার উপর আত্তিলিওর অগাধ আস্থা। এর আগে সে কখনও মনিবের আদেশ অমান্য করেনি। এমন বিশ্বাসী প্রভুভক্ত অনুচর যদি হঠাৎ অবাধ্য হয়ে পড়ে, তাহলে মনিব আর কি করতে পারেন? নিরুপায় আত্তিলিও আসন গ্রহণ করলেন একটা বাক্সের উপর।

বিরক্ত বা উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই, বেশ শান্তভাবেই এবার প্রশ্ন করলেন আত্তিলিও, 'ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'কুমীর', কাপালালোর উত্তর, 'কাল দুই যমজ বোনের মধ্যে ছোট মেয়েটিকে কুমীরে নিয়েছে।'

— 'তাহলে এটা কি শোকসভা? শোক প্রকাশের পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কি এইখানেই বসে থাকব?'

ওয়াকাপাগা জাতির প্রতিবেশী অন্য আর একটি নিগ্রোজাতির মানুষ কাপালালো। প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্যই তার জানা আছে। আত্তিলিওর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল— বিদেশীদের উপস্থিতি এই সময়ে ওয়াকাপাগা জাতি পছন্দ করবে না, কারণ এখন তারা চফু-মায়া নামক দেবতাকে পূজা নিবেদন করতে ব্যস্ত।

আত্তিলিও কিছু কিছু স্থানীয় ভাষা জানতেন। চফু-মায়া কথাটির অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন— মৃত্যুদূত!

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেটা আবার কি! প্রেতাত্মা?'

— 'না, বাওয়ানা। চফু-মায়া হচ্ছে একটা কুমীর। নদীতে আর জলাভূমিতে যে সব কুমীর বাস করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ভয়ানক জন্তুটার নাম চফু-মায়া। গতকাল নাইনি নামে মেয়েটিকে চফু-মায়া নিয়ে গেছে। ঠিক বছর দুই আগে নাইনির বড় বোনকেও ঐ জন্তুটা খেয়ে ফেলেছিল। দুটি মেয়েই ছিল যমজ বোন।'

আত্তিলিও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'ঐ হতচ্ছাড়া কুমীরটাকে মারার চেষ্টা না করে লোকগুলো তাকে পুজো করছে? আশ্চর্য ব্যাপার!'

'হ্যাঁ, বাওয়ানা', কাপালালো বলল, ওয়াকাপাগারা তাকে খুশী করার চেষ্টা করছে। ওরা আশা করছে পুজো পেয়ে যদি চফু-মায়া খুশী হয় তাহলে সে আর ওদের উপর হামলা করতে আসবে না।'

আফ্রিকায় আসার পর থেকেই কুমীর সম্বন্ধে আত্তিলিও যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা থেকে তিনি বুঝেছেন ঐ ভয়ংকর সরীসৃপকে শায়েস্তা করতে পারে শুধু শক্তিশালী

রাইফেল। স্থানীয় নিগ্রোদের বর্শা আর তীর-ধনুক কুমীরের শক্ত চামড়া ভেদ করে মর্মস্থলে আঘাত হানতে পারে না। কিন্তু জলে নামার জায়গাটাকে ঘিরে ফেলে ওয়াকাপাগা জাতি কুমীরের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না কেন সেই কথাটাই আন্তিলিও সাহেবের জিজ্ঞাস্য।

'অনেকবার সেই চেষ্টা হয়েছে,' কাপালালো বলল, 'কিন্তু এখানে খুব বড় গাছ পাওয়া যায় না। হালকা গাছের গুঁড়ি দিয়ে বেড়া লাগিয়ে দেখা গেছে কোন লাভ নেই। কুমীর লেজের আঘাতে ঐ সব বেড়া ভেঙে দেয় অনায়াসে। তা ছাড়া জলে নেমে বেড়া লাগানোর সময় বহু মানুষ কুমীরের খপ্পরে প্রাণ হারায়!'

আন্তিলিও বললেন, 'ওরা তাহলে ফাঁদ পাতে না কেন? ফাঁদের সাহায্যে ঐ শয়তান জানোয়ারগুলোকে নিশ্চয় কাবু করা সম্ভব?'

আন্তিলিওর কথা শুনে চমকে উঠল কাপালালো আর মোট-বাহকের দল— বাওয়ানা বলে কি!

অজ্ঞান অবোধকে জ্ঞান বিতরণ করার চেষ্টা করল কাপালালো, 'চফু-মায়া হচ্ছে ওয়াকাপাগাদের দেবতা। নিজের দেবতাকে কেউ কখনও ফাঁদ পেতে মরার চেষ্টা করতে পারে?'

অকাট্য যুক্তি। সত্যিই তো; দেবতা যতই অত্যাচার করুক, সে দেবতা তো বটে!

'ঠিক আছে', আন্তিলিও বললেন, 'কয়েকটা কুমীরকে আমি গুলি চালিয়ে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। এখন চটপট তাঁবু খাটিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে ফেল। ওয়াকাপাগাদের সাহায্য তো পাওয়া যাবে না।'

একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিল কাপালালো। তারপর সব লোকগুলোকে অন্যান্য কাজে লাগিয়ে দিল। কিন্তু হাজার কাজের মধ্যেও তার দুই চোখের সতর্ক দৃষ্টি ছিল আন্তিলিওর উপর। অতএব আন্তিলিও যখন সঙ্গীতধ্বনি যেদিক থেকে ভেসে আসছে সেইদিকে পদচালনা করার উদ্যোগ করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর সামনে ছুটে এল কাপালালো— 'না বাওয়ানা, ওদিকে যেও না।' কাপালালোর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের আভাস।

'কোথাও যাব না? ওখানে?' আন্তিলিও নদীর দিকে হাত দেখালেন।

'না, কুমীরদের উপর গুলি চালাতে যেও না', দারুণ উদ্বেগে কাপালালোর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল, 'ওখানে গেলে, আর একটা সাদা মানুষের যেভাবে মৃত্যু হয়েছে, তোমারও সেইভাবে মৃত্যু হবে।'

'কি আজে বাজে বকছ?' আন্তিলিও ধমকে উঠলেন, 'এই অঞ্চলে কোন সাদা মানুষ আসে না।'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কাপালালো একটি ঘটনার উল্লেখ করল। ঘটনাটা ঘটেছিল অনেকদিন আগে। কাপালালো তখন বালক মাত্র। সেই সময় জনৈক বেলজিয়ান শিকারীর কাছে মোটবাহকের কাজ করেছিল কাপালালো। ওয়াকাপাগাদের আস্তানার কাছে এসে উক্ত শিকারী

যখন শুনল বহু স্থানীয় মানুষ কুমীরের কবলে প্রাণ হারিয়েছে, তখনই সে জলাভূমিতে গিয়ে রাইফেল চালিয়ে নরখাদক সরীসৃপদের সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলার সঙ্কল্প করল।

নিগ্রোরা তাকে নিষেধ করেছিল। শিকারী কারও কথায় কান দিল না। একটা 'ক্যানো' (বিশেষ ধরনের নৌকা) নিয়ে কুমীর-শিকারে যাত্রা করল বেলজিয়ান শিকারী। তার সঙ্গে ছিল দুজন স্থানীয় মানুষ। শিকারীর কাছ থেকে প্রচুর হাতির মাংস পেয়ে লোক দুটি রাইফেলধারী শ্বেতাঙ্গকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল। একদিন খুব ভোরে যাত্রা করল তিনটি মানুষ এবং জলার ধারে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল মোটবাহকের দল, ওয়াকাপাগাদের জনতা এবং কাপালালো স্বয়ং। কিছুক্ষণ পরেই দূর থেকে ভেসে এল রাইফেলের আওয়াজ। তারপরই জাগল মনুষ্যকণ্ঠের অস্ফুট আর্তনাদ। জনতা বুঝল কুমীরের কবলে প্রাণ হারাল তিনটি দুঃসাহসী মানুষ। 'ক্যানো' নৌকাটাও নিখোঁজ হয়ে গেল; সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল দাঁড়-বৈঠা, নিগ্রোদের দুটি বর্শা, শিকারীর রাইফেল।

কাপালালোর গল্প শুনে সমস্ত ব্যাপারটা কি ঘটেছিল সহজেই অনুমান করতে পারলেন আন্তিলিও। জলাভূমির মধ্যে কোন একটি কুমীরকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল বেলজিয়ান শিকারী, তারপরই আহত জন্তুটার আক্রমণে অথবা অন্য কোন কুমীরের হামলার মুখে নৌকাটা ভেঙেচুরে ডুবে গিয়েছিল বলেই মনে হয়— কারণ, একবারের বেশী গুলির শব্দ শোনা যায়নি। নৌকা চালিয়ে অকুস্থলে গিয়ে লোকগুলোর সন্ধান নেওয়ার সাহস কারুরই ছিল না। সে ধরনের চেষ্টা করেই বা কি লাভ হত? জলের মধ্যে এক ঝাঁক মানুষখেকো কুমীরের কবলে পড়লে তিনটি মানুষের পক্ষে কিছুতেই আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। ঐ অঞ্চলের জলাভূমি অসংখ্য নরখাদক কুম্ভীরের বাসস্থান।

'কয়েক বছর আগে আরও একটি সাদা মানুষ এখানে এসেছিল,' কাপালালো আবার বলতে শুরু করল, 'সেই লোকটি ছিল ভারি সাহসী, প্রকাণ্ড জোয়ান। আমি নিজের চোখে দেখেছি, সেই সাদা মানুষ হাতি, সিংহ আর মোষের সামনে গিয়ে ফটো তুলেছে। জন্তুগুলোর সামনে যাওয়ার সময়ে সে একটুও ভয় পেত না। তার সঙ্গে রাইফেল থাকত। সে গুলি চালিয়ে শিকারও করত। তার হাতের টিপ ছিল দারুণ ভালো, কোন সময়েই গুলি ফসকাত না। ঐ লোকটিও চফু-মায়ার কথা শুনে তাকে মারতে গিয়েছিল। চফু-মায়া হল দেবতা— তাকে মারা কি সম্ভব? সেই সাদা মানুষটাকে খেয়ে ফেলেছিল চফু-মায়া।'

কাপালালোর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে আন্তিলিও বুঝলেন ঐ লোকটি ছিল ইংল্যাণ্ডের মানুষ। ফটো তোলা এবং শিকার ছিল উক্ত ইংরেজের নেশা। আন্তিলিও কাপালালোর মুখ থেকে ঐ ইংরেজ-শিকারী সম্পর্কে আরও সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। দিনের বেলা নাকি ঘুমিয়ে কাটাত ইংরেজ, আর রাইফেল ও ক্যামেরা নিয়ে নদীর ধারে অপেক্ষা করত সারা রাত জেগে। খুব সম্ভব নদীতটে বিশ্রামরত কুমীরের ফটো তোলার চেষ্টা করেছিল সে। অথবা এমনও হতে পারে কুম্ভীর ও জলহস্তির দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিরল দৃশ্য আলোকচিত্রে তুলে নেওয়ার জন্য সে ব্যগ্র হয়েছিল। তবে তার সঠিক উদ্দেশ্য কি ছিল সেটা আর জানা সম্ভব নয়, কারণ এক রাতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল সেই ইংরেজ-শিকারী। অকুস্থলে গিয়ে

গ্রামবাসীরা ভিজে মাটির উপর শিকারীর দেহের ছাপ এবং রাইফেল দেখতে পায়। ঐখানেই ছিল কুমীরের গুরুভার দেহের সুগভীর পদচিহ্ন। মাটির উপর দিয়ে মনুষ্য শরীর টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্নও ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। শিকারী যে হঠাৎ নিদ্রার আবেশে অসাবধান হয়ে পড়েছিল এবং সেই সুযোগে জল থেকে ধূর্ত চফু-মায়া যে শিকারীর নিদ্রাকে চিরনিদ্রায় পরিণত করে দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাপালালোর বিবৃতি শুনে আত্তিলিওর বক্তব্য হল নদীগর্ভে অবস্থিত অসংখ্য কুমীরের মধ্যে যে কোন একটি জীবের পক্ষেই শিকারীকে গ্রাস করা সম্ভব, কিন্তু স্থানীয় নিগ্রোরা ঐ লোকটির মৃত্যুর জন্য চফু-মায়াকে দায়ী করেছে কোন্ প্রমাণের জোরে?

উত্তরে কাপালালো জানাল পায়ের ছাপ দেখেই স্থানীয় মানুষ বুঝতে পেরেছিল উক্ত শিকারীর হত্যাকারী হচ্ছে চফু-মায়া স্বয়ং। ঐ বিরাট কুমীরটার পদচিহ্নের বৈশিষ্ট্য স্থানীয় নিগ্রোদের সুপরিচিত, পায়ের ছাপ সনাক্ত করতে তাদের ভুল হয়নি একটুও।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল কাপালালো। সঙ্গীতধ্বনি এবার এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। যেদিক থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছিল সেই দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই আত্তিলিওর দিকে ফিরল কাপালালো, 'বাওয়ানা, কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাও। এমন ভাব করবে যেন তুমি এখানকার কোন খবরই রাখো না। দুটি কুমারী মেয়ে মারা পড়েছে, আর দু'জনই হচ্ছে যমজ। কাজেই এবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। কোন সাদা মানুষ চোখে যা দেখেনি, সেই আশ্চর্য যাদুর খেলা দেখতে পাবে তুমি। শুধু একটু ধৈর্য চাই।'

পথের বাঁকে এইবার আত্মপ্রকাশ করল একটি ছোট-খাট মানুষ। দুটি মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে আসছিল ঐ লোকটি। তার পিছনে হৈ হৈ করতে করতে ছুটছিল শত শত লোকের জনতা। আত্তিলিও এবং তাঁর সঙ্গীদের পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল সবাই। কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

'আমাকে বিশ্বাস কর বাওয়ানা', কাপালালো বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি এখানে কয়েকটা দিন থেকে যাও।'

জায়গাটা ছিল খুব গরম আর কটুগন্ধে পরিপূর্ণ। তবু আত্তিলিও স্থানত্যাগ করলেন না। সেই রাতেই তিনি স্থির করলেন কয়েকটা দিন কাপালালোর কথামতো চলবেন। ভালোই করেছিলেন বলতে হবে, জায়গাটা ছেড়ে চলে গেলে এক আশ্চর্য দৃশ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন।

দৈর্ঘ্যে পঁয়ত্রিশ ফুট এবং ওজনে চার টন এক মহাশক্তিধর অতিকায় দানবের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল একটি নগণ্য মানুষ এবং সেই চমকপ্রদ দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্যটিকে স্বচক্ষে দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন আত্তিলিও গত্তি। যথাসময়ে উক্ত ঘটনার বিবরণ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ওয়াকাপাগাদের গ্রামে আত্তিলিও

ওয়াকাপাগাদের বিশ্বাস অর্জন করতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগল। ওয়াকাপাগা এক আদিম জাতি, আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসতে তারা অনিচ্ছুক। তাদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। বেলজিয়ানরা কঙ্গোতে উপনিবেশ স্থাপন করার পর ওয়াকাপাগাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে এমন কথা বলা যায় না। বেলজিয়ান শাসক ওয়াকাপাগাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করার চেষ্টা করেছিল। কোন লাভ হয়নি। তারা এক পয়সাও রোজগার করে না, ট্যাক্স দেবে কোথা থেকে? তখন তাদের ভিতর থেকে শক্তসমর্থ লোকগুলোকে বেলজিয়ান সরকার ধরে নিয়ে গেল রাস্তা তৈরীর কাজের জন্য। অর্থাৎ বেগার খেটে তাদের খাজনা দিতে হবে। এর মধ্যে আবার ওয়াকাপাগাদের আস্তানায় হল এক পাদ্রীর আর্বিভাব। খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রীসাহেব ওয়াকাপাগা জাতির রীতিনীতির নিন্দাও শুরু করলেন। স্থানীয় মানুষ ক্ষেপে গেল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াত বলা মুশকিল, কিন্তু সমস্ত সমস্যার সহজ সমাধান করে দিল চফু-মায়া— সুযোগ বুঝে সে একদিন পাদ্রীসাহেবকে টপ করে খেয়ে ফেলল! ঐ সঙ্গে বেলজিয়ান অফিসারটিকেও যদি চফু-মায়া ফলার করে ফেলত তাহলে ওয়াকাপাগারা অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যেত।

আত্তিলিওর মন্তব্য শুনে ওয়াকাপাগাদের যাদুকর বিরস বদনে ঘাড় নেড়েছিল, 'লোকটির সঙ্গে অনেক সৈন্য ছিল যে!'

যাই হোক, বেলজিয়ান সরকারের আচার-আচরণ ওয়াকাপাগারা মোটেই পছন্দ করত না। পূর্বে উল্লিখিত বেলজিয়ান ও ইংরেজ শিকারীর মৃত্যুর পর তাদের গ্রামে সরকারী তদন্ত হয়েছিল। শিকারীদের অপঘাত মৃত্যুর জন্য ওয়াকাপাগা জাতির উপর মোটা টাকার জরিমানা ধার্য করা হল এবং সেই টাকা পাওয়া গেল না বলে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ শাসক ওয়াকাপাগাদের ভিতর থেকে অনেকগুলো জোয়ান মানুষ নিয়ে গেলেন বেগার খাটার জন্য। অর্থাৎ বেগার খেটেই জরিমানার টাকা শোধ দিতে হবে।

এমন সব ঘটনার পর আত্তিলিও সাহেবকে দেখে গ্রামের লোক যদি ভাব জমানোর জন্য এগিয়ে না আসে তাহলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। আত্তিলিও তাদের দোষ দেননি। তবে ওয়াকাপাগাদের মনোভাব দেখে তাঁর মনে হয়েছিল সঙ্গে একদল সৈন্য থাকলে নিরাপত্তা সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। অবশ্য সৈন্য না থাকলেও কাপালালো ছিল। ছোটখাট একটা সৈন্যদলের চাইতে কাপালালোর একক উপস্থিতি যে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে আত্তিলিও ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

কয়েকটা দিনের মধ্যে ওয়াকাপাগাদের সর্দার, যাদুকর প্রভৃতি মাতব্বর শ্রেণীর হোমড়া-চোমড়াদের সঙ্গে মেলামেশা করে কাপালালো তাদের বুঝিয়ে দিল আত্তিলিও গত্তি লোকটা খারাপ নয় এবং সরকারের সঙ্গে ঐ সাদা মানুষটার কোন সম্পর্ক নেই। কাপালালো আরও বলল যে, যদি ওয়াকাপাগারা তাদের যাদুর খেলা আত্তিলিওকে দেখাতে রাজি হয়

তাহলে তিনি তাদের অনেক টাকা দেবেন। ঐ টাকা বেলজিয়ান শাসকের হাতে তুলে দিলে আর বেগার খাটার জন্য তাদের লোকগুলোকে সরকার ধরে নিয়ে যাবে না।

বেলজিয়ান কঙ্গোতে প্রবেশ করার আগে আন্তিলিও একটা পঞ্চাশ ডলারের বিল ভাঙ্গিয়ে বেলজিয়ান মুদ্রায় খুচরো করে নিয়েছিলেন। সেই খুচরো টাকার পরিমাণ কম নয়— তিনটি থলে ভর্তি টাকা যখন আন্তিলিও তুলে দিলেন ওয়াকাপাগা-সর্দারের হাতে, তখন আর তাঁর সদিচ্ছায় কারও সন্দেহ রইল না। ওয়াকাপাগা জাতির মধ্যে যে মানুষটিকে সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে মনে করা হয় এবং যার কথা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বেদবাক্যের মতোই অভ্রান্ত, সেই মাতুংগো নামক ব্যক্তিটি বলে উঠল, 'বাওয়ানা আমার বন্ধু। তাকে সব কিছুই দেখানো হবে।'

'আগামীকাল,' মাতুংগোর কথায় সম্মতি জানিয়ে বলে উঠল সর্দার, 'আবার নদীর ধারে কুমারী মেয়েরা নাচবে। ওরা নাচবে চফু-মায়ার জন্য এবং বাওয়ানার জন্য।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি

আধুনিক সভ্যতা যাদের স্পর্শ করেনি, সেই সব আদিম জাতি খুব সরল ও বিশ্বাসী হয়। ওয়াকাপাগা জাতিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একবার বন্ধুভাবে গ্রহণ করার পর তারা আন্তিলিওর কাছে কিছুই গোপন করার চেষ্টা করল না। কাপালালো যে যাদুর খেলার উল্লেখ করেছিল এইবার সেই যাদু-রহস্য খোলাখুলি ভাবে জানতে পারলেন আন্তিলিও।

পর পর দুটি যমজ ভগ্নীকে অবিবাহিত অবস্থায় ভক্ষণ করেছে চফু-মায়া, এখন ওয়াকাপাগা জাতির সামাজিক নিয়ম অনুসারে ঐ কন্যা দুটির পিতাকে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

কারণও বুঝিয়ে বলা হল। যদি যুদ্ধে কন্যাদের পিতা নিহত হয় তাহলে তার আত্মা কুম্ভীরের উদরে আবদ্ধ কন্যাদুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে আর এক পৃথিবীতে— সেখানে শোক-দুঃখ নেই, আছে শুধু আনন্দ। আর যদি কন্যাদের পিতা যুদ্ধে জয়ী হয়, তবে কুমীরের পেট চিরে সে কন্যাদুটিকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করবে এবং মুক্ত আত্মা দুটি সর্বদাই পিতার সঙ্গে থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাকে সুখে-আনন্দে পরিপূর্ণ করে রাখবে, তাদের চেষ্টায় পিতৃদেবের ধন-সম্পদও বৃদ্ধি পাবে।

চফু-মায়ার কবলে নিহত যমজ ভগ্নীদের পিতার নাম নগুরা গুরা। লোকটির দিকে তাকিয়ে আন্তিলিও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন— ক্ষীণকায়-শান্তশিষ্ট এই বয়স্ক মানুষটি লড়াই করবে, নরভুক অতিকায় কুম্ভীরের সঙ্গে? অসম্ভব, নিশ্চয়ই তিনি কোথাও ভুল করছেন!

'তুমি কি বলতে চাও,' নগুরা-গুরার দিকে আঙুল দেখিয়ে যাদুকর মাতুংগোকে জিজ্ঞাসা করলেন আন্তিলিও, 'ঐ লোকটি চফু-মায়ার সঙ্গে লড়াই করবে?'

— 'হ্যাঁ, বাওয়ানা।'

— 'একা? ওর হাতে রাইফেল থাকবে তো?'

— 'ও একাই লড়বে। ওর হাতে রাইফেল থাকবে না।'

যাদুকরের কুটিরের মধ্যে চুপ করে বসেছিল নগুরা-গুরা। মাথা নেড়ে যে মাতুংগোর কথায় সায় দিল।

আবার আন্তিলিওর প্রশ্ন, 'তবে বোধ হয় বিশেষ ধরনের কোন ফাঁদ নিয়ে ও লড়াই করবে?'

'না, বাওয়ান। ফাঁদের সাহায্য ছাড়াই ও লড়বে। ওর হাতে থাকবে একটা ছুরি আর একটা দড়ি। একমাত্র ওর নিজস্ব ডান হাতটা ছাড়া আর কেউ ওকে সাহায্য করতে আসবে না।'

নগুরা-গুরা নামক ছোটখাট মানুষটি আবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

যাদুকর মাতুংগো বলল, 'চফু-মায়া যখন বোঝে বিপদের ভয় বিশেষ নেই তখনই সে দেখা দেয়। আর ওয়াকাপাগাদের পক্ষে চফু-মায়ার মোকাবিলা করার ঐ একটি সুযোগই আছে। দড়ি আর ছুরি হচ্ছে একমাত্র অস্ত্র যা দিয়ে চফু-মায়ার সঙ্গে লড়াই করা যায়।'

মাতুংগোর কণ্ঠ শান্ত, নিরুদ্বেগ। আন্তিলিও সবিস্ময়ে দেখলেন নগুরা-গুরার ভাবভঙ্গিতেও কিছুমাত্র উত্তেজনার চিহ্ন নেই। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস আর সাহসের অধিকারী না হলে কোন মানুষই নরখাদক কুম্ভীরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামার আগে এমন নিশ্চিন্তভাবে বসে থাকতে পারে না।'

মাতুংগোর গলার স্বর আন্তিলিওর কানে এল, 'তুমি নিজের চোখেই সব দেখবে।'

নগুরা-গুরা সায় দিল, 'হ্যাঁ, সময় এলেই দেখতে পাবে।'

.....সময় এল কয়েক সপ্তাহ পরে॥

অন্তর্বর্তী দিনগুলো অবশ্য একঘেঁয়ে লাগেনি আন্তিলিওর কাছে। প্রত্যেক দিন বাদ্যসহযোগে নৃত্যগীত চলত নদীর ধারে। রোদের তাপ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটা ছায়াঘেরা জায়গা বেছে নিতেন আন্তিলিও। তারপর সেখানে বসে উপভোগ করতেন ওয়াকাপাগা জাতির নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। ঢালের উপর বর্শাদণ্ডের আঘাতে বাজনা বাজিয়ে গান গাইত যুবকের দল, নাচতে নাচতে নদীর জলে নামত কয়েকটি কুমারী মেয়ে, গায়ের জামা আর মাথার টুপি খুলে ভাসিয়ে দিত জলে— পরক্ষণেই নদীর বুক ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে উঠে আসত সেইখানে, যেখানে বসে আছে নগুরা-গুরা। মুহূর্তের মধ্যে কাছাকাছি দুটি মেয়ের হাত চেপে ধরত নগুরা-গুরা, তারপর চারদিকে দণ্ডায়মান জনতার ব্যূহ ভেদ করে ছুটত মেয়ে দুটির হাত ধরে। সমবেত জনতাও চিৎকার করতে করতে ছুটত তাদের পিছনে।

কোলাহল থেমে যেত ধীরে ধীরে। পরিশ্রান্ত লোকগুলো কুটিরে প্রবেশ করত আহারাদি সাঙ্গ করে বিশ্রাম নেবার জন্য।

বহুদিন আফ্রিকাতে কাটিয়ে কয়েকটি বিষয়ে আন্তিলিও খুব সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকা ও ইউরোপের অধিকাংশ মানুষই নিগ্রোদের যাদুবিদ্যার অনুষ্ঠান প্রভৃতিকে 'বুজরুকি'

বলে উড়িয়ে দেয়— কিন্তু আন্তিলিও জানতেন এই অনুষ্ঠানগুলো মোটেই বুজরুকি নয়, ঐ সব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনস্তত্ত্বের জটিল বিজ্ঞান।

যাদুকররা মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে, বিশেষতঃ তার নিজের জাতির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে দস্তুরমতো ওয়াকিবহাল। তার খুব ভালভাবেই জানে মানুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকে কেমন করে কাজে লাগাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, নদীর ধারে নাচগান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারগুলোকে ধরা যাক—

রোজ সকালে তুমুল কোলাহল তুলে একই দৃশ্যের বারবার, অভিনয় করার ফলে স্থানীয় মানুষের মনে দুর্ঘটনার স্মৃতি খুব দাগ কেটে দেবে, তারা ভবিষ্যতে অসাবধান হবে না, সুতরাং দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমবে।

নদীর ধারে চিৎকার-চেঁচামেচির ফলে কুমীরের দল হবে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত, সুযোগ পাওয়া মাত্র তারা মানুষকে আক্রমণ করবে। অর্থাৎ নগুরা-গুরাকে যাতে চফু-মায়া এগিয়ে এসে আক্রমণ করে সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে। প্রতিদিন মেয়েদের গায়ের জামা আর মাথার টুপি ভেসে যাচ্ছে চফু-মায়ার আস্তানার দিকে, ঐ সব জিনিসগুলো থেকে ক্রমাগত প্রিয় খাদ্যের গন্ধ পেতে পেতে নরমাংসের লালসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে ওয়াকাপাগাদের নরখাদক দেবতা— যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নগুরা-গুরার দিকে চফু-মায়াকে আকৃষ্ট করার এটাও এক অভিনব কৌশল! রণক্ষেত্র সাজানোর সঙ্গে সঙ্গে চফু-মায়ার প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাটিকেও প্রস্তুত করা হচ্ছিল ধীরে ধীরে— কুটিরের মধ্যে প্রতিদিন সঙ্গোপনে মাতুংগো যে কি মন্ত্র দিত নগুরা-গুরার কানে সে কথা জানা সম্ভব নয় আন্তিলিওর পক্ষে, কিন্তু ছোটখাট মানুষটির মধ্যে মাতুংগোর প্রভাব যে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিপুণ কর্মকার যেমন ভোঁতা লোহাকে শান দিতে দিতে ধারালো অস্ত্রে পরিণত করে, ঠিক তেমনিভাবেই যাদুকর মাতুংগোর হাতে শান খেতে খেতে ঝরে পড়ছিল নগুরা-গুরার আলস্য অবসাদ আর আতঙ্কের অনুভূতি— তুচ্ছ মানবের ক্ষুদ্র দেহের অন্তস্থল ভেদ করে জন্মগ্রহণ করছিল এক প্রতিহিংসা-পরায়ণ দৈত্য!

নগুরা-গুরার মুখের দিকে তাকিয়ে আন্তিলিও বুঝতে পারলেন সে বদলে যাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি, চোয়ালের কাঠিন্য আর দৃঢ় পদক্ষেপ থেকে বোঝা যায় নগুরা-গুরার ভিতর জেগে উঠেছে অদম্য আত্মবিশ্বাস— নরখাদক অতিকায় কুম্ভীরের সঙ্গে দ্বৈরথ রণে অবতীর্ণ হতে সে একটুও ভীত নয়! এমনকি আন্তিলিও সাহেবেরও একসময় মনে হল একটা কুমিরকে হাতাহাতি লড়াইতে মেরে ফেলা এমন কি কঠিন কাজ?

দুর্ভেদ্য বর্মের মতো কঠিন চর্মে আবৃত পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা ধূর্ত ও হিংস্র নরভুকের বিরুদ্ধে ছুরিকা-সম্বল একটি মানুষের জয়লাভ করার সম্ভবনা খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল আন্তিলিওর কাছে— এও কি মন্ত্রের প্রভাব? না, মনস্তত্ত্বের মহিমা?....

সোম, মঙ্গল, বুধ—

তিনদিন হল নাচগান প্রভৃতি সব অনুষ্ঠান বন্ধ। নদীতট নির্জন। মেয়েরাও নদী থেকে জল আনতে যায় না। যাদুকর মাতুংগোর নির্দেশ— কেউ যেন নদীর ধারে না আসে; আবার নতুন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই রাখতে হবে।

বৃহস্পতিবার সকালে পা টিপে টিপে সন্তর্পণে কাপালালো প্রবেশ করল আন্তিলিওর তাঁবুতে, তারপর তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

কাপালালোর কথামতো তাকে অনুসরণ করলেন আন্তিলিও। কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার। এমনকি ছাগলদেরও দেখা যাচ্ছে না। ফিস ফিস করে কাপালালো জানাল, যতক্ষণ পর্যন্ত মাতুংগো আদেশ না দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটি প্রাণীও কুটিরের বাইরে আত্মপ্রকাশ করবে না। মাতুংগো জানিয়েছে বাওয়ানার রাইফেলের শব্দই হচ্ছে গ্রামবাসীদের বেরিয়ে আসার সংকেত। লোকজনের উপস্থিতি বা কথাবার্তার শব্দে যাদুবিদ্যা প্রয়োগের ব্যাঘাত হতে পারে বলেই নাকি এই ব্যবস্থা! সমগ্র এলাকার মধ্যে শুধু একটা ছাগকণ্ঠের 'ব্যা ব্যা' ধ্বনি ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। ছাগলের গলার আওয়াজটা ভেসে আসছিল কুয়াশায় ঢাকা নদীতট থেকে।

নদীর ধারে পৌঁছে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ছাগশিশুকে দেখতে পেলেন আন্তিলিও। নিতান্তই কচি বাচ্চা কুমিরের প্রিয় খাদ্য।

কথা না বলে প্রায় তিরিশ ফুট দূরে অবস্থিত আর একটা গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল কাপালালো। গাছটা খুব শক্ত, কিন্তু নমনীয়। ওয়াকাপাগারা ঐ জাতের গাছ থেকেই তাদের ধনুক তৈরি করে। আন্তিলিও দেখলেন নির্দিষ্ট গাছটির ডগার দিকে একটা দড়ি বাঁধা আছে। দড়ির পাক খুব আলগা অবস্থায় ঝুলতে ঝুলতে ছাগশিশুর কাছাকাছি গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।

ঘন সন্নিবিষ্ট একটা ঝোপের কাছে আন্তিলিওকে টেনে নিয়ে গেল কাপালালো। তারপর পাশেই সে গুঁড়ি মেরে বসল। সঙ্গে সঙ্গে একটু দূরে আর একটা ঝোপের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করল আরও দুটো মনুষ্য-মূর্তি।

একজন হচ্ছে নগুরা-গুরা। তার ডান হাতের পুরো বাহু থেকে কব্জি পর্যন্ত জড়িয়ে অবস্থান করছে গাছের পুরু আবরণ বা 'ব্যান্ডেজ'।

অপর লোকটি মাতুংগো। তার হাতে একটা অদ্ভুত অস্ত্র। সে যখন নীচু হয়ে মাটি থেকে দড়ির ঝুলে পড়া অংশটা তুলে হাতের অস্ত্রটার মাঝামাঝি জায়গায় জড়িয়ে নিচ্ছে, ঠিক তখনই বস্তুটির স্বরূপ নির্ণয় করতে পারলেন আন্তিলিও।

জিনিসটা হচ্ছে দোফলা ছুরি, দুটো ধারালো ফলার মাঝখানে বসানো আছে শক্ত কাঠের বাঁট। কাঠের বাঁটের মাঝখানে শক্ত করে দড়িটা বেঁধে মাতুংগো হঠাৎ নগুরা-গুরার কাঁধ চেপে ধরল। জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে দড়ি বাঁধা দোফলা ছুরিটা তুলে দিলে নগুরা-গুরার

হাতে। একবার তীব্র দৃষ্টিতে নগুরা-গুরার চোখের দিকে তাকাল মাতুংগো— আবার ঝাঁকুনি! খুব জোরে মাথা নাড়ল নগুরা-গুরা, তারপর ঘুরে গিয়ে ছাগশিশুর নিকটবর্তী গাছটার পিছনে বসে পড়ল। আত্তিলিওর মনে হল যাদুকর মাতুংগোর চোখের দৃষ্টি থেকে যেন এক অদৃশ্য শক্তি ধাক্কা মেরে নগুরা-গুরার দেহটাকে যথাস্থানে বসিয়ে দিল!

এতক্ষণে সমস্ত পরিকল্পনাটা আত্তিলিওর কাছে পরিষ্কার হল। নগুরা-গুরার সর্বাঙ্গে যে তৈলাক্ত বস্তুটি মাখানো আছে, সেই পদার্থটির গন্ধ মানুষের গায়ের গন্ধ ঢেকে রাখবে— ছাগশিশুর ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এলেও চফু-মায়া তার ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে মানুষের উপস্থিতি বুঝে সতর্ক হওয়ার সুযোগ পাবে না।

তারপর কি ঘটবে সহজেই অনুমান করা যায়। আচম্বিতে একটা মানুষকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলেই কুমীর তেড়ে যাবে, মুহূর্তের জন্য খুলে যাবে দুই চোয়ালের প্রকাণ্ড হাঁ, পরক্ষণেই শত্রুকে মুখ-গহ্বরে বন্দী করার চেষ্টায় সশব্দে বন্ধ হয়ে যাবে দন্তসজ্জিত দুই চোয়ালের মরণ-ফাঁদ।

সেই হাঁ-করা মুখের সুযোগ নেবে নগুরা-গুরা— পলকের মধ্যে কুমিরের মুখগহ্বরে হাত ঢুকিয়ে এমন কায়দায় সে ছুরিটা ধরবে যে, কুমীরের মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দংশনের চাপে ছুরির দুটো ফলাই সরীসৃপের মুখের ভিতর নরম মাংস ভেদ করে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বসে যাবে; কিন্তু দুটো ধারালো ফলার মাঝখানে অবস্থিত শক্ত কাঠের টুকরোটার জন্য কুমির মুখের হাঁ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারবে না এবং সেই একটুখানি ফাঁকের ভিতর থেকেই চট করে হাত টেনে নিয়ে নিরাপদ ব্যবধানে সরে যাবে নগুরা-গুরা।

'অসম্ভব' আত্তিলিও ভাবলেন, 'এ হচ্ছে উন্মাদের চিন্তা। এটুকু কাঠের টুকরো কখনই কুমিরের প্রচণ্ড দুই চোয়ালের চাপ উপেক্ষা করে টিকে থাকতে পারবে না। নগুরা-গুরার ডান হাত ধরা পড়বে কুমিরের মুখের মধ্যে; জন্তুটা যদি তাকে জলের ভিতর না নিয়ে যায় তাহলেও লোকটার বাঁচার আশা নেই— কারণ কামড়ের চাপে তার হাতখানা নিশ্চয়ই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং ক্ষতস্থানে গ্যাংগ্রিন-এর পচনক্রিয়া শুরু হয়ে লোকটির মৃত্যু অবধারিত।

নগুরা-গুরার অবস্থা বুঝে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন আত্তিলিও। উদ্ভিদের বন্ধন জাল থেকে রাইফেলটাকে তিনি মুক্ত করে নিলেন, তারপর যথসম্ভব নিঃশব্দে 'সেফটি-ক্যাচ' সরিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের 'সাইট' কুড়ি গজের মধ্যে নির্দিষ্ট করতে সচেষ্ট হলেন।

হঠাৎ রাইফেলের উপর এসে পড়ল একটা হাত।

আত্তিলিও চমকে উঠলেন— হাতের অধিকারী যাদুকর মাতুংগো!

যাদুকরের দুই চোখের গভীর দৃষ্টি আত্তিলিওকে তাঁর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিল— তিনি বলেছিলেন কোন কারণেই মানুষ ও সরীসৃপের দ্বন্দ্বযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবেন না।

মাতুংগোর ঠোঁট নড়ে উঠল, কোন শব্দ হল না, কিন্তু ওষ্ঠাধরের কম্পন দেখে তার বক্তব্য বুঝতে পারলেন আত্তিলিও—

'চফু-মায়া আসছে। তুমি একটুও নড়বে না।'

ছাগশিশুর কান্না তখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। চুপ করে অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার জন্য আত্তিলিওর সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট। মনে হচ্ছে কিছুই ঘটবে না। কুয়াশা সরে যাচ্ছে। আত্তিলিও ঘাড় ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন— ঘড়ির কাঁটা বলছে এখানে আসার পর কুড়ি মিনিট পেরিয়ে গেছে।

হঠাৎ মাতুংগোর কনুই-এর চাপ পাঁজরের উপর অনুভব করলেন আত্তিলিও। দুই চোখের দৃষ্টি এদিক-ওদিক চালিত করলেন তিনি, কিছুই নজরে পড়ল না। কোন অস্বাভাবিক শব্দও তাঁর কানে এল না। নগুরা-গুরা বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো, তার পিঠের মাংসপেশীতে এতটুকু কম্পনের সাড়া নেই। একইভাবে কাঁদছে ছাগলের বাচ্চা। আত্তিলিওর চোখে কানে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ধরা পড়ল না।

হঠাৎ আত্তিলিও সাহেবের পাঁজরের উপর থেকে কনুই-এর চাপ সরে গেল। মাতুংগো কি করে ভয়ঙ্করের আগমন-বার্তা পেয়েছিল বলা যায় না, কিন্তু নদীর জলে একটা হলদে সবুজ বস্তুর চলমান অস্তিত্ব এইবার আত্তিলিওর চোখে পড়ল। ছাগশিশুর ভয়ার্ত দৃষ্টি এখন নদীর দিকে, আর্তস্বর তীব্র থেকে তীব্রতর!

ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে নদীর জলে স্পষ্ট হয়ে উঠল প্রকাণ্ড মাথা! আত্তিলিওর মনে হল তিনি স্বপ্ন দেখছেন— এমন প্রকাণ্ড কুৎসিত মস্তকের অস্তিত্ব বাস্তবে কল্পনা করা যায় না। জল ছেড়ে উঠে এল ওয়াকাপাগাদের নরখাদক দেবতা— অতিকায় কুম্ভীর চফু-মায়া!

দড়িতে বাঁধা ছাগল-বাচ্চার কয়েক ফুট দূরে এসে থমকে দাঁড়াল কুমির। আত্তিলিও বুঝলেন এইবার সে শিকারকে কামড়ে ধরবে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মাতুংগো। চিৎকারটা বোধহয় যুদ্ধের সংকেত— মুহূর্তের মধ্যে গাছের আড়াল থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এল নগুরা-গুরা, ছাগশিশুর মাথার উপর দিয়ে মেলে দিল প্রসারিত দক্ষিণ-হস্ত।

বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এসে শত্রুকে আক্রমণ করল চফু-মায়া। সশব্দে খুলে গেল দুই ভয়ঙ্কর চোয়াল। একটা তুচ্ছ মানুষের দুর্বল হাত লক্ষ্য করে এগিয়ে এল চফু-মায়ার দন্ত-কণ্টকিত করাল মুখগহ্বর। পরক্ষণেই আবার ভীষণ শব্দে চোয়াল দুটি বন্ধ হয়ে গেল— কুমীর বুঝি বজ্রকঠিন দংশনে চেপে ধরেছে শত্রুর হাত!

আত্তিলিও চমকে উঠলেন.....নাঃ! নগুরা-গুরা সরে এসেছে! তার ডান হাত এখনও অক্ষত অবস্থায় দেহের সঙ্গে সংলগ্ন, কিন্তু যে-অস্ত্রটা একটু আগেও তার ডান হাতের মুঠির মধ্যে ছিল, সেই দোফলা ছুরিটাকে আর যথাস্থানে দেখা যাচ্ছে না!

চফু-মায়া পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল— পরক্ষণেই এক প্রকাণ্ড ডিগবাজি খেয়ে শূন্যপথে প্রায় পনের ফিট উচ্চতা অতিক্রম করে তার বিশাল দেহ এসে পড়ল নদীগর্ভে! ফোয়ারার মতো ছিটকে উঠল জল, চফু-মায়া হল অদৃশ্য!

তারপর নদীর জল তোলপাড় করে জাগল ঢেউ-এর পর ঢেউ! থর থর করে কাঁপতে লাগল গাছে বাঁধা দড়ি। জলের তলায় আত্মগোপন করে চফু-মায়া প্রাণপণে ছুরি আর দড়ির মারাত্মক আলিঙ্গন থেকে মুখগহ্বরকে মুক্ত করতে চাইছে....

আত্তিলিও বুঝলেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের পালা শেষ ; জয়ী হয়েছে নগুরা-গুরা। সঠিক সময়-জ্ঞান, ক্ষিপ্রতা এবং সংযত স্নায়ুর সাহায্যে ঐ মানুষটি অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলেছে।

কিন্তু চরম মুহূর্তে অসীম সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিলেও বিপদ কেটে যেতেই নগুরা-গুরার অবস্থা হয়েছে নির্জীব জড় পদার্থের মতো। নদীর বুক থেকে ছিটকে এসে জলের ধারা তার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিচ্ছে, তবু তার খেয়াল নেই। চোখ পাকিয়ে সে তাকিয়ে আছে আলোড়িত জলরাশির দিকে ; মনে হচ্ছে এত বড় জীবটাকে সে যে স্বহস্তে মর্মঘাতী আঘাতে পর্যুদস্ত করেছে, ঘটনার এই সত্যতা তার নিজের কাছেই এখন অবিশ্বাস্য !

মাতুংগো তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল নগুরা-গুরার কাঁধের উপর। আত্তিলিও জানতেন তাঁর অনুচর কাপালালো ওই অঞ্চলের এক সাহসী শিকারী— কিন্তু তিনি দেখলেন ঘটনার ভীষণতা তাঁকেও স্তম্ভিত করে দিয়েছে! সম্মোহিত মানুষের মতোই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাপালালো !....

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আত্তিলিওর বিপদ

নদীর বুক থেকে প্রবল বেগে উঠে আসছে উচ্ছ্বসিত জলধারা, সবেগে দুলছে বৃক্ষে আবদ্ধ লম্বমান রজ্জু— চফু-মায়ার বিশাল দেহ জলের তলায় অদৃশ্য থাকলেও তার মৃত্যুকালীন আক্ষেপ নদীতটে দণ্ডায়মান দর্শকের কাছে অতিশয় স্পষ্ট।

কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও চফু-মায়া ছুরির মারাত্মক দংশন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। দোফলা ছুরির ফলা দুটো এমন গভীরভাবে মুখের ভিতর বিঁধে আটকে আছে যে, বেচারা কুমির না পারছে মুখ বন্ধ করতে, না পারছে মুখ খুলতে। সে প্রাণপণে টানাটানির ফলে যন্ত্রণা বাড়ছে, জন্তুটার প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঘাসে পাকানো দড়িটা ভীষণ শক্ত। সেটা ছিঁড়ে ফেলা চফু-মায়ার মতো শক্তিশালী জীবের পক্ষেও সম্ভব নয়। ছুরির সঙ্গে আবদ্ধ দড়িটাকে যে গাছের ডালে বাঁধা হয়েছে, সেই ডালটা যদি টানাটানিতে ভেঙ্গে পড়ে তাহলে যন্ত্রণা থেকে রেহাই না পেলেও কুমির অন্ততঃ সীমাবদ্ধ গণ্ডির বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেতে পারে— কিন্তু তা হওয়ার নয়। আগেই বলেছি ঐ জাতের গাছ যেমন নমনীয় তেমনই কঠিন। গাছটি যে চফু-মায়ার টানাটানি অগ্রাহ্য করে তার অখণ্ডতা বজায় রাখতে সমর্থ, সে-কথা জেনেই পূর্বোক্ত বৃক্ষশাখায় দড়ি বেঁধে নরখাদকের মৃত্যু-ফাঁদ সাজিয়েছে যাদুকর মাতুংগো।

চফু-মায়া সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা পোষণ করলেও তার যন্ত্রণা দেখে ব্যথিত হলেন আত্তিলিও। তিনি স্থির করলেন জলের উপর আহত কুমিরটা একবার মাথা তুললেই তিনি গুলি চালিয়ে তাকে অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে দেবেন।

আচম্বিতে নদীর বুক থেকে ছিটকে এল রক্তাক্ত জলের ধারা আত্তিলিওর দিকে, সচমকে এক লাফ মেরে সরে গেলেন তিনি। ফোয়ারার মতো উচ্ছ্বসিত জলের ধারাটা নদীতটে নিঃশেষ হয়ে যেতেই আবার এগিয়ে গেলেন আত্তিলিও। কিন্তু রাইফেল তুলে ধরার আগেই

তাঁর চোখে পড়ল নদীর জলে ভেসে উঠেছে অনেকগুলো কাঠের গুঁড়ি ! সেই জীবন্ত ও চলন্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলোর স্বরূপ-নির্ণয় করতে আত্তিলিওর ভুল হল না— আহত চফু-মায়ার দিকে ধেয়ে আসছে কুমিরের দল ! দীর্ঘকাল ধরে নদীর বুকে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে শয়তান, ছিনিয়ে নিয়ে জাতভাইদের মুখের গ্রাস বারংবার— সে আজ অসহায় বুঝে প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসছে কুমিরের ঝাঁক ; চফু-মায়ার মৃত্যুযাতনা তারা উপভোগ করতে চায়, তার দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে তারা আজ বসাতে চায় ভোজের আসর !

অতি দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে লাগল হিংস্র সরীসৃপের দল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আত্তিলিও তাকিয়ে রইলেন সেই মাংসলোলুপ মিছিলের দিকে। চফু-মায়া তখনও কাবু হয়নি, প্রবল বিক্রমে সে তখনও ছুরি আর দড়ির মারাত্মক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে— হঠাৎ দলের ভিতর থেকে একটা দুঃসাহসী কুমির এগিয়ে এসে কামড়ে ধরল চফু-মায়ার লেজ !

ঐ ঝটাপটির মধ্যে লক্ষ্যস্থির করা খুবই কঠিন, তবু আত্তিলিও রাইফেল তুলে নিশানা করতে সচেষ্ট হলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে লেজের উপর দন্তাঘাতের যাতনা অনুভব করে চফু-মায়া এক প্রকাণ্ড লাফ মেরে জল থেকে ছিটকে উঠল শূন্যে !

—'বাওয়ানা !'

আত্তিলিওর কানে এল উদ্বিগ্ন কণ্ঠের আহ্বান। মুহূর্তের জন্য তাঁর পার্শ্বদেশে কি-যেন একটা বস্তুর আঘাত অনুভব করলেন তিনি। অজ্ঞাতসারে তাঁর মাংসপেশী সঙ্কুচিত হল, আঙ্গুলের চাপ পড়ল রাইফেলের ট্রিগারের উপর— সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে অগ্নি উদ্‌গার করে হাত থেকে ঠিকরে বেরিয়ে গেল রাইফেল। দোদুল্যমান রজ্জু এবার তাঁর পাঁজরের উপর থেকে সরে এসে আঘাত করল পায়ের উপর— পরক্ষণেই ধনুকছাড়া তীরের মতো আত্তিলিওর দেহ এসে পড়ল কুমিরসঙ্কুল নদীগর্ভে !

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডুবে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি পৌঁছে গেলেন নদীর তলদেশে। চটচটে কাদার মারাত্মক বন্ধন থেকে নিজেকে কোন রকমে মুক্ত করে আত্তিলিও ভেসে উঠলেন, তারপর তীরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন।

জল এখন বুক পর্যন্ত। কিন্তু আত্তিলিও আর অগ্রসর হওয়ার সাহস পেলেন না। তাঁর চারদিকে ঘুরছে কমিরের দল, এখন পর্যন্ত তারা যে আত্তিলিওকে আক্রমণ করেনি এটাই আশ্চর্য। আত্তিলিওর মনে হল দারুণ আতঙ্কে তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। 'সেটা বরং ভালো', আত্তিলিও ভাবলেন, মৃত্যুর আতঙ্কের চাইতে মৃত্যু অনেক ভালো। এখন ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ততই মঙ্গল'....

জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছিলেন আত্তিলিও, হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল নগুরা-গুরার কথা। আফ্রিকার এক আদিম মানুষ যদি ভয়কে জয় করে মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা কষতে পারে, তবে মহাযুদ্ধের সৈনিক হয়ে কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি কি ক্লীবের মতো মৃত্যুর মুখে আত্মসমর্পণ করবেন ? কখনই নয়—

আত্তিলিও আবার অগ্রসর হলেন তীরভূমির দিকে। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই একটা

পাথরের উপর তাঁর পা পড়ল। জল এখন কাঁধের নীচে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন আন্তিলিও। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন কেন কুমিরগুলো তাঁকে আক্রমণ করেনি। চফু-মায়া এখনও লড়াই করছে। দোফলা ছুরির নিষ্ঠুর দংশন চফু-মায়ার শক্তিশালী চোয়াল দুটিকে অকেজো করে দিয়েছে বটে, কিন্তু কাঁটা বসানো লেজের চাবুক হাঁকড়ে সে আক্রমণকারী শত্রুকুলকে বাধা দিচ্ছে বিপুল বিক্রমে। কুমিরের দল এখন তাকে নিয়ে ব্যস্ত, তুচ্ছ একটা মানুষকে নিয়ে তারা মাথা ঘামাচ্ছে না— আগে চফু-মায়া, তারপর......

'স্টেডি, বাওয়ানা,' মাথার উপর থেকে ভেসে এল কাপালালোর কণ্ঠস্বর, 'স্টেডি।'

সচমকে মুখ তুলে আন্তিলিও দেখলেন তাঁর মাথার উপর একটা গাছের ডালে হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে কাপালালো— ডালটাকে নীচু করে আন্তিলিওর নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। তার পিছনে ঘন পাতার আড়ালে বসে রয়েছে আরও দুটি মানুষ। তাদের মধ্যে একজন শক্ত মুঠিতে কাপালালোর দুই পায়ের গোড়ালি ধরে রেখেছে এবং তার পশ্চাৎবর্তীর হাতের মুঠিতে রয়েছে পূর্ববর্তী মানুষটির পা। আন্তিলিওর সঙ্গে সেই জীবন্ত শিকলের প্রথম সংযোগশৃঙ্খল কাপালালো। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তিনটি মানুষের আলিঙ্গনে-আবদ্ধ জীবন্ত শৃঙ্খল, আরও ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল বৃক্ষশাখা জলের দিকে.......

এইবার কাপালালো বলল, 'যতটা সম্ভব উঁচু হয়ে গাছের ডালটা ধর বাওয়ানা। তারপর অপেক্ষা কর।'

শরীরের সমস্ত শক্তি জড় করে আন্তিলিও লাফালেন। ডালটা ধরে ফেললেন তিনি। ডাল ধরলেও শরীরটাকে উপরে তোলা সম্ভব হল না, তাঁর অবশ দেহ ঝুলে পড়ল নীচের দিকে। কিন্তু হাতের আঙ্গুলগুলো লোহার সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরল ডালটাকে। আন্তিলিওর দেহের ওজন সেই আঙ্গুলের বাঁধনকে শিথিল করতে পারল না।

—'রেডি!'

কাঁধের সন্ধিস্থলে একটা তীব্র যাতনা অনুভব করলেন আন্তিলিও। পরক্ষণেই কুম্ভীরসঙ্কুল নদীগর্ভ থেকে তাঁর দেহটা প্রবল আকর্ষণে শূন্যে উঠে এল! কাপালালো আর তার দুই সঙ্গী তাঁকে কি করে উদ্ধার করেছিল এবং জলের উপর দোদুল্যমান সেই বৃক্ষশাখায় ভারসাম্য বজায় রেখে কোন প্রক্রিয়ায় আন্তিলিওর অচেতন শরীরটাকে তারা শক্ত মাটির নিরাপদ আশ্রয়ে নামিয়ে এনেছিল সেই রহস্য আন্তিলিওর কাছে আজও অজ্ঞাত— কারণ, নিগ্রোরা যখন তাঁর উদ্ধার কার্যে ব্যস্ত, তিনি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সব ভালো যার শেষ ভালো

'এটা নাইনির গয়না, হাতির দাঁতের তৈরী,' একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন আন্তিলিও, 'আর এই তামার ''ব্রেসলেট'' হল নাইনির সম্পত্তি! ঐ ''ক্রস'' হচ্ছে পাদ্রীসাহেবের জিনিস।'

আচ্ছন্নের মতো শুয়ে শুয়ে কথাগুলো শুনতে পেলেন আন্তিলিও। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? স্বপ্ন কি কথা কয়? অতি কষ্টে চোখের পাতা মেলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করলেন তিনি। একটা চোখ খুলল। আরেকটা খুলল না, কারণ সেই চোখটার উপর লাগানো ছিল 'ব্যাণ্ডেজ' গোছের একটা আবরণ। যে-কণ্ঠস্বর মগ্ন চৈতন্যের দ্বারে আঘাত করে আন্তিলিওর চেতনা ফিরিয়ে এনেছিল, সেই কণ্ঠস্বরের মালিককে সন্ধ্যার আলো-আঁধারির মধ্যেও চিনতে পারলেন আন্তিলিও— মাতুংগো!

কাপালালোকেও সেখানে দেখতে পেলেন আন্তিলিও। তাঁর তাঁবুর মধ্যে তাঁরই বিছানার কাছে মাটির উপর দুজনে বসেছিল। একটা ক্যানভাসের উপর পড়েছিল কয়েকটা জলে-ভেজা জিনিস। মেয়েদের দুটি অলঙ্কার। একটা ক্রস। একটা পুরনো ধরনের ক্যামেরার লেনস্। একটা মস্ত সোনার ঘড়ি এবং ঘড়ির সঙ্গে আটকানো একটা ভারি সোনার চেন ইত্যাদি.....

'বাওয়ানা এইবার আমাদের কথা বিশ্বাস করবে!' মাতুংগো বলল, 'সে যখন দেখবে নগুরা-গুরা চফু-মায়ার পেটের ভিতর থেকে এই জিনিসগুলো উদ্ধার করেছে তখন আর আমাদের কথা সে অবিশ্বাস করতে পারবে না।'

'সে এই জিনিসগুলিকেও স্বচক্ষে দেখবে।' কাপালালো বলে উঠল এবং তার হাত থেকে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি দ্রব্য এসে পড়ল মাটিতে রাখা ক্যানভাসের উপর। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটা জিনিস হাতির দাঁতে তৈরী, কতকগুলো আবার ধাতব বস্তু। ঐ জিনিসগুলো পাওয়া গেছে চফু-মায়ার পেটের ভিতর থেকে— নরভুক কুমিরের অপরাধের অকাট্য প্রমাণ। বছরের পর বছর ধরে ঐ জিনিসগুলো জমেছে ওয়াকাপাগাদের নরখাদক দেবতার উদর-গহ্বরে।

'কিন্তু'— আন্তিলিও জানতে চাইলেন, 'কুমিরগুলো চফু-মায়াকে খেয়ে ফেলেনি? জিনিসগুলো পাওয়া গেল কি করে?'

কাপালালো আর মাতুংগো চমকে উঠল। তারা বুঝতেই পারেনি কখন আন্তিলিওর জ্ঞান ফিরে এসেছে। এবার দুজনেই হেসে ফেলল।

'তোমার বন্দুকের আওয়াজ শুনে গ্রামের সব লোক দৌড়ে এসেছিল,' কাপালালো বলল, ' তারাই তোমাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছে। আর দড়ি ধরে টেনে চফু-মায়ার ছিন্নভিন্ন দেহটাকে তারাই তুলে এনেছে ডাঙ্গার উপর। চফু-মায়ার পেটের ভিতর থেকে যে জিনিসগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো এখন নগুরা-গুরার সম্পত্তি। কাল সে জিনিসগুলো গ্রীক ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করবে। ওগুলোর বদলে সে পাবে অনেকগুলো ছাগল।'

কিছুদিন আগে মাতুংগো একটা কথা বলেছিল। সেই কথাটা হঠাৎ এখন আন্তিলিওর

মনে পড়ল, 'যমজ বোনদের আত্মা ওদের পিতাকে খুশি করবে। ঐ আত্মা দুটির কল্যাণে পিতার ধন-সম্পদ বাড়বে, বৃদ্ধ বয়সে সে সুখী হবে।'

মাতুংগো বেশী কথাবার্তা পছন্দ করে না। কাপালালোকে ঠেলে সরিয়ে দিল সে।

'এটা পান করো', সযত্নে আন্তিলিওর মাথাটা তুলে ধরে একটা কাঠের পাত্র তাঁর ঠোঁটের কাছে নিয়ে এল মাতুংগো।

কৃতজ্ঞচিত্তে তরল ওষুধটা পান করে ফেললেন আন্তিলিও। পানীয়টা বলকারক এবং মশলার গন্ধে পরিপূর্ণ।

'ঘুমাও,' মাতুংগো বলল। আন্তিলিওর মাথাটা সে আবার ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল বালিশের উপর।

'ঘুমাও, বাওয়ানা,' কাপালালো বলল, 'আর ভয় নেই। সব ভালো যার শেষ ভালো।'

সৈনিকের ষষ্ঠ অভিজ্ঞতা—

প্রথম পরিচ্ছেদ : রহস্যময় অন্তর্ধান

পূর্ব আফ্রিকার পর্তুগিজ-অধিকৃত উপনিবেশ মোজাম্বিক এর রাজধানী বায়রার ২,০০০ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী একদিন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সিডনি ব্যাঙ্কে বিল নামে যে হিসাব-রক্ষকটি কাজ করে, সে হঠাৎ সেইদিন সকালে তার গৃহে অনুপস্থিত কেন? মাত্র তিনদিন আগে ঐ শহরে মানুষটি পদার্পণ করেছেন, সেই আন্তিলিও গত্তি নামক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিলের আসন্নপ্রসবা তরুণী বধূ ম্যব্রিয়ার শহর ত্যাগ করে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অত্যন্ত রহস্যময়। আন্তিলিওর নিজস্ব গাড়িতে তাঁরই নিগ্রো ড্রাইভারের সঙ্গে ম্যরিয়ার যাত্রা শুরু। সেই সময় যারা মেয়েটিকে দেখেছে তারা চমকে উঠেছে— মেয়েটির মুখ মৃতের মতো বিবর্ণ, রক্তশূন্য!.....

কম্যাণ্ডার আন্তিলিও গত্তির অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী যাঁরা প্রথম থেকে পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে বিল নামধারী যুবকটি অপরিচিত নয়। কিন্তু 'কায়না' ও 'শয়তানের ফাঁদ' যাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়নি, সেই সব পাঠকের পক্ষেও বর্তমান কাহিনীর রসগ্রহণ করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না, যখন তাঁরা জানতে পারবেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তিলিও নামক মিত্রপক্ষের জনৈক সৈনিকের নেতৃত্বে আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মানুষ, জীবজন্তু ও অরণ্য-সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা করতে উক্ত মহাদেশে পদার্পণ করেছিলেন দুটি শ্বেতাঙ্গ অভিযাত্রী—'প্রফেসর', এক ফরাসী চিকিৎসক এবং 'বিল', এক দুঃসাহসী মার্কিন যুবক।

প্রফেসর এই কাহিনীতে অনুপস্থিত, শুধু প্রসঙ্গ উঠল বলে তাঁর উল্লেখ। বিলকে কেন্দ্র করে বর্তমান কাহিনীর অবতারণা।

প্রথম পরিচয়ের সময়ে আন্তিলিও সাহেব ঐ যুবকের আফ্রিকা ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। পরবর্তীকালে আন্তিলিও জানতে পেরেছিলেন অগণিত হস্তিযূথের সংখ্যাকে রাইফেলের সাহায্যে যথাসম্ভব কমিয়ে দেবার জন্যই আফ্রিকার অরণ্যে বিলের আবির্ভাব। হাতি শিকারের জন্য তার অস্বাভাবিক আগ্রহের কারণটা যখন গোপন রইল না, তখন মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন আন্তিলিও— কিন্তু সেইসময় বিলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ

করার উপায় ছিল না, নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দেশে রক্তাক্ত এক পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে অমোঘ ভাগ্যচক্র।

অনেক শিকারীর কাছে হাতি-শিকার নিতান্তই একটা শখ, কিন্তু বিলের ব্যাপারটা তা নয়। সমগ্র হস্তিজাতি সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করত বিল। তার বাল্যকালে সংঘটিত দুর্ঘটনার জন্য দায়ী একটি হাতি এবং সেই ঘটনা বিলের মনোরাজ্যে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করে— শৈশব থেকে কৈশোর আর কৈশোর থেকে যৌবনের পরিণতি এক শোকার্ত শিশুর চিন্তার জগতে ধীরে ধীরে ভিন্ন অনুভূতির জন্ম দেয়, দুঃখ-বেদনার পরিবর্তে জেগে ওঠে প্রতিহিংসার রক্তলোলুপ সংকল্প।

ঘটনাটা ঘটেছিল আমেরিকার 'ডেট্রয়েট' নামক স্থানে। বিল তখন পাঁচ বছরের শিশু। সেইসময় তার বাপ-মা তাকে পূর্বোক্ত স্থানে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সার্কাসের হাতিদের মধ্যে একটি হস্তিনী ছিল শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। লক্ষ লক্ষ শিশু তাকে দেখার জন্য ভিড় করত। হস্তিনীর স্বভাব-চরিত্র খুবই শান্ত, বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য খোকা-খুকুর হাত থেকে বাদাম প্রভৃতি লোভনীয় খাদ্যের উপহার গ্রহণ করেছে ঐ জন্তুটি, কোনদিনই তার আচরণে উগ্রতার আভাস দেখা যায়নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে ক্ষেপে গেল,— তীব্র বৃংহন-শব্দে চারদিক কাঁপিয়ে সে ছিঁড়ে ফেলল পায়ের শিকল, তারপরই শুরু হল ভয়ংকর কাণ্ড। সার্কাসের দড়ি আর বেড়া ভেঙে-চুরে উড়িয়ে ছুটে চলল ক্রোধোন্মত্ত হস্তিনী, চলার পথে মানুষজন যাকে পেল তাকেই শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে সজোরে ছুঁড়ে ফেলল এদিক-ওদিক, এবং অনেকগুলো মানুষকে হতাহত করার পর সে এসে দাঁড়াল একটা মালবহনকারী শকটের সামনে। অন্ধ ক্রোধে আত্মহারা হস্তিনী তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির উপর। খর্বাকৃতি গজদন্ত দুটি শকট ভেদ করে গুরুভার বস্তুটিকে অতি সহজেই শূন্যে তুলে ফেলল— পরক্ষণেই শকটসমেত হস্তিনীর প্রকাণ্ড মৃতদেহ ভীষণ শব্দে গড়িয়ে পড়ল মাটির উপর! বোধহয় হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে জন্তুটার মৃত্যু ঘটেছিল। হৈ-হৈ! চিৎকার! ধুন্ধুমার!

(হস্তিনীর গজদন্তের কথা শুনে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই— এশিয়ার হাতিদের মধ্যে নারীজাতি উক্ত মহাস্ত্রে বঞ্চিতা হলেও প্রকৃতির কৃপায় আফ্রিকার 'মহিলারা' পুরুষদের মতোই দন্তসজ্জায় সুসজ্জিতা, ভয়ংকরী। বলাই বাহুল্য যে, সার্কাসের হস্তিনী ছিল আফ্রিকার জীব।)

যাই হোক, ঐ গোলমালের মধ্যে বাচ্চা বিলকে তার বাপ-মা'র কাছ থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে এনেছিল সার্কাসের জনৈক কর্মচারী। একটু পরেই বিল দেখতে পেল মায়ের মৃতদেহ পড়ে আছে মাটির উপর, পাশেই হাঁটু পেতে বসে আছেন বাবা। এক বছর পরেই বিলের বাবা মারা গেলেন। স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যুর শোক তাঁর আয়ুক্ষয় করে দিয়েছিল।

ঐ দুর্ঘটনার তেইশ বছর পরে নিউইয়র্ক শহরে বিল আর আন্তিলিওর সাক্ষাৎকার। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান-বিষয়ক অভিযান কার্যে সাহায্য করার জন্য সঙ্গী হিসাবে বিলকে নির্বাচিত করেছিলেন আন্তিলিও। তাঁর সিদ্ধান্ত জানার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বিলের মুখ। প্রথমেই আন্তিলিওর কাছে বিল যে প্রশ্নটি করেছিল তার মর্ম হচ্ছে আফ্রিকাতে হাতি-শিকারের সুযোগ আছে কিনা।

'শুধু হাতি কেন', আন্তিলিও উত্তর দিয়েছিলেন, 'সিংহ, লেপার্ড, বন্য মহিষ, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি সব জানোয়ারই ওখানে বাস করে। চেষ্টা করলে গণ্ডার শিকারের সুযোগও হয়ে যেতে পারে।'

'কিন্তু' বিল জোর দিয়ে বলেছিল, 'আমি হাতি মারতে চাই। জঙ্গলের পথে ঘোরাঘুরি করার কায়দা-কানুন শিখে গেলে আমি কি দু'একটা হাতি শিকার করতে পারব না?'

আন্তিলিও জানালেন হাতি মারতে গেলে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। বিনা অনুমতিতে আফ্রিকায় কোথাও হাতি মারতে দেওয়া হয় না, হাতি শিকারের জন্য অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা দরকার। বিভিন্ন উপনিবেশের আইন অনুযায়ী অনুমতি পত্রের জন্য যে মূল্য ধার্য করা হয়, সেটা হচ্ছে বিশ থেকে পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে। বে-আইনীভাবে হাতি শিকার করলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকেন কর্তৃপক্ষ।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে বিল জানিয়ে দিল আইন ভঙ্গ করে হাতি শিকারে তার আগ্রহ নেই। 'টাকাটা কোন প্রশ্ন নয়, হাতি শিকারের অনুমতি পাওয়ার জন্য অর্থব্যয় করতে আমি কুণ্ঠিত নই।' বিলের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠার আভাস, 'কিন্তু হাতি মারতে হলে কি খুব বেশী অভিজ্ঞতার দরকার? আর আমরা যে অঞ্চলে যাচ্ছি সেখানে কি হাতি আছে?'

আফ্রিকার যে অঞ্চলে অভিযাত্রীরা প্রথমে পদার্পণ করেছিলেন, সেই জায়গাটা হচ্ছে গজরাজের প্রিয় বাসস্থান— রোডেশিয়া। শিকারের অভিজ্ঞতার জন্য বিলকে তালিম দেবার দরকার হয়নি, কারণ মাছকে কখনও সাঁতার কাটার তালিম নিতে হয় না— দক্ষ শিকারীর অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি নিয়ে জন্মেছিল বিল, শিকার তার রক্তে রক্তে। দূরদর্শিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি শিকারীসুলভ সব গুণই তার ছিল, সেই সঙ্গে ছিল তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি এবং অতি বলিষ্ঠ একজোড়া পা— দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে বনচারী নিগ্রোরাও যখন শ্রান্ত, তখনও দৃঢ় পদক্ষেপে পথ ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে বিলের আপত্তি নেই। উৎসাহ আর উদ্দীপনায় টগবগ করলেও বিপদের সময়ে বিল সম্পূর্ণ শান্ত, সংযত, নির্বিকার।

কয়েক মাসের মধ্যেই আফ্রিকাবাসী বিভিন্ন হিংস্র পশুর সম্মুখীন হল বিল। জন্তুগুলোকে গুলি চালিয়ে হত্যা করতে তার একটুও অসুবিধা হয়নি। অনভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে যে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা অসম্ভব, সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মরণ-ফাঁদ থেকে অনায়াসে আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে এসেছে বিল,— একবার নয়, বহুবার।

ঐ সব দুঃসাহসিক 'অ্যাডভেঞ্চারে' লিপ্ত হয়ে বিল তার কর্তব্যে কখনও গাফিলতি করে নি। ভোর হওয়ার আগেই সে বেরিয়ে যেত, ফিরে আসত প্রাতরাশের সময়ে। কখনও কখনও অভিযাত্রীদের কর্মবিরতির পরে সে জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়ত নূতন অভিজ্ঞতার সন্ধানে। কঠিন পরিশ্রমের পর অন্তিলিওর দলবল যখন বিশ্রাম নিতে ব্যগ্র, বিলের উৎসাহবহ্নি তখনও প্রদীপ্ত— বিশ্রাম, শয্যা ছেড়ে সে এগিয়ে চলেছে শিকারের খোঁজে, সঙ্গে রয়েছে আন্তিলিওর নিগ্রো পথ-প্রদর্শক ও বন্দুকবাহক মাতোনি!

শিকারের সন্ধান কার্যে মাতোনির দক্ষতা ছিল অসাধারণ, পথ-প্রদর্শক হিসাবেও তার তুলনা হয় না। কিন্তু প্রথম বছরের শেষ দিকে সে আন্তিলিওকে চুপি চুপি জানিয়ে দিল

হাতিদের সঙ্গে 'লম্বা মাসাংগার' (মাতোনির ভাষায় বিলের নামকরণ!) দেখা হওয়াটা প্রেতাত্মাদের আভিপ্রেত নয়— অতএব যতই চেষ্টা করা যাক লম্বা মাসাংগা কখনও হাতির দেখা পাবে না!

ব্যাপারটা সত্যি বড়ই অদ্ভুত। মাতোনির সঙ্গে যথাস্থানে গিয়ে হস্তিযূথের সাক্ষাৎ পেয়েই তাড়াতাড়ি হাতি শিকারের 'পারমিট' বা অনুমতিপত্রের জন্য সচেষ্ট হয়েছে বিল এবং অনুমতিপত্র নিয়ে পূর্বোক্তস্থানে উপস্থিত হয়ে দর্শন করেছে আফ্রিকার নিসর্গশোভা— হাতিরা সেখানে অনুপস্থিত! কয়েকদিন আগেও যেখানে দলে দলে হাতি বিচরণ করেছে, সেখানে আজ একটি হাতিরও পাত্তা নেই! সব ভোঁ ভোঁ!

কিছুদিন পরেই আভিযানের কাজে অভিযাত্রীরা গেছেন আর এক অঞ্চলে। আগেকার অনুমতিপত্র এখানে অচল, কারণ এখানে রাজত্ব করছে আর এক সরকার। সেখানেও হাতিদের দেখা পেল বিল, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টাচরিত্র আর অর্থব্যয় করে আরও একটি 'পারমিট' জোগাড় করল সে, কিন্তু তারপরই আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি! বিলও হাতি শিকারের অনুমতি পেয়েছে আর হাতির দলও হাওয়া হয়ে গেছে সেই তল্লাট ছেড়ে! আশ্চর্য কাণ্ড!

অভিযাত্রীরা যখন মাম্বোয়া জাতির আস্তানায় 'কায়না' বা মৃত্যুগহ্বরের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেই সময়ে বিলের কাছে জমেছে সাত-সাতটি হাতি শিকারের অনুমতিপত্র— কিন্তু অযথা অর্থব্যয় ছাড়া কোনই লাভ হয়নি, একটিও হাতি মারতে পারেনি বিল।

কায়না অভিযানে সাফল্যলাভ করে মাম্বোয়াদের নিয়েই বিল ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মাম্বোয়াদের দেশে প্রায় সবরকম শিকারই সুলভ, কিন্তু হাতিরা ওখানে বাস করে না। তা ছাড়া হাতি শিকারের পক্ষে যে মানুষটির সাহায্য অপরিহার্য, সেই মাতোনিকে আগেই মোজাম্বিক সীমান্তে দক্ষিণ রোডেশিয়াতে তার নিজস্ব গ্রামে পৌঁছে দিয়ে অভিযাত্রীরা এসেছিলেন উত্তর রোডেশিয়ার মাম্বোয়া রাজ্যে— অতএব হাতির পিছনে তাড়া করার সুযোগ পেল না বিল। সকলে ভাবল বিল বোধহয় হাতির কথা ভুলে গেছে।

কায়না অভিযানে সাফল্যলাভ করে মাম্বোয়াদের দেশ ছেড়ে অভিযাত্রীরা এলেন জুলুল্যাণ্ডে। আস্তিলিওর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সেখানকার পরিস্থিতি বেশ ভালো— প্রথমতঃ কয়েকশ' মাইলের মধ্যে হাতির বসবাস নেই, দ্বিতীয়তঃ নরখাদক সিংহদের নিয়ে সকলে এমন ব্যতিব্যস্ত যে অন্য বিষয়ে মাথা ঘামানো অসম্ভব। ইনিয়াতি পর্বতমালার মধ্যে জুলুদের দেশে কয়েক মাস কাটিয়ে দিলেন সবাই। এর মধ্যে একবারও বিলের মুখে 'হাতি' শব্দটি শোনা গেল না। অবশেষে সর্দার জিপোসোর আদেশে অভিযাত্রীরা একদিন জুলুল্যাণ্ডের বাইরের পথটার উপর এসে পড়লেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই বিলের মুখে পরিচিত শব্দটি আবার শুনতে পেলেন সকলে— 'হাতি'! বিল দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিল অভিযাত্রীরা যা খুশী করতে পারেন, যেখানে খুশী যেতে পারেন— কিন্তু সে এখন হাতির সন্ধানে যাত্রা করতে বদ্ধপরিকর, অন্য কোন বিষয়ে মাথা ঘামাতে সে মোটেই রাজি নয়। বিল আরও জানাল বায়রা থেকে লণ্ডন হয়ে নিউইয়র্ক যাওয়ার ভাড়ার টাকা রেখে বাকি সব টাকা প্রয়োজন হলে খরচ করতে তার

আপত্তি নেই— একেবারে কপর্দকশূন্য হওয়ার আগে সে হাতি শিকারের আশা ছাড়বে না।

বিলের আগ্রহ আর সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আস্তিলিও আবার মাতোনির সঙ্গে দেখা করলেন এবং প্রফেসর আর বিলের সঙ্গে ঐ নিগ্রো শিকারীর বায়রা পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

তারপরই হল বিচ্ছেদ। একদিকে গেলেন আস্তিলিও, অন্যদিকে বিল আর প্রফেসর। ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর আর বন্ধুদের খবর পাননি আস্তিলিও। দীর্ঘকাল পরে নূতন অভিযানের উদ্যোগে বায়রাতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আস্তিলিও হঠাৎ বিলের দেখা পেলেন।

বন্দরের মধ্যে যখন আস্তিলিওর নৌকা প্রবেশ করছে, সেই সময় একটি পর্তুগিজ লঞ্চ-এর উপর দণ্ডায়মান বিলের দীর্ঘ দেহ তাঁর নজরে পড়ল। আস্তিলিও অবাক হয়ে গেলেন— অন্ততঃ দশ মাস আগে যার আমেরিকাতে পৌঁছে যাওয়ার কথা, সেই মানুষটি এখন হাত দুলিয়ে দন্তবিকাশ করে তাঁকে তারস্বরে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। তার পাশেই যে সুন্দরী তরুণীটি দাঁড়িয়েছিল, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখেই আস্তিলিও বুঝলেন সে বিলের স্ত্রী।

মিনিট দুই পরেই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সঙ্গে মিলিত হলেন আস্তিলিও। শুরু হল করমর্দনের পালা, তুবড়ির মতো ছুটল বাক্যস্রোত। অভিযানের সাজ-সরঞ্জাম নৌকা থেকে ডাঙ্গার উপর নামল; সেগুলোকে ভালভাবেই আস্তিলিও তদারক করলেন, ফাঁকে ফাঁকে তবু কথাবার্তার বিরাম নেই। বিল এবং তস্য পত্নী নিজস্ব গাড়ি চালিয়ে আস্তিলিওকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল, পথে গাড়ির মধ্যেও চলেছে অবিরাম বাক্যের স্রোত। মধ্যাহ্নভোজের সময়েও আলাপের পালা অব্যাহত, সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল তখনও কথার শেষ নেই— অবশেষে আস্তিলিও যখন তাঁর লোকজনের কাজকর্ম পরিদর্শন করতে শুল্কবিভাগে ছুটলেন তখনই শেষ হল অবিশ্রান্ত বাক্যের ফুলঝুরি। বিলের কাছ থেকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাই এর মধ্যে শুনেছেন আস্তিলিও। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

জুলুল্যাণ্ড থেকে প্রফেসর আর মাতোনির সঙ্গে বায়রা শহরে আসার পথে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কোন হাতিকে পরলোকে পাঠানোর সুযোগ পায়নি বিল। তারা যখন বায়রাতে এসে পৌঁছল, তখন রাজনৈতিক আবহাওয়া খুব খারাপ। ইউরোপের বুকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা পর্তুগিজ উপনিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। প্রফেসরকে তাঁর মাতৃভূমি অর্থাৎ ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন ফরাসী দূতাবাসের কর্তৃপক্ষ। বিলের হাতে তখনও বেশ কিছু টাকা, সময়ও প্রচুর— অতএব নূতন উদ্যমে আবার হাতির সন্ধানে জঙ্গলের দিকে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হল বিল। বিল নির্ঘাৎ হাতির পিছনেই তাড়া করত, কিন্তু লিসবন থেকে ম্যারিয়া নামে যে মেয়েটি বায়রাতে এসেছিল তাকে দেখে বিলের মন বদলে গেল। হাতির কথা ভুলে ম্যারিয়ার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট হল বিল।

কিছুদিনের মধ্যেই সে জানতে পারল ম্যারিয়ার দিক থেকেও তার প্রতি অনুরাগের অভাব নেই। অতঃপর ঘটনাচক্রের অনিবার্য পরিণতি, অর্থাৎ বিবাহ। বিয়ের পর সিডনি ব্যাঙ্কে

একটা দস্তুরমতো ভালো চাকরি নিয়ে ম্যারিয়ার সাহচর্যে আদর্শ দম্পতির জীবন-যাপন করছিল বিল। আন্তিলিওর সঙ্গে যখন বিলের আবার দেখা হল তখন পরবর্তী সপ্তাহ থেকে একটা নয় দিন ব্যাপী ছুটি উপভোগের আনন্দে সে মশগুল।

শুল্কভবনের দিকে আন্তিলিওকে নিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বিল গল্প করছিল। এখানকার আবহাওয়া তার এবং নববধূর স্বাস্থ্যের উপযুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করল; সামাজিক পরিবেশ চমৎকার, স্থানীয় ক্লাবগুলোতে নানাধরনের খেলাধুলার সুযোগও আছে— পরিশেষে তার বক্তব্য হল মানুষের জীবন যে বিভিন্ন বৈচিত্রের ভিতর দিয়ে কত সুন্দর হতে পারে বিয়ের আগে সে-ধারণা তার ছিল না।

বিলের কথাবার্তা ওই পর্যন্ত বেশ উপভোগ করছিলেন আন্তিলিও, অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! 'এখন আমার ছুটি', বিলের কণ্ঠস্বর আনন্দে উদ্বেল, 'হাতি শিকারের নতুন 'পারমিট' পেয়েছি। ভিলা মাচাডো নামে যে জায়গাটা রয়েছে, দানবের মতো অতিকায় একটা হাতি সেখানে ভীষণ অত্যাচার করছে। এবারের ছুটিতে সেই হাতিটাকেই সাবাড় করব। খবরটা দিয়েছে মাতোনি। সেও আমার সঙ্গে যাচ্ছে। কি মজা!'

আবার হাতি! আন্তিলিওর মুখ শুকিয়ে গেল— সুন্দরী স্ত্রীর সাহচর্য আর মোটা মাইনের চাকরি বিলের মন থেকে প্রতিশোধের রক্তাক্ত সংকল্পকে মুছে ফেলতে পারেনি!

শুষ্কস্বরে তিনি বললেন, 'মাতোনি? সে কোথা থেকে এল? তোমাদের পৌঁছে দিয়ে তার তো দেশে ফিরে যাওয়ার কথা— এতদিন সে এখানে কি করছে?'

একগাল হেসে বিল জানাল সেইরকম কথাই ছিল বটে, কিন্তু মাতোনির জায়গাটা ভাল লেগে গেল বলে সে আর দেশে ফিরল না। বিল আরও বলল যে, ব্যাঙ্কের কাজে অন্ততঃ এক সপ্তাহের ছুটি না পেলে শিকারে যাওয়া অসম্ভব; সেই জন্যই সে এতদিন হাতিদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তবে একসময়ে না একসময়ে সুযোগ যে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। সেই উদ্দেশ্যেই বরাবর নিগ্রোশিকারী মাতোনির সঙ্গে সে যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। এখন নয় দিনের লম্বা ছুটি পাওয়া গেছে, আর অতিকায় এক হস্তির সংবাদও উপস্থিত। অতএব মাতোনিকে নিয়ে হস্তি নিধনের অভিযানে যাত্রা করার এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাতে সে রাজি নয়।

অন্তিলিওর সব সময়ই মনে হয়েছে বিল আর হাতির যোগাযোগ এক অশুভ পরিণতির সূত্রপাত করবে। কোনদিনই তিনি বিলের হাতিশিকারের আগ্রহে উৎসাহ প্রকাশ করেননি। এখনও সম্ভব হলে তিনি বাধা দিতেন, কিন্তু বিল এখন তাঁর অধীনে অভিযান-কার্যে নিযুক্ত নয়— তাকে তিনি বাধা দেবেন কি উপায়ে? একমাত্র ভরসা— ম্যারিয়া।

আন্তিলিও বললেন, 'তুমি বলতে চাও কালই তুমি বৌকে ফেলে রাইফেল ঘাড়ে হাতির পিছনে ছুটবে?— অসম্ভব! ম্যারিয়া কখনই রাজি হবে না।'

বিল সানন্দে দন্তবিকাশ করল, 'আজ বিকেলে আমি ম্যারিয়াকে সব কথা খুলে বলব। বিয়ের আগে ম্যারিয়া আমাকে শিকার ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছিল। আমি বলেছিলাম কয়েকটা হাতিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে শিকারে ইস্তফা দেব। ম্যারিয়া খুব ভাল মেয়ে।

আমার প্রস্তাবে তার আপত্তি হয়নি। আমি যে এত দিন শিকারে যাইনি তার কারণ স্ত্রীর অসম্মতি নয়— ছুটি পাইনি বলেই আমি হাতি শিকারের চেষ্টা করতে পারিনি। বুঝলে বন্ধু, এবার এমন বিরাট দুটি গজদন্ত আমি তোমার সামনে নিয়ে আসব যে, তেমন জিনিস তুমি জীবনে দেখ নি!'

আন্তিলিও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভবি ভোলবার নয়!

বিল যেদিন চলে গেল সেদিনটা ছিল শনিবারের সকাল। ম্যারিয়া খুব সপ্রতিভ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের আভাস আন্তিলিওর কাছে গোপন থাকেনি। শুধু কণ্ঠস্বর নয়, বন্ধুপত্নীর মুখচোখে সংশয় ও আশংকার চিহ্ন দেখেছিলেন আন্তিলিও। শিকারের সরঞ্জাম নিয়ে বিল ছিল ব্যস্ত ও উত্তেজিত, স্ত্রীর ভাবান্তর সে লক্ষ্য করল না।

যাওয়ার আগে বন্ধুকে শেষবারের মতো নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন আন্তিলিও। অন্ততঃ এই হাতিটার পিছু নিতে বিলকে তিনি নিষেধ করেছিলেন। তাঁর আশংকা অকারণ নয়— মাতোনির কাছ থেকে এর মধ্যেই পূর্বোক্ত হস্তির দৈহিক আয়তন ও স্বভাব-চরিত্রের যে বিবরণ আন্তিলিওর কর্ণকুহরে পরিবেশিত হয়েছিল তাতে বন্ধুর নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিল হেসে জানিয়েছিল তাকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে সে সমর্থ। ভয়ংকর জীবটির পশ্চাদ্ধাবনের সংকল্প থেকে বিলকে নিরস্ত করতে না পেরে আন্তিলিও তার সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

বিল তাঁর সাহায্য প্রত্যাখান করেছিল, 'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি জানি কালই তোমার বায়রা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। অকারণে কারও কাজের ক্ষতি হয় তা আমি চাই না। আমার জন্য দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নাই। আমি জানি কি করে হাতি মারতে হয়। দুই চোখের একটু উপরে একটা সরলরেখার মধ্যে দুর্বল জায়গাটা কমলালেবুর মতো বড়— ঐখানে গুলি বসাতে পারলে হাতির নিস্তার নেই। ত্রিশ ফুটের বেশী দূরত্ব থেকে গুলি চালানো উচিত নয়; অতএব হাতি তেড়ে এলে স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এসে পড়ে নির্দিষ্ট পাল্লার মধ্যে— তাই নয় কি? এসব ব্যাপার আমি জানি। ক্ষ্যাপা জানোয়ারের সামনে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে নিশানা করার ক্ষমতা যে আমার আছে সেকথা তো তোমার অজানা নয়। অতএব বন্ধু, ভয়ের কোন কারণ নেই।'

বিল চলে গেল। আন্তিলিও কর্মসূচী বদলে ফেললেন। যদিও জরুরী কাজে পরের দিনই তাঁর অন্যত্র যাওয়ার কথা, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল কাজটা এমন কিছু দরকারী নয় যে এই মুহূর্তে হৈ-হৈ করে ছুটতে হবে— বরং বিল ফিরে এলে তার সঙ্গে দেখা করে যাওয়াই বিবেচনার কাজ। স্থান ত্যাগের পরিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে বায়রাতেই থেকে গেলেন আন্তিলিও এবং টেলিফোন করে ম্যারিয়াকে জানিয়ে দিলেন বিল ফিরে আসার আগে তিনি এই জায়গা ছেড়ে কোথাও নড়ছেন না।

'তোমার চিন্তার কারণ নেই,' আন্তিলিও বললেন, 'বিল যে কোন সময়ে ফিরে আসতে পারে।'

'না! না!' হঠাৎ টেলিফোনের ভিতর দিয়ে ম্যারিয়ার অস্বাভাবিক কণ্ঠ তীব্রস্বরে ফেটে পড়ল আন্তিলিওর কানে, 'ও আর আসবে না!'

আন্তিলিও স্তম্ভিত! আবার ভেসে এল নারীকণ্ঠের দ্রুত উক্তি, 'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! আচ্ছা! গুডনাইট।'

আন্তিলিও ভাবলেন ম্যারিয়া তাঁর কথা বুঝতে পারেনি, সে বোধহয় ভেবেছে সেই রাতেই বিলের ফিরে আসার কথা বলেছেন তিনি, সেইজন্যই এই প্রতিবাদ। অর্থাৎ তার বক্তব্য হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি বিল ফিরে আসতে পারে না।

ম্যারিয়া কি বলতে চেয়েছিল তা সঠিকভাবে অনুধাবন করলেন আন্তিলিও মঙ্গলবার দুপুরে। সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজের পর একটি ছোটখাট দিবানিদ্রা দেবার উদ্যোগ করছেন আন্তিলিও, এমন সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন।

ফোন তুলতেই ম্যারিয়ার কণ্ঠস্বর, 'এই মুহূর্তে চলে আসুন!'

আন্তিলিও হতভম্ব, 'সেকি! কি হয়েছে?'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ওদিক থেকে একটা যান্ত্রিক শব্দ ভেসে এল। ম্যারিয়া ফোন রেখে দিয়েছে।

'নিশ্চয় বিল আহত অবস্থায় এসেছে,' আন্তিলিও ভাবলেন। তিনি জামা-কাপড় পরে নিজস্ব গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভার বম্‌বো গাড়ি চালিয়ে উপস্থিত হল বিলের বাড়িতে। ম্যারিয়া মাথায় হেলমেট চড়িয়ে বারান্দার উপর থেকে পথের দিকে তাকিয়ে ছিল। কোন ভূমিকা না করে সে আন্তিলিওকে বলল, 'বিলের কিছু হয়েছে।'

—'কেন? বিলের কোন খবর পেয়েছ?'

—'খবর পাইনি বলেই বুঝতে পারছি কিছু হয়েছে। বিল কথা দিয়েছিল সোমবারের মধ্যে নিশ্চয় ফিরবে। আজ মঙ্গলবার, অথচ তার দেখা নেই। কিন্তু এখন কথা বলার সময় নয়, চলুন, আমরা যাই। তর্ক করবেন না, দয়া করে চলুন। এক্ষুণি চলুন। এই মুহূর্তে।'

আন্তিলিও বোকার মতো বললেন, 'কোথায় যেতে হবে তা তো জানি না।'

উত্তর এল, 'আমি জানি। রেনল্ট। ভিলা মাচাডোর রাস্তায় যেতে হলে রেনল্টে যেতেই হবে। ওখানকার গাঁয়ের মানুষের কাছে নিশ্চয়ই ওর খবর পাওয়া যাবে।'

আন্তিলিও বন্ধুপত্নীকে বাড়িতে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানালেন এবং তিনি যে এই মুহূর্তে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র ম্যারিয়াকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন সে কথা জানাতেও ভুললেন না। কিন্তু ম্যারিয়া বাড়ি থাকতে রাজি নয়।

'আমি খাবার-দাবার তৈরী রেখেছি। পানীয় জল, কম্বল, 'ফ্ল্যাশ-লাইট' প্রভৃতি সব কিছুই সাজানো আছে। বিলের বাড়তি বন্দুকটাও সঙ্গে নিচ্ছি— হয়তো অস্ত্রটা ব্যবহার করার দরকার হতে পারে। আর এক মিনিটও নষ্ট করা উচিত নয়। চলুন।'

আন্তিলিও বুঝলেন ম্যারিয়া কোন কথা শুনবে না, সে যাবেই যাবে। অগত্যা বন্ধুপত্নীকে নিয়ে তিনি গাড়িতে বসলেন! ড্রাইভার বম্‌বো গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পথের শেষে

গাড়ি ছুটেছে। দীর্ঘ পথ, যাত্রীরা মৌন। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ যাত্রীদের নির্বাক করে রেখেছে। শুধু চালনচক্রের উপর অভ্যস্ত দক্ষতায় ঘুরছে ড্রাইভার বম্‌বোর হাত।

যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। সঙ্কীর্ণ পথের উপর এক জায়গায় পড়েছিল একটা গাছ। অনেক কষ্টে সেই বাধা ভেদ করে গাড়ি ছুটল। জোর করে সঙ্গে আসার জন্য বন্ধুপত্নীর উপর বিরক্ত হয়েছিলেন আন্তিলিও, কিন্তু ক্রোধপ্রকাশ করে লাভ নেই— ম্যারিয়া অটল, অবিলম্বে বিলের খবর পাওয়ার জন্য যে-কোন বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে প্রস্তুত।

নির্দিষ্ট স্থানে এসে ৩২ নং মাইলপোস্টের কাছে রাস্তা থেকে একটু দূরে ফাঁকা জায়গার উপর তাঁবুটা যাত্রীদের দৃষ্টিগোচর হল। তাঁবুতে ঢুকে বিলের দেখা পাওয়া গেল না।

আন্তিলিও ম্যারিয়াকে জানালেন শয্যার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বিল সারারাত ঘুমিয়ে সকালবেলা বেরিয়ে গেছে, খুব সম্ভব এখনই সে মাতোনিকে নিয়ে ফিরে আসবে। ম্যারিয়াকে যাই বলুন না কেন বিলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আন্তিলিওর মনেও সংশয় উপস্থিত— বিছানাতে বিলের দেহের ছাপ থাকলেও সে যে কখন শয্যাত্যাগ করেছে সে কথা অনুমান করা সম্ভব নয়।

আন্তিলিওর প্রবোধ বাক্য শুনে খুশী হল না ম্যারিয়া, সত্যিকার অবস্থাটা সে জানতে চায়— ধাতুনির্মিত যে বাক্সটার মধ্যে বিল খাবার-দাবার নিয়ে এসেছিল সেই বাক্সের ডালা খুলে মেয়েটি ভিতরে দৃষ্টিপাত করল। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের চমক! সব কিছুই অটুট অবস্থায় আছে, একটুকরো খাবারও বাক্স থেকে অদৃশ্য হয়নি! অর্থাৎ তিনদিন আগে এখানে পৌঁছেই হাতির পিছু নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে বিল আর মাতোনি, ফিরে এসে খাদ্যগ্রহণের সুযোগ হয়নি বলেই তাদের খাদ্যসামগ্রী অটুট ও অক্ষত অবস্থায় যথাস্থানে বিরাজ করছে! তিনদিন নিখোঁজ তারা!

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে মানুষ যেমন করে প্রিয়জনের শবাধারের ডালা বন্ধ করে, ঠিক তেমনি করেই বাক্সের ডালা বন্ধ করল ম্যারিয়া। এতক্ষণ পরে মেয়েটির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। বিলের নাম ধরে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে সে লুটিয়ে পড়ল পরিত্যক্ত শয্যায়, তার দুই চোখ বেয়ে নামল তপ্ত অশ্রু।

আন্তিলিওর জীবনে এমন দুঃসহ রাত্রি কখনও আসেনি। শোকের প্রথম আবেগ কেটে যেতেই ম্যারিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে, দারুণ আশায় বুক বেঁধে বার বার ছুটে এসেছে পথের উপর— আবার নিরাশ হৃদয়ে স্খলিত পদক্ষেপে প্রবেশ করেছে তাঁবুর মধ্যে। সমস্ত রাত এবং পরের দিন সকাল পর্যন্ত সে ঐভাবেই কাটিয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন খাদ্য তো দূরের কথা, এক কাপ চা পর্যন্ত পান করতে রাজি হয়নি ম্যারিয়া। বার বার অনুরোধ করেও তাকে কিছুই খাওয়াতে পারলেন না আন্তিলিও। এক রাতের মধ্যে তিন-তিনবার নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা হয়েছে, হতচকিত গ্রামবাসীরা বিমূঢ়ভাবে ঘাড় নেড়েছে— উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা তাদের চোখে পড়েনি।

দিনের আলো ফুটতেই আবার অনুসন্ধান শুরু হল। একটার পর একটা গ্রাম পরিদর্শন করলেন আন্তিলিও আর ম্যারিয়া। সবশুদ্ধ প্রায় পাঁচ-ছয়টা গ্রামে তাঁরা পদার্পণ করেছেন, সব জায়গায় একই উত্তর,— সাদা চামড়ার কোন মানুষের খবর জানে না স্থানীয় মানুষ। অবশেষে ৩৪নং 'মাইলপোস্টটার' কাছে এসে যে গ্রামটাকে তাঁরা দেখলেন, সেটা ছিল সম্পূর্ণ জনশূন্য।

গ্রাম পরিদর্শন করে যাত্রীরা বুঝলেন দু'দিন আগেও সেখানে লোকজন বাস করত। হঠাৎ গৃহত্যাগ করে গ্রামশুদ্ধ লোকের বনের ভিতর উধাও হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলেন না আন্তিলিও। কিন্তু ম্যারিয়া দৃঢ়ভাবে জানালেন জনশূন্য গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিলের অন্তর্ধানরহস্য! তার ধারণা গ্রামের মধ্যে খুব শীঘ্রই মানুষের দেখা পাওয়া যাবে।

ম্যারিয়ার চিন্তাধারা যে অভ্রান্ত সে কথা প্রমাণিত হল বুধবার সকাল দশটার সময়ে।

ধূলিধূসর ক্লান্ত দেহে বিস্তর ঘোরাঘুরির পর আবার ৩৪নং মাইলপোস্টের কাছে ফিরে এসে যাত্রীরা পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্যে একটি মনুষ্যমূর্তির সাক্ষাৎ পেলেন। পূর্বোক্ত মনুষ্যটি কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করছিল, সাদা চামড়ার সামনে আত্মপ্রকাশ করার ইচ্ছা তার ছিল না। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কিছুমাত্র মর্যাদা না দিয়ে ড্রাইভার বম্‌বো লোকটিকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে যাত্রীদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। লোকটি স্থানীয় মানুষ, নাম— জাটা। জাটার চোখে-মুখে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। প্রথমে সে কোন কথা বলতে রাজি হয়নি, কিন্তু ম্যারিয়ার অবস্থা দেখে তার মনে সহানুভূতির উদ্রেক হল। আতঙ্কের পরিবর্তে স্নিগ্ধ কোমল অভিব্যক্তির ছায়া পড়ল জাটার মুখে, 'চলো।'

সম্মোহিতের মতো জাটাকে অনুসরণ করল ম্যারিয়া। প্রায় ঘন্টাখানেক পথ চলার পর একটা ফাঁকা জায়গার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল স্থানীয় মানুষ, তার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি এখন আন্তিলিওর দিকে। হঠাৎ জাটার পাশ দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল ম্যারিয়া। এত তাড়াতাড়ি সে পা চালিয়েছে যে, আন্তিলিও কিংবা নিগ্রোটি তাকে বাধা দেবার সুযোগ পেলেন না।

নারীকণ্ঠের অবরুদ্ধ আর্তস্বর শোনা গেল; আন্তিলিও ছুটে গেলেন ম্যারিয়ার দিকে। পরক্ষণেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি, কয়েক মুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হয়ে গেল তাঁর সর্বাঙ্গ।

আন্তিলিওর সম্বিত ফিরে এল যখন তিনি দেখলেন ম্যারিয়ার দেহ রক্ত-চিহ্নিত মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তিনি মূর্ছিতা বন্ধুপত্নীর পতনোন্মুখ দেহটাকে ধরে ফেললেন। এতক্ষণে সন্ধান পর্ব শেষ! সামনেই মাটির উপর জমাট শুষ্ক রক্তের ছড়াছড়ি এবং সেই শোণিত-চিহ্নিত ভূমিতে পড়ে আছে দুটি বিকৃত, নিষ্পিষ্ট, ছিন্নভিন্ন মনুষ্যদেহ— বিল আর মাতোনি!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 'রক্তের ঋণ রক্তেই শুধব'

আন্তিলিও চিৎকার করে বম্‌বোকে বললেন সে যেন এখনই শহর থেকে ডাক্তার, নার্স আর অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসে। জাটা নামক নিগ্রোটিকে তিনি বম্‌বোর পথ-প্রদর্শক হয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চটপট শহরে পৌঁছানোর পথ স্থানীয় মানুষের নখদর্পণে তাই বম্‌বোর সঙ্গে জাটাকে যেতে বলেছিলেন আন্তিলিও। তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বিদ্যুৎবেগে অন্তর্ধান করল বম্‌বো আর জাটা। মূর্ছিতা ম্যারিয়াকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন আন্তিলিও প্রাণহীন জড় পদার্থের মতো।......

অনেকক্ষণ পরে লোকজন নিয়ে হাজির হল বম্‌বো। ম্যারিয়ার অচেতন দেহটাকে বম্‌বো আর আন্তিলিও ধরাধরি করে স্ট্রেচারে তুলে দিলেন। চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানালেন স্নায়ুর উপর অত্যধিক চাপ পড়ার ফলে মেয়েটি জ্ঞান হারিয়েছে, কিন্তু ভয়ের কারণ নেই— সে নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করবে। ম্যারিয়াকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ছুটল হাসপাতাল অভিমুখে!

এইবার ভালভাবে অকুস্থল পর্যবেক্ষণ করলেন আন্তিলিও। হস্তিযূথের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত মৃত্তিকার বুকে শুষ্ক রক্তের অক্ষরে যে শোচনীয় কাহিনীর বর্ণনা ফুটে উঠেছিল, সেটা অনভিজ্ঞের কাছে দুর্বোধ্য হলেও ঝানু শিকারীর চোখে সেই চিহ্নগুলো ছিল ছাপানো বইয়ের অক্ষরের মতোই স্পষ্ট;— অতএব অকুস্থল পরিদর্শন করার পর আর প্রকৃত ঘটনা আন্তিলিওর অজ্ঞাত রইল না।

শহর থেকে আগত ডাক্তারটির প্রশ্নের জবাবে আন্তিলিও বললেন, 'মানুষ আর হাতির পায়ের ছাপ দেখে সহজেই বুঝতে পারছি জন্তুটার মগজ লক্ষ্য করে বিল গুলি চালিয়েছিল। খুব সম্ভব চিৎকার করে যূথপতিকে প্ররোচিত করেছিল বিল। হাতিটা তাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসতেই বিল গুলি ছুঁড়েছিল। মগজের যে-জায়গায় আঘাত লাগলে হাতির মৃত্যু অবধারিত, সেই দুর্বল স্থানটির উপরে ও নীচে অবস্থান করছে কঠিন হাড়ের দুর্ভেদ্য আবরণ। অপ্রত্যাশিত ভাবে মস্তক সঞ্চালন করার ফলেই বোধ হয় হাতির মর্মস্থান থেকে একটু দূরে গুলি লেগেছিল এবং ক্রোধে ও যাতনায় ক্ষিপ্ত দানব এসে পড়েছিল বিলের দেহের উপর। এই ধরনের একটা ব্যাপার ঘটেছিল সন্দেহ নেই। বিল ছিল লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত, নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ তার নিশানা ব্যর্থ হয়েছে।'

অতঃপর আন্তিলিও ঘটনার যে বিবরণ বিশ্লেষণ করলেন তা হচ্ছে এই—

বিল দ্বিতীয়বার গুলি চালানোর সুযোগ পায়নি। যূথপতিকে অর্থাৎ বিলের আততায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল মাতোনি। তার নিক্ষিপ্ত গুলিও ক্ষিপ্ত হস্তির গতিরোধ করতে সমর্থ হয়নি। হাতিদের দলপতি যখন বিলের দেহের উপর ক্রোধ চরিতার্থ করছিল, তখন দৌড়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল মাতোনি— দুঃখের বিষয় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ছুটে এসেছিল শরীরী ঝটিকার মতো ক্রুদ্ধ হস্তী এবং মাতোনির দেহটাকে পিষে দলে আবার প্রবেশ করেছিল অরণ্যের গর্ভে। অকুস্থলে নিকটস্থ ভূমিতে একটি স্থানীয় মানুষের পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন আন্তিলিও। খুব সম্ভব ঐ লোকটির কাছে খবর পেয়েই গ্রামবাসীরা

সতর্ক হয়েছিল। পুলিসের ভয় তো ছিলই— কিন্তু পুলিসের চাইতে অনেক বেশী ভয়ংকর মত্ত মাতঙ্গের আক্রমণ আশঙ্কা করেই গ্রাম ছেড়ে বনের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছিল গ্রামের মানুষ।

আন্তিলিও যখন ঐভাবে ঘটনার বিশ্লেষণ করছিলেন তখন ডাক্তারের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল ড্রাইভার বম্‌বো। সে জানাল আন্তিলিওর অনুমান অভ্রান্ত। জাটা নামক পূর্বে উল্লিখিত যে লোকটি যাত্রীদের অকুস্থলে নিয়ে এসেছিল, সে নিজেই ছিল বিলের পথপ্রদর্শক। মাতোনির সঙ্গে জাটার বন্ধুত্ব ছিল; মাতোনির পরিবর্তে তার বন্ধু জাটা বিলকে হাতিদের কাছে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল— দুর্ঘটনার স্থলে নিকটবর্তী ভূমিতে জাটার পায়ের ছাপই দেখেছেন আন্তিলিও। বম্‌বো বেশ বুদ্ধিমান লোক, ঐ সব দরকারী খবর সে এখানে এসে জোগাড় করে ফেলেছে কিছুক্ষণের মধ্যে।

আন্তিলিও সাহেবও একটি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন— বিলের আততায়ীর একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি এখন সম্পূর্ণ সচেতন। আফ্রিকার হাতির সামনের দুটি পায়ে চারটি আঙ্গুল, পিছনের পায়ে তিনটি— কিন্তু বিলের হত্যাকাণ্ডের জন্য যে খুনী হাতিটা দায়ী, সেই জন্তুটার সামনের বাঁ পায়ে চারটির পরিবর্তে রয়েছে তিনটি আঙ্গুল! অসংখ্য হাতির পদচিহ্নের ভিতর থেকে অপরাধীকে খুঁজে নিতে এখন আর অসুবিধা নেই— শুধু তিন আঙ্গুলের বৈশিষ্ট নয়, এমন গভীর ও বৃহৎ পদচিহ্ন আগে কখনও আন্তিলিওর চোখে পড়েনি। পায়ের ছাপ দেখেই আন্তিলিও বুঝতে পারলেন আফ্রিকার অতিকায় হস্তিকুলেও বিলের হত্যাকারীর মতো প্রকাণ্ড হস্তী নিতান্তই দুর্লভ।

'শয়তান', আন্তিলিও সক্রোধে প্রতিজ্ঞা করলেন, ' তোমাকে আমি শেষ করব।'

বিলের দলিত ও ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ হাসপাতালের গাড়িতে তুলে দিতে গেলেন আন্তিলিও। জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার জানতে পারলেন আন্তিলিও এখন ঐ হাতিটাকে অনুসরণ করবেন।

'হ্যাঁ, জন্তুটা আমার বন্ধুকে হত্যা করেছে,' আন্তিলিও বললেন, 'রক্তের ঋণ আমি রক্তেই শুধব। কিন্তু আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

'গাড়িটাকে তাহলে আমি এখনই আবার পাঠিয়ে দেব,' ডাক্তার বললেন, 'হয়তো আর একটা মৃতদেহকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার হবে।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অরণ্য-ভৈরব

বুধবার সকালে বিল এবং মাতোনির মৃতদেহ পেয়েছিলেন আন্তিলিও। সেদিনই অর্থাৎ বুধবারে, রাতের দিকে বম্‌বো এসে জানাল জাটার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, গ্রাম এখনও জনমানবশূন্য। আন্তিলিওর দলভুক্ত অভিযাত্রীদের মধ্যে চারজন নিগ্রো ছিল, তারা সাগ্রহে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কিন্তু আন্তিলিও তাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন। অভিযানের বিভিন্ন কাজে দক্ষ হলেও এই অরণ্য তাদের পরিচিত নয়, অতএব লোকগুলোর প্রাণহানির আশঙ্কা আছে বুঝেই তাদের নিবৃত্ত করা হল।

বৃহস্পতিবার সকালে আন্তিলিওরা দলবল বায়রা ছেড়ে অন্যত্র যাত্রা করল। আন্তিলিও অবশ্য তখন তাদের সঙ্গ গ্রহণ করেননি, কথা হল পরে তিনি তাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। বিলের সৎকার-কার্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন, মহাসমারোহের সঙ্গে তাকে কবর দেওয়া হল। হাসপাতালে গিয়ে ম্যারিয়ার সাক্ষাৎলাভ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। চেষ্টা সফল হয়নি;— চিকিৎসকরা জানালেন যদিও মেয়েটির অবস্থা খুব খারাপ নয়, তবু লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা এখন চলবে না। আন্তিলিও জেনে খুশী হলেন যে ম্যারিয়ার গর্ভস্থ শিশু বেশ ভালোই আছে।

সমস্ত কর্তব্যের পালা চুকিয়ে আন্তিলিও চললেন হন্তারক হস্তীর সন্ধানে, সঙ্গে ড্রাইভার বম্‌বো। হত্যাকাণ্ড যেখানে সংঘটিত হয়েছিল সেখানকার মানুষ যে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এবার পুলিসের সাহায্যে গ্রামের সর্দারকে পাকড়াও করলেন আন্তিলিও। পুলিস-অফিসার ঘোষণা করল সর্দার যদি আন্তিলিওকে হাতির সন্ধান পেতে সাহায্য না করে, তাহলে তাকে পদচ্যুত করে সেই জায়গায় অন্য সর্দারকে নিযুক্ত করা হবে।

তারপর এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হল। বিলের হত্যাকারী হস্তী এবং তার দলবল সম্বন্ধে সর্দারের ছিল অপরিসীম আতঙ্ক। আতঙ্ক অহেতুক নয়— পুলিস যাই করুক, খুন করবে না; কিন্তু সাদা শিকারীর গুলি যদি ফসকে যায় তাহলে উক্ত হস্তিবাহিনীর দলপতি হয়তো গ্রামের উপর হানা দিতে পারে, এবং সেরকম ঘটনা ঘটলে বহু মানুষ যে প্রাণ হারাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব সর্দার নানাভাবে আন্তিলিওকে ভুলপথে চালিত করতে সচেষ্ট হল।

'কায়না' নামক মৃত্যুগহ্বরের সন্ধানে গিয়ে কম্যাণ্ডার আন্তিলিও গত্তি বুঝেছিলেন স্থানীয় মানুষ কেমন করে বিদেশীকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। সর্দারের চালাকি খাটল না, কয়েকদিনের মধ্যেই আন্তিলিও পূর্বোক্ত হস্তী ও তার দলবলের সন্ধান পেয়ে গেলেন।

পায়ে-চলা বনপথের উত্তর দিকে অবস্থিত জলাভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আন্তিলিও সর্দারকে বললেন, 'কাল আমি ঐদিকে যাব! তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। আমি জানি ঐখানেই আছে সেই শয়তান।'

আচমকা মুখের উপর চড় মারলে মানুষের যে অবস্থা হয়, সর্দারের মুখের অবস্থাও হল সেইরকম। স্খলিতস্বরে সে বলল, 'সাদা মানুষ! তুমি মরবে। তোমার আগে অনেক কালো আর সাদা শিকারী ঐ জন্তুটাকে মারতে গিয়ে মরেছে। তুমিও তাদের মতো মরবে।'

আন্তিলিও বুঝলেন তাঁর অনুমান যথার্থ। ঐখানেই আছে বিলের হত্যাকারী।

'কাল আমরা যাচ্ছি,' আন্তিলিও ঘোষণা করলেন। পুলিস অফিসার ভয় দেখিয়ে যে কথাটা বলেছিল, সেই কথাটাও তিনি সর্দারকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না!

অবশ্য পুলিসের কাছে সর্দারের সম্বন্ধে অভিযোগ করেননি আন্তিলিও। যতদূর জানা যায় আন্তিলিও সাহেবের বায়রা ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত সর্দারকে সর্দারি করতে দেখা গেছে। ঘটনাটা অন্যরকম হতে পারত— কারণ, পরের দিন সকালে আন্তিলিও আর সর্দারকে দেখতে পাননি। এক রাতের মধ্যেই সে এলাকা ছেড়ে হাওয়া হয়ে গেছে। মুখে

যাই বলুন, মনে মনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেননি আন্তিলিও। কেউ যদি আত্মহত্যা করতে রাজি না হয়, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় কি?

সর্দারের অনুপস্থিতিতে শিকারীর সংকল্পে বাধা দিতে পারল না। বম্‌বোকে সঙ্গে নিয়ে জলাভূমি পার হলেন আন্তিলিও। তিনি অনুমান করেছিলেন স্যাঁতসোঁতে জলাভূমির পরেই শক্ত মাটির দেখা পাওয়া যাবে। অনুমানে ভুল হয়নি— জলার সীমানা শেষ হয়ে দেখা দিয়েছে প্রস্তর-আবৃত কঠিন ভূমি, এখানে-ওখানে ফাঁকা জায়গার উপর বিচ্ছিন্নভাবে মাথা তুলেছে সবুজ উদ্ভিদের সারি এবং ছোট বড় পাথরের টুকরো। একটা উঁচু জায়গার উপর উঠে জলের কল্লোলধ্বনি শুনতে পেলেন আন্তিলিও। উচ্চভূমির পরেই একটা খাদ। বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে গেছে সেই খাদ ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে। দু'পাশে খাড়া মাটির দেয়াল-বসানো ফাঁকটা দশ ফুটের কম নয়। খাদের বিপরীত দিকে একটা ঝর্ণা দেখতে পেলেন আন্তিলিও। ঐ ঝর্ণার শব্দই তিনি শুনেছেন একটু আগে।

শুকনো গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য ঝর্ণার কাছে গেলেন আন্তিলিও আর বম্‌বো। খাদটাকে তাঁরা ডিঙ্গিয়ে যাননি, প্রায় বিশ ফুট খাড়াই ভেঙ্গে ওঠা-নামা করে তাঁরা ঝর্ণার কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

কিন্তু জলপান করতে গিয়ে তাঁরা চমকে উঠলেন— আশেপাশে ভিজে জমির উপর ফুটে উঠেছে বহু হাতির পায়ের চিহ্ন! সেই পায়ের ছাপগুলোর ভিতর থেকে তিন আঙ্গুলের প্রকাণ্ড পদচিহ্নটি আন্তিলিওর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করল অতি সহজেই। একটু আগেও তাঁর আচরণে সতর্কতার চিহ্নমাত্র ছিল না, চলার পথে বম্‌বোর সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝেই কথা বলেছেন— এখন পায়ের ছাপগুলো দেখামাত্র তাঁর মনে হল অতর্কিতে মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

সূর্যরশ্মি অত্যন্ত প্রখর, মেরুদণ্ডের উপর ঘর্মস্রোতের অস্বস্তিকর অনুভূতি। নিস্তব্ধ বনভূমির ভিতর থেকে ভয়ংকর শব্দের আভাস— সত্যিই কি শব্দ হয়েছে? না মনের ভ্রম?...... এতক্ষণে হাতির সাক্ষাৎলাভ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন আন্তিলিও, এখন তাঁর মনে হল এত তাড়াতাড়ি জন্তুটার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হয়। শিকারীর মন এখনও তৈরী হয়নি, আর একটু সময় পাওয়া দরকার.......

আন্তিলিও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিকে চালিত করলেন। পরিস্থিতি বুঝে নেওয়া দরকার। অবস্থাটা তাঁর ভাল লাগছে না;— সামনে পশ্চিম দিকে বিরাজ করছে নিবিড় অরণ্য, উত্তর ও দক্ষিণে মুক্ত প্রান্তরের উপর টুকরো টুকরো পাথরের ভিড়, পূর্বদিকে অর্থাৎ তাঁদের পিছনে হাঁ করে আছে গভীর খাদ।

'ঐ দেখো', সভয়ে আঙ্গুল তুলে দেখাল বম্‌বো।

সচমকে নির্দিষ্ট দিকে ঘুরলেন আন্তিলিও। সশব্দে দুটি বৃক্ষকে ধরাশয়ী করে অরণ্যের অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে এক অতিকায় হস্তী। এক নজর তার দিকে তাকিয়ে আন্তিলিও বুঝলেন এই জন্তুটাই বিলের হত্যাকারী। বহুদিন আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে ঘুরেছেন আন্তিলিও, কিন্তু এমন প্রকাণ্ড হাতি কখনও তাঁর চোখে পড়েনি।

সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আন্তিলিও আর বম্‌বো। জন্তুটা ফাঁকা মাঠের উপর

শিকারীদের থেকে ২০০ ফুট দূরে অবস্থান করছিল। আন্তিলিও জানতেন হাতি দূরের জিনিস ভালোভাবে দেখতে পায় না, অতএব এখনও তার নজরে পড়ার ভয় নেই।

কিন্তু হাওয়া? শিকারীদের দিক থেকে হাতির দিকেই ছুটে যাচ্ছে হাওয়া। অতিকায় জন্তুটা শুঁড় তুলে সন্দেহজনক ভাবে বাতাস পরীক্ষা করছে এবং আশ-পাশ থেকে ভেসে-আসা শব্দের তরঙ্গ ধরার চেষ্টায় সবেগে দুলে দুলে উঠছে বিশাল দুটি কান— হাতির ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি অতিশয় প্রখর। আন্তিলিও বুঝলেন তাঁরা ফাঁদে পড়েছেন। দোষ তাঁর। বম্‌বো অনভিজ্ঞ, সে শিকারী নয়— ড্রাইভার। তাছাড়া বম্‌বো যেখানকার অধিবাসী সেই অঞ্চলে হাতি নেই, উক্ত পশুটির স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তাই সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে। আন্তিলিও যদি আর একটু সতর্ক হতেন তাহলে বিপদকে এড়িয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু এখন আর অনুতাপ করে লাভ নেই— তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর শরীরী প্রতিচ্ছবি.......

আন্তিলিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। দানব আবার জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছে! বিপদের মুখ থেকে উদ্ধার পেয়েছে মনে করে আন্তিলিও যখন ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ শূন্যে শুঁড় তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াল অতিকায় হস্তী— আন্তিলিও বুঝলেন জন্তুটা তাঁদের গায়ের গন্ধ পেয়েছে।

শিকারীদের বাঁ দিক থেকে খুব ধীরে ধীরে ঢালু জমি বেয়ে এগিয়ে আসতে লাগল হাতি, সঙ্গে সঙ্গে কান দুলিয়ে সন্দেহজনক শব্দ ধরার চেষ্টাও চলল।

আন্তিলিও রাইফেল তুললেন কাঁধে।

হাতি আরও এগিয়ে এল। চোখে না দেখলেও ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে সে জেনে গেছে শিকারীরা কোথায় আছে।

দানবের চলার গতি বাড়ল। কমে আসতে লাগল দানব ও মানবের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

নব্বই ফুট। আন্তিলিওর পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। আশী ফুট। সর্বাঙ্গে আতঙ্কের শিহরণ, বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডের গতি বুঝি থেমে যেতে চায়— রাইফেলের নিশানা স্থির করলেন আন্তিলিও।

সত্তর ফুট। মাথার মাঝখানে দুই চোখের একটু উপরে একটা ক্ষতচিহ্ন। বিলের গুলি ঐখানে কামড় বসিয়ে দাগ করে দিয়েছে।

ষাট ফুট! 'বিল তো হাতির মর্মস্থানে গুলি চালিয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার হাতিটা এখনও বেঁচে আছে কি করে?'

পঞ্চাশ ফুট। 'বিল যেখানে গুলি করেছে সেই জায়গাটা থেকে এক ইঞ্চি উপরে গুলি চালাব।' মনে মনে ভাবলেন আন্তিলিও।

চল্লিশ ফুট। প্রকাণ্ড দুই গজদন্ত জিঘাংসায় প্রসারিত। মনে হচ্ছে বহুদূর থেকেই দাঁত দুটো শিকারীদের দেহে বিদ্ধ হবে।

ত্রিশ ফুট। রাইফেলের ট্রিগারে আঙ্গুলের চাপ। কর্কশ শব্দ, আগুনের ঝলক। তীব্র তীক্ষ্ম বৃংহণধ্বনি। হাতি থমকে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু রাইফেলের বুলেট তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারেনি।

'পালাও, বাওয়ানা।'

আবার জাগল গজকণ্ঠে ভয়ংকর ধ্বনি। শব্দ এগিয়ে আসছে। আন্তিলিও পিছন ফিরে সবেগে পলায়মান বম্‌বোকে অনুসরণ করলেন। বম্‌বো এক লাফে খাদ পার হয়ে গেল। মুহূর্তের দ্বিধা— দশ ফুট ফাঁকটা কি পার হওয়া যাবে? পরক্ষণেই এক প্রচণ্ড লম্ফে শূন্যপথ অতিক্রম করে খাদের বিপরীত পার্শ্বে এসে পড়লেন আন্তিলিও।

ছুট! ছুট! ছুট! সামনে বম্‌বো, পিছনে আন্তিলিও! সুদীর্ঘ শুণ্ড আর প্রকান্ড দুই গজদন্তের মারাত্মক স্পর্শের আশঙ্কায় পলাতকদের সর্বাঙ্গে আতঙ্কের শিহরণ— যে কোন মুহূর্তে ঘাড়ের উপর এসে পড়তে পারে ক্রোধোন্মত্ত হস্তী।

হঠাৎ একবার পিছন দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল বম্‌বো, এবং হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটির উপর। সে একবার ওঠার চেষ্টা করেই নিশ্চল হয়ে গেল, আন্তিলিও দেখলেন তার ভয়ার্ত চক্ষুতারকার নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে তাঁরই পিছন দিকে!

বম্‌বোর স্তম্ভিত দৃষ্টির হেতু নির্ণয় করার জন্যে আন্তিলিও একবারও পিছন পানে চাইলেন না, তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঠ! ওঠ!'

বম্‌বো উঠল না।

'ওঠ'—

ক্রুদ্ধ হস্তীর তীব্র বৃংহণ ভেসে এল পিছন থেকে, আন্তিলিওর মনে হল তাঁর কানের পর্দা বুঝি ফেটে গেল।

এবার আর পিছন দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারলেন না তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবস্থাও বম্‌বোর মতো— সম্মোহিত মানুষের স্তম্ভিত দৃষ্টি মেলে তিনি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এক ভয়ংকর অত্যাশ্চর্য দৃশ্য!

নিদারুণ ক্রোধে সংহার-মূর্তি ধারণ করেছে ক্ষিপ্ত গজরাজ, কিন্তু সে এখনও অবস্থান করছে খাদের বিপরীত পার্শ্বে! বাধাটাকে ডিঙিয়ে আসার চেষ্টা না করে খাদ পার হওয়ার কোন সেতুপথ আছে কিনা সেটাই এখন তার অনুসন্ধানের বিষয়। পারাপারের পথ অবিষ্কার করতে না পেরে নিষ্ফল আক্রোশে গাছগুলোকে সে সবেগে উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করছে ভূমিপৃষ্ঠে, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কর্ণভেদী বৃংহণ শব্দে কাঁপছে আকাশ-বাতাস!

আচম্বিতে অরণ্যের অন্তঃপুর থেকে ভেসে এল বহু হস্তীর কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনি, দলপতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছুটে আসছে দানবের দল! কিছুক্ষণ পরেই তাদের দেখা পাওয়া গেল। ঢালু জমির উপর দিয়ে দলপতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল ধূসরবর্ণ চলন্ত পর্বতের সারি— আন্তিলিও গুণে দেখলেন সেই ভয়ংকর বাহিনীতে অবস্থান করছে দু'দুশো বন্য হস্তী!

ব্যাপার শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয় বটে, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত হস্তীযূথের সামনে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাদের সংখ্যা গণনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন আন্তিলিও। নিষ্ফল ক্রোধে চিৎকার করে আকাশ ফাটালেও হাতির মধ্যে কেউ খাদ ডিঙিয়ে আসার জন্য পা বাড়াতে রাজি নয়!

আন্তিলিওর মনে পড়ল খুব ছোটবেলায় একটা বইতে তিনি পড়েছিলেন— 'প্রতি পদক্ষেপে খুব বেশী হলে সাড়ে ছয় ফুট জায়গা অতিক্রম করতে পারে হাতি; একটা সাত ফুট চওড়া খাদ পার হওয়ার ক্ষমতা তার নেই।'

কেতাবী তথ্য নিয়ে আর মাথা ঘামাননি তিনি। কিন্তু কথাটা যে সত্যি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে খাদটাকে দুটো তুচ্ছ মানুষ লাফিয়ে পার হয়ে গেছে, সেই খাদটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অমিত বলশালী হস্তিযূথের সামনে! হাতি লাফাতে পারে না এবং সাড়ে ছয় ফুটের বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলার ক্ষমতাও তার নেই— অতএব দশ ফুট চওড়া খাদের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আন্তিলিও নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে করলেন।

কিন্তু এই নিরাপত্তা যে নিতান্ত সাময়িক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, বম্‌বো।

আন্তিলিও যখন হাতিদের সংখ্যা নির্ণয় করতে ব্যস্ত, বম্‌বো তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল, 'গুলি চালাও বাওয়ানা, গুলি চালাও।'

মাঝখানে খাদের বাধা থাকায় হাতির পক্ষে গুলি খেয়ে প্রতি-আক্রমণ চালানোর সুযোগ ছিল না। ভালো শিকারী সর্বদাই শিকারকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিতে চায়, তাই একতরফা সুবিধা নিয়ে গুলি চালাতে অনিচ্ছুক ছিলেন আন্তিলিও— কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য তিনি রাইফেল তুলতে বাধ্য হলেন। বিশালকায় যূথপতি দাঁতের আঘাতে মাটি আর পাথর তুলে ফেলছে খাদের গর্তে, সঙ্গীরাও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে একাগ্রচিত্তে— যে কোন সময়ে মাটি ও পাথরে ভরাট হয়ে খাদের উপর হাতিদের পারাপার করার উপযোগী একটা সেতু গড়ে উঠতে পারে, এবং সেরকম কিছু ঘটলে গোটা দলটাই যে ঐ পথে খাদ পার হয়ে মানুষ দুটিকে আক্রমণ করতে ছুটে আসবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

খেলোয়াড়ী মনোভাব দেখাতে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে রাজি হলেন না আন্তিলিও, রাইফেল তুলে সর্দার-হাতির মাথার উপর তিনি লক্ষ্যস্থির করতে লাগলেন। বিলের গুলিতে চিহ্নিত ক্ষতস্থানের একটু উপরেই আন্তিলিওর নিক্ষিপ্ত প্রথম গুলির দাগ?— ঐ দাগের একটু উপরে বিঁধল রাইফেলের দ্বিতীয় বুলেট। হাতি একটুও কাবু হল না, আঘাতের যাতনায় সে আরও ক্ষেপে গেল এবং দ্বিগুণ উৎসাহে দাঁত বসিয়ে মাটি তুলে ফেলতে লাগল খাদের মধ্যে। আন্তিলিও অবাক হয়ে গেলেন— এ কেমন হাতি? মাথার উপর দুর্বলতম স্থানে ভারি রাইফেলের গুলি অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এমন হাতির কথা তিনি কখনও শোনেননি। মাথা ছেড়ে তিনি নিশানা করলেন কর্ণমূলে।

গর্জে উঠল রাইফেল। হাঁটু পেতে বসে পড়ল মত্ত মাতঙ্গ। উপবিষ্ট অবস্থায় তার দেহটা একবার দুলে উঠল, তারপর প্রচণ্ড শব্দে শয্যাগ্রহণ করল মাটির উপর— সব শেষ!

যূথপতির মৃত্যু দেখে থমকে গেল হাতির দল। শূন্যে কয়েকবার রাইফেলের আওয়াজ করলেন আন্তিলিও। হস্তিযূথ এইবার শঙ্কিত হল। প্রথমে রণে ভঙ্গ দিল শাবকসহ হস্তীনীর দল, তারপর তাদের অনুসরণ করে বনের মধ্যে অদৃশ্য হল সমগ্র বাহিনী। অকুস্থলে পড়ে রইল কেবল যূথপতির প্রকাণ্ড প্রাণহীন দেহ। বিল, মাতোনি এবং আরোও অনেক শিকারী ও স্থানীয় মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী খুনী জানোয়ারটা শেষ পর্যন্ত আন্তিলিওর রাইফেলের গুলিতে ইহলীলা সংবরণ করল।

নিহত হস্তীকে পরীক্ষা করে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া গেল। রাইফেলের তিনটি বুলেটই হাতির মাথায় লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ— ভাঙ্গাচোরা বুলেটের ব্রহ্মস্পর্শে চিহ্নিত ঐ করোটিকে পাঠানো হয়েছিল যাদুঘরে;— পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল হাতির মগজের

উপর যেখানে মর্মস্থলের অবস্থান, সেই নির্দিষ্ট স্থান থেকে পাকা সাড়ে নয় ইঞ্চি উপরে রয়েছে এই সৃষ্টিছাড়া জন্তুটার মর্মস্থান ! তামাম দুনিয়ার হাতিদের মধ্যে এমন 'বিকৃত মস্তিষ্কের' উদাহরণ কোথাও পাওয়া যায়নি। মস্তিষ্কের ঐ অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্যই শিকারীদের নিক্ষিপ্ত গুলির পর গুলি ব্যর্থ হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে হতভাগা বিল এবং খাদটা না থাকলে বম্বো আর আত্তিলিওর অবস্থাও যে বিলের মতোই হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিদায় আফ্রিকা ১৯৩৯

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কামান-গর্জন যখন শুরু হল, আত্তিলিও তখন আফ্রিকার এক দুর্গম অঞ্চলে বিভিন্ন গবেষণায় ব্যস্ত। আফ্রিকা ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল বলে তিনি আমেরিকাতে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। আফ্রিকা থেকে বিদায় নেবার আগে তিনি দ্বিতীয়বার কিভুর অরণ্যে প্রবেশ করে একটি মস্ত বড় গরিলা শিকার করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটির জন্য— 'প্রিটোরিয়া মিউজিয়াম অব সাউথ আফ্রিকা।'

তবে 'মোয়ামি ন্‌গাগি' নামে যে জন্তুটাকে তিনি আগে মেরেছিলেন, সেটার সঙ্গে অন্য গরিলার তুলনা হয় না। উক্ত 'মোয়ামি ন্‌গাগি' হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তর গরিলা। অন্ততঃ এখন পর্যন্ত অত বড় গরিলা কেউ শিকার করতে পারেনি।

কিবালির নিম্নভূমিতে অবস্থিত বনে-জঙ্গলে হানা দিয়ে 'ওকাপি' নামক দুষ্প্রাপ্য পশুকে বন্দী করতে সমর্থ হয়েছিলেন আত্তিলিও। একটি নয়, দুটি নয়—পাঁচ-পাঁচটা ওকাপিকে তিনি ধরেছিলেন। এক ধরনের অদ্ভুত জিরাফের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন আত্তিলিও। জন্তুগুলোর নাম দিয়েছিলেন 'আকোয়াপিয়া কিবালেনসিস'।

ঐসব বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করার জন্য আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে আত্তিলিও ভ্রমণ করেছেন। ক্রিস্ট্যাল পর্বতমালার অরণ্যে, লুয়ালালাবা ও কাসাই নদীর তটভূমিতে— অ্যালবার্ট, এডওয়ার্ড, টাঙ্গানিকা প্রভৃতি হ্রদের তীরে— সর্বত্র অশ্রান্ত পদক্ষেপে ঘুরেছেন আত্তিলিও, রহস্যময়ী আফ্রিকার বুকের ভিতর থেকে গোপন সম্পদ উদ্ধার করে নিয়ে আসতে চেয়েছেন লোকচক্ষুর গোচরে..........

ঊনচল্লিশ জাতের পশুপক্ষি, সরীসৃপ এবং ছেষট্টি রকমের কীটপতঙ্গ ও দুশো অজ্ঞাত উদ্ভিদ আবিষ্কার করেছিলেন আত্তিলিও।

আফ্রিকা ছেড়ে যাওয়ার সময়ে তিনি বলেছিলেন, 'যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তাহলে আবার আমি ফিরে আসব আফ্রিকাতে, আবার এখানে শুরু করব গবেষণা আর অনুসন্ধান-কার্য।'

সমাপ্ত

গল্প নয়, বাস্তব সত্য !

অলৌকিক রহস্য ! নিষ্ঠুর চক্রান্ত ! নরঘাতক দ্বিপদ ও নরখাদক শ্বাপদের ভয়াবহ সমাবেশ !...

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাক্তন সৈনিকের অভিজ্ঞতার ভয়াবহ বিবরণ !